নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটীর তিন কিরীট

অবগুণ্ঠিতা ৯
তখন রাত একটা বেজে দশ ১৩৪
গোলাপের রঙ লাল ১৯৪

boiRboi.net

॥ এক ॥

শীতের সকাল।

রাস্তার ওপাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা ফুলে ফুলে যেন রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে।

সুব্রত তার শয়ন ঘরে একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা খুলে চোখ বোলাচ্ছিল।

কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা একটা গেরুয়া রঙের কাশ্মীরী শাল। পাশেই টিপয়ের পরে রক্ষিত নিঃশেষিত চায়ের কাপটা।

ভৃত্য এসে একটা চিঠি সামনে ধরে বললে, দারোয়ান চিঠিটা দিলে। চিঠিটা লেটার বক্সে ছিল।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা ভৃত্যের হাত থেকে নিয়ে দেখলো। আকাশ নীল রঙের একখানা পুরু খাম।

চিঠিখানা নাড়া চাড়া করতে করতে সুব্রত বললে, তুই যা।

ভৃত্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত দেখল, ঘন ভায়োলেট রঙের কালিতে খামের উপরে পরিষ্কার ইংরেজি হরফে সুব্রতর নাম ঠিকানা লেখা। চিঠিটা নিশ্চয়ই কেউ হাতে করে ডাকবাক্সে ফেলে গেছে।

সুব্রত খামটা ছিঁড়ে ফেলল।

ভিতরে সাদা কাগজে পরিষ্কার করে ঘন ভায়োলেট কালিতে লেখা বাংলায় একখানা চিঠি।

প্রিয় সুব্রত বাবু,

বিখ্যাত জুয়েলার ও ব্যাঙ্কার গজেন্দ্রকুমার সরকারকে নিশ্চয়ই চিনবেন। কারণ, কলকাতা শহরে তিনি একজন টাকার কুমীর বললেও অত্যুক্তি হয় না। বহুদিন হলো তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর দুটি ছেলে। বড় গনেন্দ্র সরকার অনেকদিন হলো বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছেন। কলকাতা মহালক্ষ্মী ব্যাংকের এখন তিনি এ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার। অবিবাহিত। ছোট ছেলে সৌরীন্দ্র বি. এস-সি পাশ করে বাপের কাছেই থাকেন, ও বাপের ব্যবসা দেখেন। বড় গনেন্দ্রের বয়স প্রায় বছর চল্লিশ হবে। ছোট সৌরীন্দ্র ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের হবে। সংসারে

সৌরীন্দ্র ছাড়াও একটি বোনপো অশোক, মেডিকেল কলেজের ফিপ্থ্ ইয়ারের ছাত্র। সংসারে তার আপনার বলতে এক বিধবা মা। গজেন্দ্রের একটি মাত্র ভগিনী পাবনায় দেশের বাড়িতে থাকেন।

অশোক গজেন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। বোনপো অশোক ছাড়াও গজেন্দ্রের আর একটি পোষ্য আছে! সে হচ্ছে বিনয়েন্দ্র। গজেন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই।

বিনয়েন্দ্রের একটি পা (বাম) জন্মবিধি একটু খোঁড়া। অত্যন্ত নিরীহ শান্তশিষ্ট। বি. এস-সি পাশ করে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিল। কিন্তু সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ে, পড়া ছেড়ে বছর তিনেক হলো নিষ্ক্রিয় হয়ে বাড়িতেই বসে আর্টের চর্চা করেন।

বিনয়েন্দ্রের যখন নয় বৎসর বয়স, তখন হঠাৎ বিসূচিকা রোগে একদিনেই দু'ঘণ্টার আগেপিছে গজেন্দ্রর পিতা ও বিমাতা মারা যান। ঐ গজেন্দ্রবাবুকেই আজ সকালে হঠাৎ তাঁর শয়ন ঘরের সংলগ্ন লাইব্রেরীঘরে মৃত অবস্থায় চেয়ারের পরে বসে আছেন দেখা গেছে। আমার মনে হয় ওর মৃত্যুর সঙ্গে কোন রহস্য জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ মৃত্যু তাঁর স্বাভাবিক নয়। তাকে কেউ খুন করেছে বলে আমার ধারণা। আপনি যদি হত্যাকারী ধরে দিতে পারেন, তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব। নমস্কার।

ইতি—

সরকার বাড়ির জনৈক বন্ধু

চিঠিখানা আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললে সুব্রত। সুব্রত যেন একটু আশ্চর্যই হয়। কে এমন চিঠি লিখতে পারে—ব্যাপারটা কি সত্যি?

চিঠিখানা আরও একবার আগাগোড়া পড়ে ফেলল সে। তারপর কৌচ থেকে উঠে ঘরের কোণে রক্ষিত টেলিফোনের কাছে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লোহার হুকে টাঙানো টেলিফোন গাইডটা হাতে নিয়ে দ্রুত পাতা উল্টাতে লাগল।

সহজেই ও ব্যাঙ্কার ও জুয়েলার মিঃ গজেন্দ্র সরকারের ফোন নম্বরটা খুঁজে পেল। ডায়েলটা ঘুরিয়ে ওই নম্বরটা লাগাতেই ওপাশ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে জবাব এল, হ্যালো!

এটা কি জুয়েলার ব্যাঙ্কার গজেন সরকারের বাড়ী? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ, কে আপনি?

সুপার সুব্রত রায়। বাড়ি থেকে কথা বলছি···আপনি কে?

কে? মিঃ রায়? আমি তালুকদার···

কে মফিজউদ্দিন?

হ্যাঁ। আপনি শুনেছেন নাকি কিছু? হঠাৎ আজ সকালে মিঃ সরকারকে তার···

boiRboi.net

আমি জানি…এখুনি আমি যাচ্ছি। সুব্রত তালুকদারকে আর কোন জবাব দেবার অবকাশমাত্র না দিয়ে, ফোনটা নামিয়ে রেখে, ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা করে নিয়ে সোজা নীচে এসে গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে স্টার্ট দিল।

গাড়ি বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

মাঘের মাঝামাঝি। শীতের সকাল। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা হবে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে 'বসন্ত কেবিনে' চা-সেবীদের প্রচণ্ড ভীড়।

সোমবার। রেষ্টুরেণ্টে রেডিও সেটে পংকজ মল্লিকের রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছে।

'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
আমলকীর ঐ ডালে ডালে'…

ট্রামে বাসে এর মধ্যেই অফিসমুখো বাবুদের ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেছে।

মিঃ সরকারের বাড়ি আপার সারকুলার রোডে মানিকতলা বাজারের কাছাকাছি।

মিনিট পনেরর মধ্যেই সুব্রত মিঃ সরকারের আধুনিক কেতায় নির্ম্মিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার গেটের মধ্যে এসে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করল।

লোহার গেট। একপাশে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'মর্মরাবাস'। অন্য পাশে পিতলের প্লেটে লেখা, মিঃ জি. সরকার।

গেটের সামনেই দারোয়ানের পাশে একজন লাল পাগড়ী মোতায়েন ছিল। সুব্রতকে গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে সেলাম দিল এবং পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। সুব্রত একেবারে বরাবর গাড়িবারান্দার নীচে এসে গাড়ির ব্রেক কষল।

গাড়ি থেকে নামতেই, সামনে দরজার গোড়ায় আরো দু'জন লাল পাগড়ী। লাল পাগড়ী দু'জনেই সুব্রতকে বেশ ভাল ভাবেই চিনতো। সেলাম ঠুকে তারাও পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

সুব্রত গিয়ে সামনের ঝুলন্ত দামী পর্দাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

॥ দুই ॥

প্রশস্ত একটি হলঘর। মেঝেতে পুরু দামী কার্পেট বিছান। দামী দামী কোচ ও সোফায় ঘরখানি অতি আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত। দেওয়ালে দেওয়ালে দামী দামী বড় বড় অয়েল পেন্টিং ঝুলছে।

ঘরের চার কোণে ষ্ট্যাণ্ডের পরে জয়পুরী পিতলের টবে পামট্রি… ঘরটা খালি।

pathagar.net

সুব্রত ইতস্ততঃ তাকাতে লাগল, কি করবে এখন সে? কোন পথে যাবে এবার?

এমন সময় হঠাৎ সামনের একটা পর্দা তুলে ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের একটি অতি-সুদর্শন যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

বড় বড় দুটি হরিণের মত গভীর কালো ছল ছল চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে যেন গভীর এক আকুলতা।

এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বিস্রস্ত এলোমেলো। টিকোল নাসা।

পরণে দামী শান্তিপুরী ধুতি। গায়ে গরম পাঞ্জাবী।

ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরের মধ্যে সুব্রতকে দেখে থেমে গিয়ে আবার সুব্রতর দিকে এগিয়ে এলেন।

সুব্রত স্পষ্টই লক্ষ্য করলো এবার। ভদ্রলোক বাঁ পাটা যেন একটু টেনে টেনে চলছেন। সুব্রতর আজ সকালে পাওয়া চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল।

সুব্রতই প্রথমে প্রশ্ন করল, আপনি বোধহয় এ বাড়িরই কেউ হবেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ—

আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

বিনয়েন্দ্র সরকার—

গজেন বাবুর বৈমাত্রেয় ভাই—তাই না?

হ্যাঁ। কথাটা বলে ভদ্রলোক যেন রীতিমত বিস্ময়ের সঙ্গেই কয়েকটা মুহূর্ত সুব্রতর দিকে তার ডাগর চোখের নীরব দৃষ্টি নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে কোনমতে একটা ঢোক গিলে বললেন, কিন্তু আপনি? আপনাকে ত—

সুব্রত স্মিতভাবে বললে, চিনবেন না। আমার নাম সুব্রত রায়। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর মিঃ তালুকদার এখানে আছেন।

আপনি পুলিশের লোক?

হ্যাঁ।

উপরে তাঁরা সব আছেন, চলুন।

মৃতদেহ কোথায়?

উপরে লাইব্রেরী ঘরে।

আমাকে ঘরটা একটু দেখিয়ে দিতে পারেন?

হ্যাঁ,—চলুন।

বিনয়েন্দ্রবাবুর পিছনে পিছনে সুব্রত অগ্রসর হলো। হলঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ওরা একটা লম্বা টানা বারান্দায় এসে পড়ল।

boiRboi.net

বারান্দার শেষ সীমান্তে দোতলায় ও তিনতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িটা আগাগোড়া মারবেলপাথরের তৈরী, প্রশস্ত। সিঁড়ি বেয়ে উপরে দোতলায় এলো ওরা।

দোতলায়ও একতলার অনুরূপ একটা টানা বারান্দা। বারান্দায় রেলিংয়ের গা ঘেঁষে পিতলের টবে নানাপ্রকারের পাতাবাহার। পামট্রি ও সিজিন ফ্লাওয়ারের বিচিত্র সমাবেশ।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা ঘরের পর্দা তুলে বিনয়েন্দ্র বললেন, এই ঘরে।

সুব্রত ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে ঐ সময় কেউ ছিল না। আকারে ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছান। ঘরের মধ্যে চার পাশের দেওয়ালের কোলঘেঁষে সার সার কাচের আলমারী। প্রত্যেকটি আলমারীর মধ্যে থাকে থাকে সব বই সাজান। ঘরের মধ্যে দু'তিনখানি, দামী গদী আঁটা সোফা ও কাউচ। খান দুই ছোট টেবিল।

ঘরের এককোণে একটি ভেনাসের প্রতিমূর্তি। প্রতিমূর্তির ঠিক নীচেই একটি সুবৃহৎ দামী ঘড়ি। দুটো বেজে বন্ধ হয়ে আছে। ঘরের চার দেওয়ালে চারটি অয়েল পেন্টিং।

হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ল, ঘরের দক্ষিণ কোণে যেখানে বোধ হয়তো পাশের ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে, তারই সামনে ছোট একটি টেবিল। টেবিলের পরে একখানা মোটা বই খোলা।

টেবিলের সামনেই একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ।

বিনয়েন্দ্র বললে, ঐ যে।

সুব্রত এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধ মারা গেছেন কে বলবে? যেন চোখ বুঁজে বসে আছেন। কী ধীর সৌম্য শান্ত বৃদ্ধের চেহারা! শ্বেতশুভ্র চুলগুলি বিস্রস্ত এলোমেলো। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। পরিধানে দামী পায়জামা ও শালের পাঞ্জাবী। নিমীলিত দুটি আঁখি। বাঁ হাতটা আরাম কেদারার হাতলের পর দিয়ে নীচের দিকে ঝুলছে, ডান হাতটি কোলের পরে। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে যেন মৃত্যু এসে নিঃশব্দে আসন পেতেছে তার।

ঐ সময় সামনের পর্দা তুলে তালুকদার এসে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করলেন, এই যে সুব্রতবাবু এসে গেছেন!

সুব্রত তালুকদারের দিক মুখ তুলে তাকাল।

মৃতদেহ দেখলেন? ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছেন। কোথাও এতটুকু struggle-এর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সুব্রত মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, ডাঃ আমেদকে খবর দিয়েছেন তালুকদার?

হুঁ! এখানে আসবার আগেই। এখুনি হয়ত তিনি এসে পড়বেন। কিন্তু

BoiRboi.net

আপনি সংবাদ পেলেন কি করে ?

সুব্রত সংক্ষেপে চিঠি প্রাপ্তির কথা খুলে বললে। তারপর আবার প্রশ্ন করলে, মৃত্যুর কারণ কিছু পেয়েছেন তালুকদার ?

না। মৃতদেহ আমি স্পর্শ করিনি। তবে বাইরে থেকে যতটুকু সম্ভব পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন আঘাতের চিহ্নই চোখে পড়েনি। মনে হচ্ছে হয়ত কেস্‌টা সুইসাইড হতে পারে।

সুব্রত কোন জবাব না দিয়ে মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

মৃত সরকারের পাঞ্জাবীর বোতামগুলি খোলা। পাঞ্জাবীর বুকের বাঁ দিককার অংশ বাঁ দিকে ঝুলে পড়েছে। সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ দেখতে দেখতে নজরে পড়ে, মৃতদেহের বুকে ছোট একটি রক্তবিন্দু শুকিয়ে কালো হয়ে যেন জমাট বেঁধে আছে !

আরো নজরে পড়ল, মৃতের নাকের পরে ছোট ছোট দুটি কিসের দাগ ! সুব্রত একটু নীচু হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ যেন একটা মিষ্টি গন্ধ পায় সুব্রত ! মৃতের মুখ থেকে ও গন্ধটা পাওয়া যায়। সুব্রত আঙুলের নখ দিয়ে বুকের রক্তবিন্দু তুলে ফেলতেই দেখতে পেল, একটা সূচ্যগ্র পরিমাণ ছিদ্র !

মিষ্টি গন্ধটা কিসের হতে পারে ? হঠাৎ মনে হয় সুব্রতর ক্লোরোফরমের গন্ধ নয়ত—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ক্লোরোফরমের সাহায্যে অজ্ঞান করে তীক্ষ্ণ সূচের মত কোন অস্ত্রের সাহায্যে একেবারে হৃদপিণ্ডকে বিদ্ধ করে মৃত্যু ঘটান হয়নি ত ? ঐ সময় পুলিস সার্জন ডাঃ আমেদ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, good morning মিঃ রায়, মিঃ তালুকদার।

Good morning ! ওরাও প্রত্যুত্তরে বললেন।

মৃতদেহ কোথায় ? ডাঃ আমেদ প্রশ্ন করলেন।

ঐ যে দেখুন। বলে সুব্রত আঙুল তুলে দেখাল।

ডাঃ আমেদ সুব্রতর নির্দেশমত মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ডাঃ আমেদের পরীক্ষা হয়ে গেলে, সুব্রত ডাঃ আমেদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মিঃ সরকার কতক্ষণ মারা গেছেন বলে আপনার মনে হয় ডাঃ আমেদ ?

রাইগারমর্টিস্ বেশ ভাল করেই হয়েছে। মনে হয় রাত্রি সাড়ে নয়টা থেকে দেড়টার মধ্যে কোন এক সময় মারা গেছেন—কোন বিষের ক্রিয়ায়—কারণ মৃতদেহের বাঁ দিককার fifth intercostal space-এ mamary line থেকে একটু laterally ও below-তে যে puncture wound দেখা যাচ্ছে—

সুব্রত বলে, হ্যাঁ—

ডাঃ আমেদ বলেন, তাই আমার মনে হচ্ছে, ঐ wound কোন needle জাতীয় instrument এর সাহায্যে হয়ে থাকবে—

তালুকদার বলেন, স্পষ্ট করে আর একটু বলুন ডক্টর আমেদ।

মনে হচ্ছে কোন বিষ needle-এর সাহায্যে একেবারে হার্টে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে—অবশ্য ময়না তদন্তে সবই প্রকাশ পাবে—

You mean—

ঠিক তাই। এটা suicide বলে মনে হয় না তালুকদার সাহেব। খুব সম্ভব a case of homicide—হত্যা—মার্ডার—

আপনার কি তাই মনে হয়?

হ্যাঁ। তাছাড়া—

কি?

ঐ সময় সুব্রত কথা বলে।

মৃত ব্যক্তির নাকের ডগায় দু' তিনটে yellow spots আছে! মৃত ব্যক্তির নাকের কাছে নাক দিয়ে শুঁকে দেখুন, chloroform-এর গন্ধও পাওয়া যায়।

তাই নাকি? দেখি। ডাঃ আমেদ সুব্রতর কথামত মৃত ব্যক্তির নাক পরীক্ষা করে ও শুঁকে দেখলেন, yes! you are right ওটা chloroform-য়েরই দাগ।

আমারও মনে হয় ডাক্তার যে, আগে chloroform করা হয়েছিল। পরে কোন হাইপোডারমিক নিডিল জাতীয় বস্তুর সাহায্যে হার্টকে puncture করতেই, shock-এ মৃত্যু হয়েছে।

ডাঃ আমেদ বললে, না, তা হতে পারে না। chloroform দিলে shock হবে কেন?

হবে না বুঝি?

না। কোন বিষ প্রয়োগ বলেই মনে হয়—

মৃতদেহ তাহলে ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করি? তালুকদার অতঃপর জিজ্ঞাসা করল।

করুন। আমি তাহলে চলি···নমস্কার।

নমস্কার।

ডাঃ আমেদ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

boiRboi.net

॥ তিন ॥

সুব্রত তালুকদারের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে বললে, এখানকার সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন ? কে কে এখন বাড়ীতে আছেন ?

না, জবানবন্দী নিইনি এখনো। মিঃ সরকারের বড় ছেলে গনেন্দ্রবাবুকে সংবাদ পাঠান হয়েছে। এখুনি হয়ত আসবেন তিনি। একমাত্র তিনি ছাড়া ছোট ছেলে সৌরীন্দ্র, ভাগ্নে অশোক, ছোট ভাই বিনয়েন্দ্র সকলেই আছেন। মিঃ সরকারের সেক্রেটারী অনিমেষবাবুও আছেন। বাড়ীর চাকর-বাকরের মধ্যে মিঃ সরকারের বহুদিনকার পুরাতন ভৃত্য গোপাল ও থাকোহরি, ঠাকুর রামস্বরূপ, সোফার কিষণ সিং, দারোয়ান রণবাহাদুর থাপা, মালী হরি, সকলেই আছে।

বেশ। আগে একবার চলুন মিঃ সরকারের শয়ন কক্ষটা দেখে আসি। তারপর লাইব্রেরীটা আর একবার ভাল করে দেখবো। হ্যাঁ, ভাল কথা। মৃতদেহ সর্বপ্রথমে কার নজরে পড়ে ?

সে এক বিচিত্র ব্যাপার মিঃ রায়! এ বাড়ীর এক বিশেষ পরিচিত যুবক সুবিমল চৌধুরী। তিনি খুব ভোরে মিঃ সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শয়ন ঘরে মিঃ সরকারকে না পেয়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢোকেন। মিঃ সরকারের নাকি খুব ভোরে উঠে লাইব্রেরী ঘরে ঘণ্টাখানেক পড়াশুনা করা অভ্যাস ছিল। তাই তিনি লাইব্রেরীতে যান এবং তিনিই সর্বপ্রথমে মিঃ সরকারকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তখন চিৎকার করে সকলকে ডাকাডাকি করেন এবং পুলিশে সংবাদ দিতে বলেন। ছোট ভাই বিনয়েন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন না। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি বরাহনগরে এক বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ হলো এসেছেন। মোটামুটি এইটুকুই এখন পর্যন্ত আমি জানি।

হুঁ। ...বলতে বলতে সুব্রত মিঃ সরকারের লাইব্রেরী সংলগ্ন শয়ন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল।

শয়ন কক্ষটি বেশ প্রশস্ত। নরম পুরু গালিচায় ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া মোড়া। ঘরের এক কোণে একটি দামী মেহগিনি খাটের পালংক। পালংকের পরে ধবধবে পরিষ্কার শয্যা বিছান। নিভাঁজ নিখুঁত শয্যা। শয্যাটি যে গত রাত্রে ব্যবহৃত হয়নি সেটা দেখলে বুঝতে দেরী হয় না।

খাটের শিয়রের ধারে একটি শ্বেত পাথরের টিপয়ের পরে ফোন। তার একপাশে একটি সুদৃশ্য ভাংগা দামী সোনার রিষ্টওয়াচ। দুটো বেজে বন্ধ হয়ে আছে। একপাশে একটি কাচের গ্লাস ভর্তি জল। জলটিও ব্যবহৃত হয়নি বোঝা যায়।

ঘরের অন্য কোণে একটি আলনায় কয়েকটি জামা কাপড় ও স্যুট। তারই পাশে

boiRboi.net

একটি লোহার সেফ্। ও তার পাশে একটি আয়নাওয়ালা কাচের আলমারী। ঘরের মধ্যে আর কোন আসবার-পত্র নেই!

দেওয়ালে গোটা দুই ফটো! একটি ফটো, একজন স্ত্রীলোকের। অন্যটি, একটি বছর দশেকের ছেলে, একটা কাঠের ঘোড়ার পরে চেপে বসে আছে।

শয়ন ঘরটি দেখে সুব্রত এসে লাইব্রেরীতে ঢুকল! মৃতদেহের সামনে টেবিলের পরে রক্ষিত খোলা বইটার দিকে তাকাল। বইটা কৃত্তিবাসের রামায়ণ। হঠাৎ একটা শ্লোকের দিকে সুব্রতর নজর পড়ল। মৃত্যুপথযাত্রী লংকার অধীশ্বর রাবণের খেদ: একটি কবিতার চরণের নীচে ডিপ্ ভায়োলেট কালিতে আনডারলাইন করা। এবং আনডারলাইনের পাশেই একই কালিতে দুটি "× ×" চিহ্ন দেওয়া। লাইনটা হচ্ছে:

"হেলায় রাখিলে ফেলে কার্য নাহি হয়"

চকিতে কি একটা কথা সুব্রতর মনে পড়তেই, সুব্রত চট্ করে পকেট থেকে আজ সকালে প্রাপ্ত চিঠিখানা টেনে বের করে চিঠিটা খুলে ফেললে।

হ্যাঁ, অবিকল তার সন্দেহই ঠিক···একই কালি। চিঠির কালিই ব্যবহার করা হয়েছে বইয়ের পাতাতেও। দুটো কালি হুবহু একই রংয়ের!

সুব্রত অতঃপর ব্যাপারটা তালুকদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তালুকদার সেই চিঠি রামায়ণের পাতায় আণ্ডারলাইন করা কালির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বললে, হ্যাঁ, একই কালি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমি কি ভাবছি জান তালুকদার?

কি?

এই জনৈক বন্ধুটি কে?

দেখা যাক না এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। জনৈক বন্ধুটির সম্পর্কে এঁরা কেউ কিছু বলতে পারেন কিনা—

এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু জানা যাবে কিনা বলতে পারি না তালুকদার! তবে আমার মনে হচ্ছে—চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি সরকার পরিবারের বিশেষ কোন পরিচিতজনই হবেন।

আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে সুব্রত!

কি?

চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনিই। এই হত্যা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত না হলেও— এই হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই জানেন—

অসম্ভব নয় কিছু—

LoiRboi.net

নচেৎ তোমার চিঠি প্রাপ্তি ও ঐ চৌধুরী না কে, তার এখানে আজ সকালে আবির্ভাবের ব্যাপারটা—

একটা অদৃশ্য যোগাযোগ হয়ত আছে।

জবানবন্দী কি সুরু করব? তালুকদার প্রশ্ন করলেন।

তার আগে একবার উপরের তলাটা ভাল করে ঘুরে দেখে নিলে হতো না?

বেশ ত চলুন। আমি অবিশ্যি ইতিপূর্বে একবার দেখেছি।

উপরের তলায় সর্বসমেত সাতটি ঘর।

সুব্রত তালুকদারের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে বারান্দায় এলো। প্রথমেই যে ঘরখানা পড়ে—সেটা মিঃ সরকারের ছোট ছেলে সৌরীন্দ্রের শয়নকক্ষ।

সৌরীন্দ্রের ঘর থেকে মিঃ সরকারের ঘরে আসতে হলে বারান্দায় এসে তবে অন্য ঘরে যাওয়া যায়। দুই ঘরের মধ্যবর্তী কোন যাতায়াতের পথ নেই।

সৌরীন্দ্রের ঘরের পরেই মিঃ সরকারের ভাগ্নে অশোকের ঘর। সৌরীন্দ্রের ঘর থেকে যেমন লাইব্রেরীতে যাতায়াতের কোন পথ নেই,—তেমন অশোকের ও সৌরীন্দ্রের পরস্পরের ঘর থেকেও পরস্পরের ঘরে যাতায়াতের কোন পথ নেই।

অশোকের ঘরের পাশেই বিনয়েন্দ্রর ঘর—মিঃ সরকারের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই।

অশোক ও বিনয়েন্দ্রর ঘরের পরই মিঃ সরকারের খাস ভৃত্য রামচরণের ঘর। রামচরণের ঘরের পার্শ্ববর্তী ঘরটি খাওয়ার ঘর বা ডাইনিং হল।

গজেন্দ্রর শয়নকক্ষ, লাইব্রেরী, সৌরীন্দ্র ও অশোকের ঘরের পিছন দিকে এক একটি করে ছোট ব্যালকনী আছে। ঐ দিকটাই বাড়ীর পশ্চাৎদিক।

বাড়ীর পশ্চাৎভাগে একটা সরু গলি। গলির ওপাশে একটা মস্ত বড় পোড়ো মাঠ। মাঠের ওদিকে খানকয়েক বস্তী ঘর চোখে পড়ে। গজেন্দ্রর শয়ন ঘরের পিছন দিকে একটা ঘোরান লোহার সিঁড়ি বরাবর নীচে চলে গেছে। ওই সিঁড়ি দিয়ে মেথর যাতায়াত করে। গজেন্দ্রর ঘর থেকে ঘোরান সিঁড়ির দরজাটা সর্বদাই ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। তখনও ছিল।

অশোক মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তার ঘর ভর্তি শেলফে সব মোটা মোটা ডাক্তারী বই। ঘরের এক কোণে পার্টিশন দিয়ে সে ছোটখাট একটি ল্যাবরেটারী মতও করেছে।

এককালে সে কেমেষ্ট্রির ছাত্র ছিল। ডাক্তারী পড়তে পড়তে এখনো সে কেমেষ্ট্রির চর্চা করে। ইচ্ছা, ডাক্তারী পাশ করবার পর এম-এস-সি-টাও দেবে কেমেষ্ট্রিতে।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে। দিবারাত্র নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ছোটোখাটো শিশি, বোতল, ফ্লাস্ক, টেস্ট্‌টিউব, বুনসেন বার্নার, মাইক্রোসকোপ, ইত্যাদিতে তার ছোট ল্যাবরেটারীটি ভর্তি! শিয়রের পাশে ছোট একটি টিপয়। টিপয়ের পরে একটা

সোনার রিস্টওয়াচ : দুটো বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

সুব্রত একান্ত কৌতূহলবশে অশোকের ল্যাবরেটারীটি দেখতে লাগল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল ল্যাবরেটারীর টেবিলের এক পাশে একটি ফাইভ্ সি, সি-র রেকর্ড সিরিঞ্জ এবং সিরিঞ্জটার সঙ্গে লাগান একটা মোটা নিডল। সিরিঞ্জটা তুলে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, সিরিঞ্জটার মধ্যে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সুচ পরান সিরিঞ্জটা সিরিঞ্জের বাক্সর উপরে রাখা।

সুব্রত আস্তে আস্তে সিরিঞ্জ থেকে নিডলটা খুলে, নিডল ও সিরিঞ্জটা একটা কাগজে মুড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল। একটা কথা চকিতে তার মনে হয়, ঐ সিরিঞ্জ ও নিডিলের সাহায্যই নেওয়া হয়নি ত। সিরিঞ্জের মধ্যস্থিত জমাট বাঁধা রক্তটুকু এ্যানালিসিস্ করলেই হয়ত ব্যাপারটার পরে আলোকসম্পাৎ হবে। সুব্রত মনে মনে ভাবে—দুটি সূত্র পাওয়া গেল ; এক, চিঠির ডিপ ভায়োলেট কালি। দুই, সিরিঞ্জ।

ঐ সময় ভৃত্য এসে সংবাদ দিল মিঃ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র গনেন্দ্র সরকার এসেছেন। সুব্রত কিন্তু কোন জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে তখন অন্য এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সুব্রত লক্ষ্য করেছিল ঘরের পিছনের ব্যালকনীগুলি এত কাছে কাছে যে একটা ব্যালকনী থেকে অন্য ব্যালকনীতে অনায়াসেই লাফিয়ে যাওয়া যায়। তবে কী হত্যাকারী ঐ ব্যালকনী পথেই লাইব্রেরীতে কোন এক সময় প্রবেশ করেছিল।

॥ চার ॥

প্রথমেই ডাক পড়ল অশোকের।

লাইব্রেরী ঘরে বসেই জবানবন্দী নেওয়া সুরু হয়।

অশোক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

বেশ বলিষ্ঠ উঁচু লম্বা চেহারা। পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও গরম ফ্লানেলের ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী। মাথার চুলগুলি বিস্রস্ত এলোমেলো। চোখের চাউনি যেন ভীত চঞ্চল। রাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট আভাস চোখের কোলে।

বসুন। আপনার নাম অশোক—

আজ্ঞে, অশোক সেন।

ঐ সময় সুব্রত হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনার টেবিলের উপরে রাখা ঘড়িটা লক্ষ্য করেছেন কি—দুটো বেজে বন্ধ হয়ে আছে ?

নাত—

boiRboi.net

লক্ষ্য করেন নি ?

না।

মিঃ সরকারের ভাগ্নে হনত আপনি ?

হ্যাঁ।

আপনাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে রাত্রে আপনার তেমন ভাল ঘুম হয়নি। কাল রাত্রি জেগে খুব পড়াশুনা করেছিলেন বুঝি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সামনেই ফিপ্ত ইয়ারের পরীক্ষা।

কাল কত রাত্রি পর্যন্ত জেগেছিলেন ?

তা প্রায় রাত্রি একটা হবে !

আপনিত মিঃ সৌরীন সরকারের ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন। কোন প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ বা গোলমাল কিছু সৌরীনবাবুর ঘরে বা আপনার মামার ঘরে শুনেছিলেন কি ?

না।

আচ্ছা, মামাবাবুর সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক ছিল ?

তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। নিজের ছেলে সৌরীন্দ্রর থেকে কোন অংশেই তিনি আমাকে কম ভালবাসতেন না। তাছাড়া আজ প্রায় ষোল বছর মামার কাছেই ত আছি।

কাল কোথাও বের হয়েছিলেন আপনি ?

সন্ধ্যা সাতটার সময় আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকি। তারপর সারারাত ঘরেই ছিলাম।

খেতে বের হননি ?

না। কয়েকদিন থেকেই আমার খাবার চাকরেরা ঘরেই রেখে যায়। এ বাড়িতে সকলেই ন'টার মধ্যে খাওয়া শেষ করে। রাত্রি জেগে পড়তে হয় বলে আজ মাস খানেক থেকে আমি ঘরে বসেই খাই। কাল রাত্রে একটার সময় খেয়ে শুতে যাবার আগে গোপালকে ডেকে এঁটো থালা বাসন নিয়ে যেতে বলি। গোপাল এসে নিয়ে যায়।

তাহলে সারারাত্রি আপনি ঘরেই ছিলেন ?

হ্যাঁ !

আপনার মামার তাঁর ছেলেমেয়ের প্রতি ও তাঁর ছোট ভাইয়ের প্রতি ব্যবহার কি রকম ছিল বলতে পারেন ?

গনেনদা ত এ বাড়ীতে থাকেন না। মামার মতের সঙ্গে তাঁর মত মেলে না,

boiRboi.net

তাই তিনি আলাদাভাবে ব্যবসা করছেন এবং আজ প্রায় তিন বৎসর আলাদা বাসা ভাড়া করে বালীগঞ্জেই থাকেন। আর ছোট ছেলে সৌরীনদা এখানেই থাকে। মামার ব্যবসা দেখাশোনা করে।

গনেনবাবু আসাযাওয়া করেন না?

আসেন—কখনো সখনো। তাও এক আধ ঘণ্টার জন্য।

মিঃ সরকার কাকে বেশী ভালবাসতেন?

আমার মনে হয় মামা তাঁর ছোটছেলে সৌরীনদাকে যেন বড় ছেলে গনেনদার থেকে একটু বেশী ভালবাসতেন! আর ছোট মামা বিনয়েন্দ্রকেও মামা খুবই ভালবাসতেন!

আপনার মামার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

মামার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন কিছুই আপনাকে আমি বলতে পারব না। তাছাড়া মামা চিরদিনই একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। কারও সঙ্গে বেশী কথা বড় একটা বলতেন না!

কাল আপনার মামার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

না। অশোকের গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা সে সামলে নিল এবং বললেন, মামা রাত্রে যেমন একটু দেরী করে শুতেন, তেমনি আবার ভোরে উঠতেন। রাত্রে এবং সকালে ঘণ্টাখানেক লাইব্রেরী ঘরে কাটাতেন—তারপর প্রায় বেলা সাতটার সময় দোকানে বের হয়ে যেতেন। ইদানিং তিনি ব্লাডপেসারে ভুগছিলেন বলে রাত্রে একবাটি দুধ ও ফল ছাড়া বিশেষ কিছুই খেতেন না। সেও নিজের ঘরে বসে খেতেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে স্নান করে লাইব্রেরীতে ঢুকতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। এই সব কারণে বাড়ির কারো সঙ্গেই বড় একটা তাঁর দেখাশুনা হতো না।

কবে শেষ আপনার মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

পরশু রাত্রে। আমি তখন সবে কলেজ থেকে ফিরেছি, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হবে, তিনি আমাকে তাঁর লাইব্রেরীতে ডেকে পাঠান!

কেন?

আমার পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে…

তারপর আর মামার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না। এবারও অশোকের গলার স্বরে যেন একটু দ্বিধা।

আপনার মামার কোন উইল আছে কি না সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একবার তাঁর হঠাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি হওয়ায় মাইলড একটা

boiRboi.net

হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। মামার হার্ট এ্যাটাক হওয়ায় আমি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার চোখে জলও এসে গিয়েছিল। সেই সময় তিনি বলেছিলেন কাঁদিস কেন অশোক? মামা কি কারও চিরদিন বেঁচে থাকে রে। সম্পত্তি ও টাকার এক তৃতীয়াংশ তোর নামে উইলে লিখে দিয়েছি। দুই পুরুষ তোর কোন অভাবই হবে না, যদি বুঝে চলতে পারিস। তাছাড়া আমার টাকা থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুই পাবি!

আর সবাইকে কি দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সেদিন কিছু বলেছিলেন?

না।

আচ্ছা, আজ সকালে প্রথম কি করে ব্যাপারটা আপনি জানতে পারলেন?

সুবিমলদার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়!

এই সুবিমলবাবুটি কে?

সুবিমলদা মামার দূর সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই। রাজলক্ষ্মী মিলে চাকরী করেন। এ্যাভিন্যু হোটেলে থাকেন।

সুবিমলবাবু কি আপনাদের এখানে প্রায়ই আসাযাওয়া করেন নাকি?

হ্যাঁ। মামাবাবু সুবিমলদাকে খুব পছন্দ করতেন। তবে—

কি থামলেন কেন, বলুন।

মামাবাবু ওকে মধ্যে মধ্যে শুনেছি বকাবকি করতেন।

কেন?

শুনেছি, বড্ড বেহিসেবী ও খরচে বলে—

আপনার মামাবাবু বোধহয় তাকে সাহায্য করতেন?

হ্যাঁ। প্রায়ই মামাবাবুর কাছে সুবিমলদা টাকা চাইতে আসতেন।

সুবিমলবাবুকে আপনার কি রকম লোক বলে মনে হয়?

ভাল বলেই ত মনে হয়।

আচ্ছা এখন আপনি যেতে পারেন। সৌরীনবাবুকে পাঠিয়ে দিন!

একটু পরে সৌরীন্দ্র এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সুব্রত আগন্তুকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

সৌরীন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে হবে। গায়ের রং একটু চাপা। পিতা মিঃ সরকারের মতই বেশ বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। পরিধানে দামী ধুতি, গায়ে দামী শাল। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। দেখলেই মনে হয় একটু বাবু গোছের। চোখের কোলে দুটো ফোলা ফোলা। বোধহয় কাঁদছিলেন।

boiRboi.net

বসুন। সুব্রত বললে, আপনার নাম সৌরীন্দ্র সরকার ?

হ্যাঁ !

কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সৌরীন্দ্রবাবু। আশা করি যথাযথ জবাব পাবো।…হ্যাঁ, ভালকথা, আপনার কোন ঘড়ি নেই।

আছে। রিস্ট্‌ওয়াচ—

ঠিক আছে ? মানে ঘড়িটা চলছে ?

না। ঘড়িটা রাত্রি দুটোর পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলা চালিয়ে দিয়েছি আবার। এখন সোয়া দশটা…সৌরীন্দ্রবাবু তারপর অশ্রুঝরা কণ্ঠে হঠাৎ বললেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন !

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একটা মস্তবড় ষড়যন্ত্র করে আমার নিরীহ বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীকে আপনি ধরে দিন। যত টাকা লাগে আমরা দেব ! চিরদিন আমরা সকলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

অধীর হবেন না সৌরীনবাবু ? আমাদের যথাসাধ্য আমরা করবো। এবং আশা করি খুনীকে ধরতেও পারবো। এখন আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তার জবাব দিন।

বলুন।

কাল সন্ধ্যার পর থেকে আজকের সকাল পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

কাল সকালে আমি ব্যাংকে চলে যাই। ব্যাংক থেকে ফিরতে প্রায় রাত্রি আটটা হয়। রাত্রি নয়টার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে যখন শুতে যাচ্ছি, বাবা আমাকে ডেকে পাঠান। বাবা তখন লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ছিলেন।

কতক্ষণ সেখানে ছিলেন ?

তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

অর্থাৎ রাত্রি দশটার সময় আপনি লাইব্রেরী ঘর থেকে বের হয়ে আসেন ?

হ্যাঁ !

আপনার বাবার সঙ্গে যখন দেখা করতে যান, তাঁকে কোনরকম চিন্তিত বা তাঁর ব্যবহারে অস্বাভাবিক কোন কিছু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলেন ?

সৌরীন্দ্র এ কথায় যেন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে মৃদু স্বরে বললে, না।

আচ্ছা, ইদানিং আপনার বাবার ব্যবহারে কোনপ্রকার কিছু চাঞ্চল্য বা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন ?

না !

আপনার বাবার আপনার প্রতি ব্যবহার কেমন ছিল ?

boiRboi.net

বাবা আমাকে যথেষ্টই ভালবাসতেন।

আপনার দাদার সঙ্গে আপনার বাবার ব্যবহার কেমন ছিল ?

দাদার সঙ্গে ইদানিং আজ তিন বৎসর আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্কই নেই। তবে বাবা চিরদিন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বিশেষ কিছু বোঝা যেত না। কারও 'পরে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে তিনি সেটা কোনদিনই প্রকাশ করতেন না।

আপনার বাবার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয় ?

না। বাবা অত্যন্ত নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কারও সঙ্গে গোলমাল তাঁর হতো না।

শুনেছি ইদানিং আপনি আপনার বাবার সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা ও ব্যাংকের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন ?

হ্যাঁ।

আপনাদের ব্যবসার অবস্থা কেমন ? মূলধন কত ?

ব্যবসার অবস্থা ভালই। কোন গোলমাল নেই। মূলধন যে কত তা ঠিকঠিক আপনাকে বলতে পারবো না। এ্যাটর্নী রামলাল মিত্র মহাশয় আপনাকে সঠিক খবর দিতে পারবেন। তবে আন্দাজ উনিশ-বিশ লক্ষ টাকা হবে।

আপনার বাবার উইল সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?

না।

হুঁ। আচ্ছা আপনার পিসতুতো ভাই অশোকবাবুকে আপনার কি রকম মনে হয় ?

ভালই। অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও মেধাবী ছাত্র। চিরকাল আমাদের বাড়িতেই মানুষ। বাবাও তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

আর আপনার কাকা, বিনয়বাবু ?

কাকাকে বাবা খুবই ভালবাসতেন এবং মনে হয় কাকাও বাবাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন।

আপনার কাকা যে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে আছেন তার জন্য আপনার বাবা অসন্তুষ্ট হন নি ?

না। শুনেছি প্রথম প্রথম দু'একমাস বাবা কাকাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু কাকা চিরকালই একটু একগুঁয়ে ও জেদী। কারও কথাই তিনি শুনতেন না। শেষে আর বাবা কিছু বলতেন না।

আপনার বাবার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে পারেন ?

না।

কাল রাত্রে আপনার বাবার সঙ্গে আপনার কি কথা হয় ?

ক্ষমা করবেন, সেটা আমাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত, একেবারে আমাদের নিজস্ব

boiRboi.net

কথা। সে সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে এটা জানবেন তাঁর সঙ্গে এ মৃত্যুর কোন সংস্পর্শ ই নেই।

সুব্রত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, রাত্রি দশটার পর আপনি আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে সোজা নিজের ঘরেই চলে যান। আপনিত আপনার বাবার ঘরের পাশের ঘরেই থাকেন। রাত্রে কোনপ্রকার শব্দ বা গোলমাল শুনেছিলেন কি ?

আজ্ঞে না। সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ঘুম পেয়েছিল। ঘরে এসে বিছানায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি।

রাত্রে তাহলে কোনরকম কিছু অস্বাভাবিক গোলমাল বা শব্দ শোনেননি ?

না। তাছাড়া ঘুম আমার একটু চিরকালই গভীর।

আজ সকালে কখন জানতে পারেন যে, আপনার বাবা মারা গেছেন ?

সুবিমলের চিৎকারে চাকর রামচরণ গিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গায়।

সুবিমলকে আপনার কিরকম মনে হয় সৌরীনবাবু ?

সৌরীন্দ্র সুব্রতর প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার মুখের রেখায় রেখায় যেন একটা সুস্পষ্ট ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেই আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সৌরীন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, শুনলাম সুবিমলবাবু নাকি প্রায়ই আপনার বাবার কাছ থেকে টাকা নিতেন।

হ্যাঁ। একটা first class বেহিসেবি! তিনশত টাকা মাইনে পায়। তাতেও তার একলার কুলায় না। শুনি, সে জুয়াও খেলে!

অকস্মাৎ এমন সময় সুব্রত তার পকেট থেকে আজ সকালের প্রাপ্ত চিঠিখানা বের করে সৌরীন্দ্রর চোখের সামনে ধরে বললেন, বলতে পারেন, এই চিঠিখানা কার লেখা ? হাতের লেখাটা চেনেন ?

সৌরীন্দ্র চিঠিখানার পরে একটিবার মাত্র দৃষ্টি বুলিয়েই যেন অত্যন্ত চঞ্চল ও বিস্মিত হলো। হ্যাঁ, এত সুবিমলেরই হাতের লেখা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এ সুবিমলেরই লেখা চিঠি। সুবিমলই এ চিঠি লিখেছে। কিছুদিন আগে একবার টাকার ব্যাপারে সুবিমলের সঙ্গে বাবার ঝগড়াও হয়েছিল। বাবা সুবিমলকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তারপর সে আবার একদিন রাত্রে এসে বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেয়।

হঠাৎ এমন সময় কার কণ্ঠস্বরে ঘরের সকলেই চমকে পিছন দিকে ফিরে তাকালে।

—কার কথা হচ্ছে শুনি ? আমারই কথা হচ্ছে বোধ হয়।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কে আপনি ?

আমি ? সুবিমল চৌধুরী। আপনি ?

সুব্রত রায়।

যাক, ভালোই হলো। আপনি এসে গেছেন দেখছি, নমস্কার। শুনতে পাই কি, আমার সম্পর্কে কি কথা হচ্ছিল। শুনতে পেলে আমি নিজেই সবকিছু খোলসা করে দিতে পারতাম। কেন না আমার নিজস্ব ব্যাপার অন্যের চাইতে আমি নিজেই বেশী ভাল জানি আশা করি !

সুব্রত এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাল করে সুবিমলের দিকে তাকিয়ে ছিল।

॥ পাঁচ ॥

সুবিমল চৌধুরী !

লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি হবে। রোগা ঢ্যাঙ্গা পাতলা চেহারা। চোখ দুটি টানা টানা। দৃষ্টি যেন দু'খানা ধারাল ছুরির ফলার মতই বুদ্ধি প্রাচুর্যে ঝকঝকে। টানা উদ্ধত ভ্রু। নাকটা একটু বোঁচা। সামনের দুটি দাঁত একটু উঁচু। বাঁ গালের পরে একটি দু'ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষতচিহ্ন। মাথার চুল ব্যাকব্রাস করা। বেশভূষা অত্যন্ত পরিপাটি। দামী মভ্ কলারের গরম স্যুট পরিধানে। পায়ে দামী পালিশ করা চকচকে পয়েনটেড টো সু। মুখে বর্মা চুরুট।

সুবিমল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, আমি জানতাম, আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে। তাই নিজেই চলে এলাম, আপনাকে কষ্ট না দিয়ে। সত্যি আমি খুব খুশি হয়েছি মিঃ রায় যে, আপনি নিজেই কেসটা হাতে নিয়েছেন। কেন না আমার ধারণা, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। মিঃ সরকারকে খুন করা হয়েছে।

মিঃ সরকার যে খুনই হয়েছেন, স্বাভাবিক মৃ্যু তাঁর হয়নি বা হতে পারে না এ ধারণা হলো কেন আপনার, মিঃ চৌধুরী ?

সেই কথা বলতেই আমি এসেছি সুব্রত বাবু। আমার কথা সব শুনলেই হয়ত বুঝতে পারবেন, কেন আমার এ ধারণা হলো।

বলুন।

সৌরীন্দ্রর সামনে আমি কোন কথা বলতে রাজী নই। ওকে এ ঘর থেকে আগে যেতে বলুন মিঃ রায়।

কিন্তু আমারও যা বলবার তা বলা এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া যা তুমি বলতে চাও, আমার সামনেই অনায়াসে বলতে পারো। সৌরীন্দ্রবাবু বাধা দিলেন।

বলতে যে আমি পারবো না, তা নয় সৌরীন। কিন্তু তবু আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি

boiRboi.net

এখন এ ঘরে থাক। আমার মনে হয় এ সময় তোমার এ ঘরে না থাকাই ভাল।

সুবিমলবাবু জবাব দিলেন।

সুব্রত এতক্ষণে কথা বললে, সৌরীনবাবু, আপনি না হয় পাশের ঘরে যান। প্রয়োজন হলে তখন আপনাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

বেশ, যাচ্ছি। একটু রাগত ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করে সৌরীন্দ্রবাবু সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুব্রত সুবিমলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, এবারে বলুন, মিঃ চৌধুরী। আপনি কি বলতে চান ?

সুবিমলবাবু তখন বলতে লাগলেন, জানি না, আপনি জানেন কিনা মিঃ রায়, মিঃ গজেন্দ্র সরকার দূর সম্পর্কে আমার মামাত ভাই ছিলেন। এদের বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত এবং পরিচয়ও সেই সূত্রেই। এ বাড়ির সবকিছুই আমার একপ্রকার নখদর্পনে বলতে পারেন। মিঃ সরকার, মানে গজেনদা বয়সে আমার চাইতে অনেক বড় ছিলেন। তিনি যে সম্পর্কে কেবলমাত্র আমার মামাত ভাই-ই ছিলেন, তা নয়, সত্যিকারের একজন বন্ধুও ছিলেন। বলতে বলতে সুবিমলবাবুর স্বরটা যেন গাঢ় হয়ে এল। আজ তাঁকে হারিয়ে আমি সত্যিকারের একজন সহায় সম্বল হারালাম।

আমি জানি, গজেনদার বাবা যখন মারা যান, তখন তাঁর সম্বলের মধ্যে বৌবাজারে একটি ছোট সোনা রূপার দোকান মাত্র ছিল। সেই দোকান থেকেই তিনি প্রভূত যত্নে ও অদম্য অধ্যবসায়ে আজকের এই এতবড় ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক গড়ে তোলেন। গজেনদার বড় ছেলের বয়স যখন মাত্র একুশ বৎসর সেই সময় বৌদি মারা যান। তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। অত বড় ধনী হলেও মনে তাঁর এতটুকুও শান্তি ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক তাঁর মনে কেউ হাজার ব্যথা দিলেও মুখ ফুটে কোনদিন কারও কাছে কিছু বলতেন না। নিজের মনের কষ্ট চিরদিন নিজের মনেই চেপে রাখতেন।

যারা তাঁকে কোনদিন ভাল করে বুঝবার সুযোগ বা সুবিধা পেয়েছে কেবলমাত্র তারাই তাঁর মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারত কতবড় একটা দুঃখে তাঁর মনটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনের কথা তিনি কখনো কাউকেই খুলে বলতেন না। তবে আমার কাছে তিনি মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলতেন। আমি জানি— অনেকখানি আশা করেই তিনি গনেনকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু গনেন ছিল অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির। একদিন সামান্য কারণে সে গজেনদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তবু তিনি তাঁর পিতার কর্ত্তব্য থেকে বিচলিত হন নি।

টাকা পয়সা দিয়ে তাকে পৃথক ভাবে ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। ইদানিং অবিশ্যি আর ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না।

তারপর ছোট ছেলে সৌরীন। তাকে তিনি পড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন। সৌরীন ছেলেটিও মেধাবী ছিল। হঠাৎ বি. এস-সি পাশ করে পড়াশুনা ছেড়ে দিল। গোঁ ধরলো আর সে পড়াশুনা করবে না। বছর খানেক সে বাড়িতে চুপচাপ বসে রইলো। যত রকমের আড্ডায় ঘুরে ঘুরে বেড়াল। তারপর সে শুরু করলে রেস খেলা। গজেনদা এ বাড়ির প্রত্যেকের জন্যই মাসিক একটা হাত খরচ বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। সৌরীন মাসে দুশো, অশোক মাসে আড়াইশো, বিনয়দা মাসে দুশো করে টাকা পেত। সৌরীনের দুশো টাকায় চলত না। প্রায়ই সে গজেনদার কাছ থেকে আজ দুশো কাল একশো, এই রকম করে মাসিক ধার্য হাত খরচ ছাড়াও শ দুই তিন করে টাকা বেশী নিত। এই সময়ই সৌরীন ব্যবসা দেখাশুনা করতে শুরু করলে। মাস দুয়েক আগে হঠাৎ একদিন সে দোকানের ক্যাশ থেকে গজেনদাকে কিছু না বলে গজেনদার নামে টাকা তুলে নেয়। দিন দুই বাদে হঠাৎ সেকথা গজেনদা দোকানের ক্যাশিয়ারের মুখে শুনতে পেলেন, বাপে ছেলেতে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। ঐ দিন থেকেই বাপে ছেলেতে মনোমালিন্য শুরু হলো এবং তারপর থেকে প্রায়ই দু'জনার মধ্যে পয়সা নিয়ে খিটিমিটি চলতো।

গজেনদার উইলের ব্যাপারটাও আমি জানি। তাঁর সম্পত্তি সমান দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ, নানা প্রকারের হিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করা হবে। দ্বিতীয় ভাগ, সমান অংশে চার ভাগ—একভাগ সৌরীন, একভাগ অশোক, একভাগ বিনয়দা, আর একভাগ আমি! উইলের ব্যাপারেও সৌরীনের খুব আপত্তি ছিল। কিন্তু গজেনদা সৌরীনের কোন কথাই শোনেন নি। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটেছিল। কিছুদিন আগে সৌরীন তার এক বন্ধুর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার নেয়। সেই ব্যাপার নিয়ে আজ কয়েকদিন থেকেই সৌরীন ও গজেনদার সঙ্গে রাগারাগি চলছিল। এসব থেকে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন—মানে, আমি কি বলতে চাইছি—

সুব্রত শান্ত কণ্ঠে বললে, হুঁ! আচ্ছা, সেই জন্যেই কি আপনি সকালে আজ আমার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী?

সুবিমল যেন আকাশ থেকে পড়েছে হঠাৎ। বিস্ময়ে হতবাক্। বললে চিঠি!

হ্যাঁ, আপনিইত' আজ সকালে আমাকে চিঠি দিয়েছেন। এইত সেই চিঠি! বলতে বলতে সুব্রত পকেট থেকে সেই আকাশ-নীল রংয়ের খামের চিঠিখানা সুবিমল বাবুর হাতে তুলে দিয়ে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

boiboi.net

সুবিমলবাবু সুব্রতর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে তাকাতে তাকাতে বলে, আশ্চর্য। আশ্চর্য।

চিঠিখানা আপনারই লেখা ত সুবিমলবাবু? সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে!

আশ্চর্য! অবিকল আমারই হাতের লেখা। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি সুব্রতবাবু, বিশ্বাস করুন, এ চিঠিটা আমার লেখা নয়।

আর চিঠির কালিটা?

আরো আশ্চর্য, ঠিক এই ধরণের কালিই আমার কাছে আছে! এটা একটা Special কালি। Chineese violet ink. আমার এক বন্ধু আর্টিস্ট কিছুদিন হলো চীন থেকে ফিরেছেন। তিনি আমাকে মাস সাতেক আগে কালিটা উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আমি কালিটা ব্যবহার করি বটে এবং কালিটা প্রায় ফুরিয়েও এসেছে!

আপনার সেই বন্ধুটির নাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

নিশ্চয়ই? বন্ধুটির নাম সুবোধ দত্ত। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট…নং এ থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি সব জানতে পারবেন।

সুব্রত নোটবুক বের করে নাম ঠিকানা টুকে নিল।

সুবিমলবাবু, আপনাকে আমার আরো কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

বলুন।

গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?

সুবিমলবাবু সুব্রতর কথায় মৃদু হাসলেন, আপনি বোধহয় জানেন না মিঃ রায় রাজলক্ষ্মী মিলে আমি চাকরী করি। গতকাল সন্ধ্যা সাতটার পর মিল থেকে বাড়ি ফিরেছি। চা খেয়ে Rainbow Club-এ যাই। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত আমি Rainbow Clubয়েই ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে সোয়া ছয়টা নাগাদ গজেনদার এখানে আসি।

কেন?

আমার কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল।

তারপর—

আমি জানি, তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টাখানেক লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করেন। তাই বরাবর তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকি। এবং ঘরে ঢুকেই তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পাই। তখনই ডাকাডাকি করে সকলকে জাগাই। এবং পুলিশে খবর দিতে বলে হোটেলে চলে যাই। হোটেলে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো,

boiRboi.net

পুলিশ এলে হয়তো আমাকে তাদের প্রয়োজন হতে পারে—তাই আবার চলে এলাম।

আপনি তাহলে মধ্যে মধ্যে মিঃ সরকারের কাছ থেকে টাকা নিতেন।

হ্যাঁ নিতাম।

আচ্ছা, শেষ কবে আপনার মিঃ সরকারের সঙ্গে দেখা হয়?

দিন পাঁচেক আগে সন্ধ্যার পর এখানে এসেছিলাম, সেই শেষ দেখা। তারপর আর দেখা হয়নি।

সুব্রত এবার বললে, আচ্ছা সুবিমলবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন। প্রয়োজন হলে আবার আপনার ওখানেই গিয়ে দেখা করবো। কখন আপনাকে আপনার হোটেলে পাওয়া যেতে পারে?

সকালে বেলা এগারটা পর্যন্ত। আর সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত। আটটার পরে Rainbow Club-এ গেলেও দেখা পাবেন। প্রত্যহই আমি সেখানে যাই।

সুবিমলবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা, তাহলে আসি। নমস্কার!

সুবিমলবাবু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

সুব্রত গনেনবাবুকে এরপর ডেকে পাঠাল।

মিঃ তালুকদারের মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বললে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন তালুকদার, মিঃ সরকারের লাইব্রেরীর বড় ওয়াল ক্লকটা, তাঁর হাত ঘড়িটা, অশোকের ঘরে টি' পয়ের পরে রাখা রিষ্টওয়াচটা, সৌরীনবাবু রিষ্টওয়াচটা, সব কটাই ঠিক রাত্রি দুটোর সময় বন্ধ হয়ে গেছে।

সুব্রতর কথা শেষ হবার আগেই গনেনবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করেন।

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

মাথার সামনের দিকে দু'পাশে টাক দেখা দিয়েছে। কপালের ও রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। দাঁড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামান। পরিধানে এ্যাস্‌কলারের দামী গরম স্যুট! পায়ে পালিশ করা চকচকে সু। বয়েস বোধকরি চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে হবে। মুখখানা গম্ভীর।

সুব্রতই প্রথমে কথা বললে, আসুন? নমস্কার। আপনারই নাম—

নমস্কার! গনেন্দ্রনাথ সরকার।

বসুন ঐ চেয়ারটায়। সুব্রত আঙুলি নির্দেশে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিল। গনেন্দ্র চেয়ারটার উপর উপবেশন করল।

boiRboi.net

আপনিই মহালক্ষ্মী ব্যাংকের প্রোপাইটার ?

না। এ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার।

ও!

অতঃপর দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ!

আবার সুব্রত প্রশ্ন করলে, কাল সারা দিনরাত্রিতে আপনি কোথায় ছিলেন ?

সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাংকে ছিলাম। তারপর মার্কেটে যাই। কয়েকটা জিনিসপত্র আমার কেনবার ছিল। জিনিসপত্র কিনতে কিনতে আমার রাত্রি নয়টা বাজে—নয়টার শোতে মেট্রোতে ছবি দেখতে যাই। এই দেখুন তার টিকিট। বলতে বলতে রাত্রি নয়টার শোর টিকিটের একটা অংশ গনেনবাবু পকেট থেকে বের করে দেখালেন।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে টিকিটখানা দেখে বললে, হুঁ! তারপর ?

রাত্রি সাড়ে বারেটার শো শেষ হলে বাসে প্রায় রাত্রি সোয়া একটার সময় বাসায় ফিরি। বাসায় ফিরে আজ সকাল সাড়ে নয়টার সময় ফোনে সৌরীনের কাছ থেকে খবর পেয়েই আসছি।

শুনেছি আপনার বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় আপনি আজ বছর:তিনেক হলো আলাদা হয়ে গেছেন ?

একটু ভুল শুনেছেন—মনোমালিন্য কিছুই হয়নি। মতের মিল হয়নি। তাই বাবার অর্থ সাহায্যেই আমি আলাদা হয়ে গেছি।

আপনি আলাদা হয়ে যাবার পর প্রায়ই আপনাদের এ বাড়িতে আসতেন ?

না। ক্বচিৎ কখনো আসতাম।

শেষ কবে আপনার বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয় ?

দিন পনের আগে বাবার ব্যাংকে।

তারপর আর দেখা হয় নি ? সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গনেন্দ্রর মুখের দিকে তাকাল।

একটু ইতস্ততঃ করে আস্তে আস্তে গনেন্দ্র বললেন, না!

আপনার প্রতি আপনার বাবার ব্যবহার কেমন ছিল ?

আগে খুবই ভালবাসতেন আমায়। তবে গত তিন বছর আলাদা হয়ে যাওয়ায় বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে দেখা হলে ভাল ব্যবহারই করতেন।

আপনার পিসতুতো ভাই অশোকবাবু সম্পর্কে ভাল আপনার কি ধারণা ?

অশোক মেধাবী ও ধীর শান্ত ছেলে। বাবা তাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন।

আর আপনার ছোট ভাই সৌরীন্দ্রবাবু ?

pathagar.net

সৌরীন্দ্রও ভাল ছেলে। তবে একটু জেদী ও একগুঁয়ে! তাছাড়া কানাঘুসায় শুনছি, সে নাকি রেস খেলতে শুরু করেছিল ইদানীং। এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু তার সম্পর্কে জানি না।

আপনার কাছে কোনদিন সে টাকার জন্য গিয়েছিল?

না!

আপনার বাবা সৌরীন্দ্রবাবুকে কেমন ভালবাসতেন?

মনে হতো আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সৌরীন্দ্রকেই একটু যেন বেশী ভালবাসতেন।

আপনাদের জ্ঞাতি সুবিমল সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? আপনার বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কে কিরকম ছিল?

শুনেছি সে বাবার কাছ থেকে মাঝে মাছে অর্থ সাহায্য নিত! তাছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই আপনাকে বলতে পারবো না। বাইরে থেকে যেটুকুই জানি তা ভাল বলেই মনে হয়।

আপনার বাবার উইল সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা?

না। এটর্নী রামলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন।

আচ্ছা, আপনার বাবার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

না। বাবা চিরদিনই শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী লোক ছিলেন। তাঁর কোন শত্রু থাকা একেবারেই সম্ভব নয়!

আচ্ছা, এখন আপনি যেতে পারেন। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন।

গনেন্দ্র সরকার তাঁর নাম ঠিকানা ও ফোন নাম্বারযুক্ত একখানা আইভরী কার্ড সুব্রতর হাতে দিয়ে ধীরপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুব্রত বিনয়েন্দ্র সরকারকে এবার ডেকে পাঠালেন।

সুব্রত আবশ্যকীয় কয়েকটা পয়েন্ট তার নোট বুকে নোট করে নিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ও শুনলো, কিরে সুব্রত?

সুব্রত লেখা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আরে কিরীটী! কি আশ্চর্য! তুই হঠাৎ কোথা থেকে?

কিরীটী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। তার পশ্চাতে বিনয়েন্দ্র বাবুও এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী বললে, বিনয় মানে মিঃ সরকারের ছোট ভাই কিছুদিন আমাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে বি. এস-সি. পড়েছিল একত্রে। সেই থেকেই ওর সঙ্গে চেনা। হঠাৎ আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে ফোনে আমাকে ডেকে সব কথা বলে আমার সাহায্য

boiRboi.net

চায়। তাই দেখতে এলাম যদি কিছু সাহায্য করতে পারি! তারপর তোর কতদূর?

যাক্, তুই এসেছিস ভালই হলো! ব্যাপারটা একটু জটিল বলেই মনে হচ্ছে!

বোস বিনয়। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বিনয়েন্দ্রবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

ব্যাপারটা কি বলত? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কিরীটীর অনুরোধে অতঃপর সুব্রত সংক্ষেপে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল।

কিরীটী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে সব শুনে গেল। তারপর মৃদুস্বরে বললে, এবার তাহলে বিনয়ের জবান বন্দী?

হ্যাঁ। সুব্রত জবাব দিল।

বেশ, শুরু কর তোর কাজ। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিক ঘুরে দেখে নিই, কেমন?

বেশত।

কিরীটী প্রথমেই মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেল! এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে লাগল।

এদিকে সুব্রত ততক্ষণে তার জবানবন্দী শুরু করেছে।

আপনি কাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে সারারাত্রি কোথায় ছিলেন বিনয়বাবু?

বরাহনগরে আমাদের এক বন্ধু সমীর সেনের বৌভাতের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যা সাতটার সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি প্রায় দেড়টা হয়ে যায়। তখন আর ফিরবার কোন উপায় নেই দেখে ওখানেই শুয়ে পড়ি। আজ সকালে প্রথম বাসে সাতটায় বাড়ি ফিরেছি।

শুনেছি আপনি মেডিকেল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে এখন আর্টের চর্চা করছেন।

হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই গান বাজনা ও ছবি আঁকার দিকে একটা টান ছিল। অন্য কোন কাজের থেকে সেটাই আমার বেশী ভাল লাগে, তাই—

আপনার দাদার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

দাদা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি যে তার সৎভাই, এটা কখনো জানতেই পারিনি।

আপনার সঙ্গে আপনার দাদার কখনো কোন ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি?

না।

আপনার দাদার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

boiRboi.net

না। আর থাকলেও বলতে পারি না।

সুবিমলবাবুর সঙ্গে আপনার দাদার কি রকম সম্পর্ক ছিল ?

সুবিমল মাঝে মাঝে দাদার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিত। মাঝখানে কিছুদিন আগে একবার দাদার সঙ্গে তার খুব ঝগড়াও হয়ে ছিল। দাদা তাকে বাড়ি থেকে বেরও করে দেন। পরে আবার সে এসে একদিন দাদার হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। সব মিটমাট হয়ে যায়। লোক যে ঠিক কিরকম তা বলতে পারবো না। তবে শুনেছি সে চিরদিনই একটু বেহিসেবী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। Rainbow ক্লাবের সে একজন মাতব্বর ব্যক্তি—শুনেছি।

অশোকবাবু সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম ?

অশোক বড় ভাল ছেলে। দাদা তাকে ছেলের মতই ভালবাসতেন।

আপনার দাদার উইল সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে ?

কানা ঘুসায় শুনেছি, দাদার সম্পত্তি দু'ভাগে ভাগ করা হবে। অর্ধেক Public Donation এ যাবে। বাকী অর্ধেক সমান ভাগে আমি, অশোক, সৌরীন ও সুবিমল পাবো।

কাউকে আপনি আপনার দাদার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন ?

সুব্রতর কথায় বিনয়েন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, না।

॥ সাত ॥

এমন সময় কিরীটী ওদের সামনে এগিয়ে এল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস সুব্রত ?

সুব্রত মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকাল, কি ?

মৃত ব্যক্তির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে একটা ছোট্ট পট্টি জড়ান !

বিনয়েন্দ্রবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, গতকাল সকালে কাচের গ্লাসে দুধ খেতে গিয়ে দাদার হাত থেকে কাচের গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা কাচের টুকরো টেবিল থেকে সরাতে গিয়ে দাদার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কেটে যায়। আমি তখন দাদার সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম।

কিরীটী শুধু মৃদুস্বরে বললে, হুঁ !

সুব্রত তখন বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি এখন যেতে পারেন বিনয়বাবু। অনুগ্রহ করে মিঃ সরকারের ভৃত্য রামচরণকে একটিবার পাঠিয়ে দিন।

বিনয়েন্দ্র ধীরভাবে ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

boiRboi.net

কিরীটী আবার বললে, সব ঘুরে দেখলাম সু! একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।

কি?

মিঃ সরকারের শয়ন ঘরের সংলগ্ন ঘোরান লোহার সিঁড়ির সামনের ঘরের মধ্যে যাতায়াত করবার দরজাটা বন্ধ কেন?

ওটা ত' শুনলাম সব সময়ই বন্ধ থাকে। মেথর ঐ ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের পিছনের বারান্দা দিয়ে বাথরুমে যাতায়াত করে।

সব সময় বন্ধ থাকলেও আজ ত' বন্ধ থাকার কথা নয়! বড্ড গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কেন বন্ধ আছে দরজাটা?

কি তুই বলতে চাস কিরীটী?

বলতে চাই দরজাটা বন্ধ কেন? কেন? কেন ওটা বন্ধ থাকবে? তাছাড়া আরও একটি ব্যাপার! মিঃ সরকারের হাত ঘড়িটা ভাঙল কি করে? ভাঙার ত' প্রয়োজন ছিল না? দুটোর সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ভাঙবে কেন?

সুব্রত কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, হয়ত পড়ে গিয়ে ভেঙেছে! কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কি? পড়েই বা যাবে কেন?

সুব্রত কিরীটীর ব্যবহারে এবার যেন একটু বিরক্তই হলো, বললে, কিরীটী! আরও একটা কথা আছে। বিনয়বাবুর সামনে আমি সেকথা বলিনি এই 5. C. C. সিরিঞ্জটা অশোকবাবুর ঘরে ল্যাবরেটারীর টেবিলের উপর পাওয়া গেছে।

কিরীটী সুব্রতর হাত থেকে সিরিঞ্জটা নিয়ে একবার ঘুরিয়ে দেখল, হ্যাঁ, Needleটা বড় সাইজের এবং মোটাও। অনায়াসেই এটা ফুটিয়ে হার্ট Puncture করা যায়। আর Puncture টাও fifth intercostal space-এ left mamary line এর laterally ও below—তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের enlarged heart ছিল। যদি অবিশ্যি heart-এ puncture করেই হত্যা করা হয়ে থাকে! সিরিঞ্জের মধ্যে জমাট বাঁধা রক্তটা analysis করলে কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—বলতে বলতে সিরিঞ্জটা আবার কিরীটী সুব্রতর হাতে ফিরিয়ে দিল!

কিছু বুঝতে পারলি? সুব্রত আবার প্রশ্ন করল কিরীটীকে।

মৃত ব্যক্তির চেয়ারে Positionটা দেখে। এমন ভাবে চেয়ারটা Place করা—যে কেউ ঐ ব্যালকনীর খোলা দরজা দিয়ে বা শয়ন ঘর থেকে এই লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করলে মিঃ সরকারের তা জানবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাত নয়, আমি ভাবছি অন্য কথা! মৃত ব্যক্তি চেয়ারে না বসে থেকে শোবার ঘরে খাটের পরেই

boiRboi.net

শুয়ে থাকলেই বা কি এমন ক্ষতি ছিল ?

কিরীটীর কথাগুলো আজ যেন কেমন কেমন মনে হয় সুব্রতর।

অদ্ভুত বুদ্ধি প্রাখর্যে যে চিরদিন সজাগ, তার মুখে আজ এসব কি আবোল তাবোল কথা? ঘড়িটা ভাঙ্গা কেন? দরজাটা বন্ধ কেন? মৃতব্যক্তি চেয়ারে বসে কেন? সুব্রত আর একবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হঠাৎ আবার কিরীটী বলে উঠলো, বুঝলি সু! ভাঙ্গা ঘড়ি আর চেয়ারে বসা এ:দুটো ব্যাপার যেন কিছুতেই মেলাতে পারছি না!

কিন্তু ঘড়িগুলো যে দুটোর সময় বন্ধ হয়ে গেল? সকলের ঘড়িই!

Quite Possible. সোজা! খুনীর ওটা একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু ভাবছি সিরিঞ্জটাও কি? ভাল কথা তুই অশোক বাবুকে সিরিঞ্জটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলি?

না!

ভালোই করেছিস। জিজ্ঞাসা করবার ওর মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই সে বলতো, সিরিঞ্জ সম্পর্কে কিছুই জানে না?

কিন্তু সিরিঞ্জের গায়ে আঙুলের ছাপ?

এক মাত্র খুনী ছাড়া তিনজন লোকের পাওয়া যেতে পারে।

মানে?

মানে আমার, তোমার ও অশোকের···

এমন সময় ঐ বাড়ীর ভৃত্য রামচরণ ঘরে এসে ঢুকল।

সকলেই রামচরণের মুখের দিকে তাকাল এক সঙ্গে।

কিরীটী একটিবার মাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রামচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুঁজে চেয়ারটায় নড়ে চড়ে আরাম করে বসল।

সুব্রতই প্রশ্ন শুরু করলে, তোমারই নাম রামচরণ?

আজ্ঞে হাঁ!

রামচরণের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বেই হবে। রোগা লম্বাটে ঢ্যাঙ্গা চেহারা। মাথার চুলগুলি সাদায় কালোয় মিশান। চক্ষু দুটি কোটর প্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সজাগ। চোয়ালের দুই পাশের হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে সজাগ হয়ে উঠেছে। লম্বা লম্বা হাড় বের করা আঙুল? হাতের শিরাগুলিও সজাগ।

পরিধানে পরিষ্কার একখানা ধুতি। গায়ে হাতকাটা একটা সাদা পিরান। কাঁধে একটি পরিষ্কার তোয়ালে। পায়ে একজোড়া চটি।

তোমার বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞে কর্তা, এই বাংলা দেশেই—বর্ধমান জিলার মেমারী গ্রামে!

boiRboi.net

সংসারে তোমার কে আছে ?

কেউ নেই। ছোট বয়সে-মা বাপকে খেয়েছি। এক দূরসম্পর্কীয় কাকার কাছে মানুষ !

কতদিন এ বাড়িতে আছো ?

তা আজ্ঞে আঠার বছর !

বাবু তোমাকে খুব ভালবাসতেন ! তাই না রামচরণ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রামচরণের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ এমন সময় কিরীটী একটি প্রশ্ন করলো, রামচরণ, তোমার কর্তার ঘুম খুব পাতলা ছিল, না গভীর ছিল ?

আজ্ঞে কর্তা খুব কম সময়েই ঘুমাতেন। তবে যতক্ষণ ঘুমাতেন, গভীর ঘুমই হতো।

ওঃ। আচ্ছা সুব্রত, তুই যা জিজ্ঞাসা করছিলি আবার কর !

সুব্রত আবার তার জবানবন্দী শুরু করলে।

কালকের সন্ধ্যার পর থেকে আজকের সকাল পর্যন্ত ঘটনা আমাকে এতটুকুও গোপন না করে খুলে বলতে পারো রামচরণ ?

রামচরণ তখন বলতে লাগল; কর্তাবাবু আমাদের দেবতার মত লোক ছিলেন বাবু ! চাকর হলেও আজ আঠার বছরের মধ্যে কখনো একটা উঁচু করে কথা বলেন নি। কাল বিকালে ছয়টার সময় যখন ব্যাংক থেকে বাড়ি ফিরে এলেন, আমি তাঁর ঘরে জামা কাপড় খুলে দিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বাবুর মুখটা যেন গম্ভীর আজ আঠার বছর বাবুকে দেখছি। বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে, যার জন্য কর্তা-বাবু গম্ভীর হয়ে আছেন। কেন না বরাবরই দেখেছি কোন কারণে কর্তাবাবু অসন্তুষ্ট হলে বা রাগ করলে গম্ভীর হয়েই দু'তিনদিন থাকতেন। কারও সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলতেন না। বাবু চিরকালই একটু গম্ভীর প্রকৃতির ও চাপা ছিলেন। চেঁচামেচি বড় একটা কোনদিনই করতে শুনিনি। বাবু আমাকে বললেন, রামচরণ, শরীরটা আজ আমার খারাপ, কেউ যেন বিরক্ত না করে। আজ আর কিছু খাবো না। রাত্রে শুধু এক গ্লাস গরম দুধ দিয়ে যাস। রাত্রি দশটার সময় !

তারপর ?

তারপর রাত্রি দশটার সময় যখন দুধ নিয়ে আমি···রামচরণ বলতে বলতে হঠাৎ যেন থেমে গেল।

হ্যাঁ বল। গরম দুধ নিয়ে যখন যাও, তারপর ?

ছোট দাদাবাবু, মানে কর্তার ছোট ছেলে তখন লাইব্রেরীতে কর্তার সঙ্গে কথা বলছিল।

pathagar.net

হঠাৎ এই সময় কিরীটী তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করলে, তাদের কথা তুমি চুপিসারে শুনতে চেষ্টা করেছিলে রামচরণ···বল, কি তুমি শুনেছো ?

বাবু, আমি গরীব চাকর বাকর মানুষ ! রামচরণ ভেঙ্গে পড়ল !

কিন্তু আড়ি পেতে শোনা তোমার অভ্যাস রামচরণ। কিরীটী বললে, কিন্তু কি শুনেছিলে ?

আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন বাবু ! আমার যেন মনে হলো, বাবু ছোট দাদাবাবুকে বেশ একটু জোর গলাতেই বলছেন, তুমি জাহান্নামে গেছ, একেবারে গোল্লায় গেছ হতভাগা ! আমি শীঘ্রই নতুন উইল করবো। একটি পয়সাও তোমাকে দেব না। অপদার্থ ! দুটো ছেলেই আমার অপদার্থ ! এক ঘর কুলাংগার নিয়ে আমি বাস করছি।

ছোটবাবু কি জবাব দিলেন তাতে ? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

মনে হলো, ছোটবাবুও যেন রেগে বললেন, বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতিতে ধরেছে। উইল যাতে তোমাকে আর না বদলাতে হয়, সে ব্যবস্থাও আমি করছি ! বলতে বলতে ছোটবাবু যেন একপ্রকার ঝড়ের মতোই হঠাৎ দরজা খুলে আমার পাশ কাটিয়ে এ ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

তারপর ?

তারপর আমি দুধ নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কর্তাবাবু আমাকে দুধের গ্লাসটা শোবার ঘরের টেবিলের পরে রেখে চলে যেতে বললেন।

হঠাৎ আবার কিরীটী প্রশ্ন করলে, রামচরণ তোমার বাবু কি সব সময়েই ঘড়ি হাতে দিয়ে থাকতেন ?

আজ্ঞে, বাবু অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন লাইব্রেরী ঘরে। যতক্ষণ না শুতে যেতেন ঘড়িটা হাতেই থাকত ! অনেক সময় ঘড়ি হাতেই বাঁধা থাকত, শুয়ে পড়তেন।

হুঁ ! তোমার বাবু কি রাত্রে কখনও তোমাকে ডাকতেন ?

আজ্ঞে না। তবু সর্বদাই আমি সজাগ থাকতাম। অন্ততঃ যতক্ষণ না তিনি শুতে যান। তবে কাল রাত্রি যখন দেড়টা হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ! ঘুম আমার চিরদিনই পাতলা। শব্দটা শুনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ঘুমের ভাব তখনও চোখে লেগে ছিল। ভাবছি কি করবো। তারপর সাত পাঁচ ভেবে উঠে এসে এই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দেখলাম বাবু এখনও ঘুমাতে যাননি ! উঁকি মেরে দেখলাম, তখনও বাবু চেয়ারের পরে পিছন ফিরে বসে আছেন। সামনে বই খোলা, ঘরে আলো জলছে। বুঝলাম বাবু

boiRboi.net

তখনও পড়ছেন। তাই আবার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করলে, তোমার বড়দাদাবাবু সব শেষ কবে এ বাড়িতে এসেছিলেন রামচরণ?

আজ্ঞে, কেন? কালই ত' রাত্রে এসেছিলেন।

সুব্রত যেন ভয়ংকর রকম চমকে উঠে বললে, কাল রাত্রে এসেছিলেন? কখন?

আজ্ঞে, রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা হবে। নীচের দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় বড় দাদাবাবু দরজায় ধাক্কা দিলেন।

তারপর?

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কর্তাবাবু জেগে আছেন কিনা? তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি বললাম, কর্তাবাবু জেগে আছেন বটে, তার তাঁর শরীর খারাপ। তখন তিনি বললেন, তবে থাক একটা জরুরী কাজে এসেছিলাম বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাঁর শরীর যখন খারাপ, থাক কাল সকালেই আসবো না হয়, বলে তিনি চলে গেলেন। আমিও দরজা বন্ধ করে উপরে চলে এলাম।

কিরীটী মৃদু গম্ভীরস্বরে বললে, হুঁ, টিকিটের কাউণ্টার পার্ট!

॥ আট ॥

তালুকদারের মুখের দিকে চেয়ে সুব্রত বললে, অশোকবাবুকে আর একবার ডাকা দরকার।

তালুকদার অশোকবাবুকে ডাকবার জন্য আর একজনকে পাঠিয়ে দিল।

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, আমি তাহলে চললাম সু। সন্ধ্যার দিকে একবার আসিস। যদি নতুন কোন কিছু এর মধ্যে জানতে পারিস। তাছাড়া তোর সঙ্গে এ কেসটা সম্পর্কে আলোচনাও করা যাবে।

বেশ যাবো'খন।

একজন পুলিশ এসে সংবাদ দিল, মর্গের গাড়ী এসেছে, মৃতদেহ নিয়ে যেতে।

সুব্রত বললে, তাদের বলো উপরে এসে মৃতদেহ নিয়ে যেতে।

অশোকবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, আমাকে ডেকেছেন সুব্রতবাবু?

boiRboi.net

হ্যাঁ, বসুন। আপনাকে আর কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

অশোকবাবু সুব্রতর নির্দেশমত চেয়ারের পরে উপবেশন করলেন।

কিরীটী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুব্রত অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে অশোকের ঘরে ল্যাবরেটারীর টেবিলে প্রাপ্ত সিরিঞ্জটা বের করে বললে, এই সিরিঞ্জটা চিনতে পারেন অশোকবাবু? এটা আপনার ঘরে ল্যাবরেটারীর টেবিলের উপরে আজ সকালে পাওয়া গেছে।

সুব্রতর প্রশ্নে ও সিরিঞ্জটার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অশোকের মুখখানা সহসা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখের তারায় একটা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি। সে ফ্যালফ্যাল করে সুব্রতর হস্তধৃত সিরিঞ্জটার প্রতি তাকিয়ে রইল শুধু। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হল না।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশোকবাবুর, মুখের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল, সিরিঞ্জটা আপনার?

হ্যাঁ। মানে···কো···কোথায় পেলেন ওটা?

বললাম ত আপনার ঘরে ল্যাবরেটারীর টেবিলে? সিরিঞ্জটা দেখলে মনে হয় কি না যে, আপনি recently কাউকে injection দিয়েছিলেন? কি, চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন?

সুব্রতবাবু। অশোকবাবুর কণ্ঠস্বর যেন সহসা কেঁপে উঠল। আমি গতকাল রাত্রি এগারটার সময় মামাবাবুকে একটা antititenus injection দিয়েছিলাম।

কিন্তু এ কথাটাত আপনার জবানবন্দীতে আপনি বলেন নি?

না। মানে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য। কিন্তু হঠাৎ antititenus injection বা দিতে গেলেন কেন?

কাল বিকেলে মামাবাবু গাড়ি থেকে নামবার সময় হঠাৎ ফুটবোর্ড থেকে পা Slip করে পড়ে গিয়ে হাঁটুটা ছড়ে যায়। রাস্তার ধুলো বালি লেগে ছিল। তাই মামাবাবু যখন বাড়ী ফিরে আসেন, আমাকে সেকথা বলেছিলেন। আমি তাঁকে একটা antititenus injection এর কথা বলি। তাতে তিনি রাজি হন এবং বলেন, আমার কাছে ঐ injection আছে কিনা? আমি বলি, নেই। তাতে তিনি বলেন, তাঁর শরীরটা খারাপ। রাত্রি এগারটায় শোবেন। বেশী রাত্রি জাগবেন না। আমি যেন তাঁকে তাঁর শোবার আগে রাত্রি এগারটায় গিয়ে injection দিয়ে আসি। আমি চাকর পাঠিয়ে রাস্তার ধারে ঘোষ ফার্মেসী থেকে ঐ injection কিনে নিয়ে আসি এবং রাত্রি এগারটায় গিয়ে তাঁকে injection দিয়ে আসি।

কিন্তু আমি সিরিঞ্জএ অতবড় Needle ব্যবহার করিনি। আর সিরিঞ্জএ রক্তও ছিল না!

সিরিঞ্জটা injection দেবার পর কোথায় রেখেছিলেন?

আমার ড্রয়ারে। তাও ভাল করে পরিস্কার করে ধুয়ে alcohal দিয়ে।

হুঁ। তাহলে রাত্রি এগারটার সময়ও আপনি আপনার মামাবাবুকে জীবিত দেখেছিলেন?

কিন্তু এ কথাগুলো কেন আপনি গোপন করেছিলেন? কেন আপনি বলেছিলেন যে, কাল রাত্রে মামাবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

সুব্রতর কঠিন প্রশ্নে অশোকবাবু যেন কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। অশ্রুভরা কণ্ঠে বললেন, কিন্তু সুব্রতবাবু, জানি না আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন কিনা! সত্যি আমি আমার মামার কোন অনিষ্টই করিনি! তাঁকে আমি হত্যা করিনি! হত্যা করিনি!··· দু'হাতে অশোকবাবু মুখ ঢাকলেন।

কিন্তু যতক্ষণ না বলছেন, কেন আপনি এ কথাগুলো গোপন করেছিলেন, ততক্ষণ আপনার উপরে সন্দেহ কিছুতেই যাবে না।

এ্যাঁ···আ···আপনি কি তবে বিশ্বাস করেন যে আমিই মামাবাবুকে খুন করেছি? বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু, যখন জানতে পারলাম যে, মামাবাবু খুন হয়েছেন, তখন কেমন একটা অজানিত আশংকায় ঘাবড়ে গিয়ে ঐ কথাটা গোপন করেছিলাম। অন্য কোন কারণ নেই। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি···

কে আপনার ইনজেকসান্‌টা এনে দিয়েছিল?

গোপাল!

আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন!

অশোকবাবু মুহ্যমানের মত মাথাটা নীচু করে টলতে টলতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

তারপর গোপালের ডাক পড়ল। গোপাল এসে ঘরে ঢুকল।

গোপালের বয়স ষোল থেকে সতেরর মধ্যে। নিকষ কালো গায়ের রং। রোগা, লম্বাটে চেহারা। মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই যেন মনে হয়, অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী গোছের মানুষ।

সুব্রত গোপালের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তোর নাম কি?

আজ্ঞে বাবু, আমি আমার পিসির গোপাল। হেই বাবু, আমি কিছু জানি না। আমি কিছু করিনি···আমায় ধরো না গো!···গোপাল কাঁদতে সুরু করলে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবু। আমি কিছু জানি না। কিছু দেখিনি···আমায় ছেড়ে দাও।

boiRboi.net

সুব্রত গোপালকে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলো, থাম ছোঁড়া। কাঁদবিতো এখুনি থানায় পাঠিয়ে দেবো···যা জিজ্ঞাসা করি, তার জবাব দে।

গোপাল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

কাল রাত্রে তুই ডাক্তারখানা থেকে অশোকবাবুকে ঔষধ এনে দিয়েছিলি?

হ্যাঁ। বাবু বললে···

তুই কোন্ ঘরে শুস্?

আজ্ঞে নীচে চাকরদের ঘরে।

কটার সময় কাল রাত্রে শুয়েছিলি?

আজ্ঞে ঔষধটা এনে দিয়েই শুতে চলে গিয়েছিলাম। তারপর অনেক রাত্রে অশোকবাবু আবার ডাকলে, তার এঁটো থালাবাসন নিয়ে আসি।

তারপর আর ঘর থেকে বের হসনি?

হ্যাঁ···না···

সত্যি কথা বল বেটা। সুব্রত আবার ধমক দিলে।

হ্যাঁ। রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন একবার বাইরে গিয়েছিলাম।

তারপর—

তখন মিথ্যে বলব না—মনে হলো, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে! লোকটাকে চিনতে পারিনি! আমাকে নীচের উঠানে দেখেই লোকটা আবার হঠ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল। আমিও লোকটার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। কিন্তু উপরে উঠে আর কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমার বড় ভয় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

লোকটাকে তুই চিনতে পারিসনি, সত্যি বলছিস্?

সত্যি।

লোকটা লম্বা না বেঁটে?

আজ্ঞে লম্বা!

আচ্ছা তুই যা!

গোপাল কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত তখন অন্য চাকরদের ও দারোয়ান, ড্রাইভার সকলকে একে একে ডেকে প্রশ্ন করতে লাগল।

কিন্তু কারও কাছে আর তেমন বিশেষ কোন সন্ধান বা সূত্র পাওয়া গেল না।

কিরীটী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের বাইরের ঘরে এল, দেখলে, বাইরের ঘরে একটা সোফায় মাথায় হাত দিয়ে নিঝুম ভাবে বসে আছেন বিনয়েন্দ্র।

boiRboi.net

কিরীটী নিঃশব্দে বিনয়েন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল, বিনয়।

বিনয়েন্দ্র চমকে মুখ তুললেন।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার বিনয়। এ রহস্যের কিনারা আমি করবোই!

বিনয়েন্দ্র অশ্রুভরা কণ্ঠে বললেন, আমার দাদা দেবতার মত, ঋষির মত দাদা। আমিত ভাবতেই পারছি না কিরীটী, কে এ সর্বনাশ আমাদের করতে পারে?

কাউকেই তোমার সন্দেহ হয় না, বিনয়?

না!

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মৃদু চাপা স্বরে বললে, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব জটিল নয়।

কিছু বুঝতে পারলে ভাই?

পেরেছি বই কি। খুনীকে মনে হচ্ছে হয়ত বুঝতে পেরেছি। তবে motive যেন এখনো তেমন strong বলে মনে হচ্ছে না।

তুমি জান? জান কে খুনী? উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বিনয়েন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

কিরীটি অদ্ভুত একপ্রকার হাসি হাসতে হাসতে বললে, জানি বৈকি!

॥ নয় ॥

নিজের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় ও লালবাজারের অফিসে অনেক সময় নানা অসুবিধা হয় বলে সুব্রত মাস দু'তিন হল চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনুতে 'মমতাজ' হোটেলের দোতলায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে।

হোটেলের ফ্ল্যাটটি সুব্রত নিজের নামে ভাড়া নেয়নি। ওখানে তার নাম অমিতাভ রায়। শেয়ার মার্কেটের দালাল বলে পরিচিত সেখানে সে।

মিঃ সরকারের সারকুলার রোডস্থিত 'মর্মরাবাস' থেকে বের হয়ে সুব্রত গাড়ি চালিয়ে বরাবর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় ফিরে এল।

ঘণ্টাখানেক বাদে কিছু খেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে হ্যারিসন রোড অভিমুখে একটা ট্রামে চেপে বসল।

* * *

সুব্রত যখন 'মমতাজ' হোটেলে তার ফ্ল্যাটে এসে প্রবেশ করল, বেলা তখন প্রায় দেড়টা হবে। শীতের রৌদ্রে নীলাকাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে।

হোটেলটা একেবারে বড় রাস্তার উপরে।

সুব্রত পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

boiRboi.net

ছোট ছোট তিনখানি ঘর পাশাপাশি। একখানা ঘর শয়নকক্ষ। সেই ঘরে একটা ক্যাম্প খাটে ধোপ-দুরস্ত নিভাঁজ শয্যা বিছানো। দু'খানা সোফা।

আর আছে একটি বুক-সেল্‌ফ! বুক-সেল্‌ফের পাশেই একটি উঁচু টেবিল স্ট্যাণ্ডের 'পরে ছোট একটি দামী রেডিও সেট। এবং একটি আলমারীতে কিছু কাপড় জামা।

পাশের ঘরটি একটু বিচিত্র।

দু' পাশের দেয়ালে দুটি দামী প্রমাণ সাইজের আয়না টাংগানো। পাশেই একটি র‍্যাক্। তাতে নানা প্রকারের সব বেশ-ভূষা ঝুলছে। পাশেই একটি টেবিলে নানা ধরণের ছোটবড় শিশি। নানা প্রকার ক্রিম, পাউডার। তাছাড়া নানা ধরণের পরচুলা, স্পিরিটগাম, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতিও টেবিলের 'পরে সাজান।

অবশ্য সুব্রতর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতেও ঐ ধরণের আর একপ্রস্থ সাজ-সরঞ্জাম মজুত আছে।

এই ঘর থেকে সে মাঝে মাঝে গভীর রাতে কখনো ভিখারীর বেশে, কখনো গাড়োয়ান, কখনো ঝাঁকামুটে, কখনো ট্যাস্ ফিরিংগি, কখনো অন্ধ, কখনো বা খঞ্জ, প্রভৃতি নানা প্রকারের ছদ্মবেশে অভিযানে বের হয়।

'মমতাজ' হোটেলের ম্যানেজার একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। তিনি সুব্রতর আসল পরিচয়টা জানেন।

দালালবেশী সুব্রত বেশ অন্য ধরণের। মাথার সামনের দিকে একটুখানি টাক! ক্রেঞ্চকাট দাড়ি, ছুঁচালো পাকানো গোঁফ! চোখে কালো কাচের গগলস্।

এই বেশে সুব্রতকে চেনারও উপায় নেই।

সুব্রত কলিং বেলটা টিপে চেয়ারের 'পরে বসল একটা কাগজ পেনসিল নিয়ে। আজকের সকালের সমস্ত ঘটনাগুলি পুংখানুপুংখরূপে বিবেচনা করলে দুটো জিনিস সহজেই চোখে পড়ে!

এক নং, মিঃ সরকারকে এমন কোন ব্যক্তি খুন করেছে যে ও বাড়িতে বিশেষ পরিচিত। ও বাড়ির খুঁটিনাটি সব কিছুই তার নখদর্পণে। বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তি নয়। দু'নং, ও বাড়ির প্রত্যেকেরই সমান মোটিভ বর্তমান।

দরজায় এসে ভৃত্য নক্ করলে।

ভিতরে এসো, সুব্রত বললে!

হোটেলের একজন ভৃত্য ঘরে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্য চলে গেল।

সুব্রত কাগজটার উপরে আবার পেনসিল দিয়ে লিখতে সুরু করলে:

boiRboi.net

প্রত্যেকের নাম	সন্দেহ কোন কোন ব্যক্তিকে করা যায় ১০ নম্বর	খুনকরা কার কার পক্ষে সম্ভব ছিল ? ১০ নম্বর	উদ্দেশ্য বা Motive ১০ নম্বর	Alibi ১০ নম্বর	খুন করা সম্ভব এমন দেখতে কে ?	সবসমেত নম্বর
১। মিঃ সরকারের ছোট ছেলে সৌরীন্দ্র	মৃত ব্যক্তির ঠিক পাশের ঘরেই ছিল। অনায়াসে সে খুন করার সুযোগ পেতে পারে, তাছাড়া তার বাপের সঙ্গে টাকার ও উইলের ব্যাপার নিয়ে সেদিন রাত্রে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। ৮	রাগের মাথায় খুন করা খুবই সম্ভব ছিল ! এবং সে তার বাপকে শাসিয়েও ছিল। ৮	টাকা বাপ মারা গেলে সে উইলের টাকা পেত। ৮	কোন কিছুই ছিল না, সারারাত্রি সে পাশের ঘরে ছিল। ৯	তেমন কিছু দেখতে নয়। ৬	৩১
২। ভায়ে অশোক	স্বীকার করেছে সে সে রাত্রে মৃত ব্যক্তিকে একটা antitetanus injection দিয়েছিল : কিন্তু প্রথমে সেকথা স্বীকার করেনি কেন ? সন্দেহজনক। ১০	খুবই সম্ভব ছিল, কেননা সেই সর্বশেষ মিঃ সরকারকে জীবিত দেখে। তাছাড়া যদি ধরে নেওয়া যায় যে Poison করে মিঃ সরকারকে খুন করা হয়েছে, তাহলে অশোক ডাক্তারী পড়ে, তার পক্ষেই বেশী সম্ভব খুন করা। ১০	তেমন বিশেষ কিছু নয় কেননা সে জানত টাকা সে পাবেই। তাছাড়া মিঃ সরকার তাকে ভালও বাসতেন খুব। ৫	কোন কিছুই ছিল না তাছাড়া অনেক রাত্রি জেগে সে পড়াশুনা করত। ৯	দেখতে সেরকম কিছুই নয়। ০	২৯

boiRboi.net

প্রত্যেকের নাম	সন্দেহ কোন কোন ব্যক্তিকে করা যায় ? ১০ নম্বর	খুন করা কার পক্ষে সম্ভব ছিল ? ১০ নম্বর	উদ্দেশ্য বা Motive ১০ নম্বর	Alibi ১০ নম্বর	খুন করা সম্ভব এমন দেখতে কে ?	সবসমেত নম্বর
৩। গণেন্দ্র সরকার	পিতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে তিন বছর আগে পৃথক হয়ে যায়। দুর্ঘটনার দিন রাত্রে এগারটার সময়ে ঐ বাড়িতে ও এসেছিল। কিন্তু সিনেমা গিয়েছিল বলে মিথ্যা কথা বললে কেন ? এবং কেনই বা সে অত রাত্রে বাপের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সন্দেহজনক খুবই। ৯	সম্ভব ছিল। কেননা রাত্রি দেড়টায় ও বাড়ি ফেরে। অথচ সিনেমাতেও যায়নি, কোথায় ছিল রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত ? ১০	কিছু নেই। ১০	কোন কিছুই নেই। ৯	না না	৩৮
৪। ছোট ভাই বিনয়েন্দ্র	ভাই তাকে যথেষ্টই ভালবাসত। নির্বিরোধী মানুষ তাছাড়া রাত্রে সে বাড়িই ছিল না। •	সম্ভব ছিল না কেননা রাত্রে সে বাড়ি ছিল না। •	টাকা ১০	পুরোপুরি ছিল। ১০	না •	২০

boiRboi.net

৫। মিঃ সরকারের দূর সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই সুবিমল চৌধুরী	অনায়াসেই সন্দেহ করা যেতে পারে। তাছাড়া সেই প্রথমে মৃত দেহ আবিষ্কার করে। সুব্রত যে চিঠিখানা পেয়েছিল তার হাতের লেখা অবিকল সুবিমলের হাতের লেখার মতই। তাছাড়া লেখার কালি? সে অস্বীকার করলে কেন যে লেখা তার নয়। ৯	Rainbow club থেকে সে অনায়াসেই ফিরে এসে খুন করতে পারত। তাছাড়া এ বাড়ির সব তার কাছে খুবই পরিচিত ছিল। হঠাৎ কেউ দেখলেও তাকে সন্দেহ করতে পারত না। ৯	তার অর্থের অভাব খুবই ছিল, কেননা সে ছিল অসংযমী, বেহিসাবী। মাঝে মাঝে মিঃ সরকারের কাছে টাকাও চাইত, জুয়া খেলত। ৯	কিছুই বলতে গেলে নেই। ৯	তার দেহের আকৃতি দেখে মনে হয় তার পক্ষে খুন করা এতটুকুও অসম্ভব নয়। ৬ ৯	
৬। ভৃত্য রামচরণ	না ০	সম্ভব ছিল ৯	টাকা ৫	কিছুই নেই ০	না ১০	৪৫ ১৪

boikboi.net

ইতিমধ্যে এক সময় ভৃত্য এসে চা দিয়ে গিয়েছিল।

চা পান করতে করতে সুব্রত মোটামুটি একটা খসড়া বানিয়ে ফেললে। এবং পরে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল এখন তার প্রধান কর্তব্য কী?

সর্বপ্রথম : মিঃ সরকারের এটর্নী রামলাল মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে উইল সম্পর্কে সমস্ত অবগত হওয়া।

দ্বিতীয় : গণেন্দ্র সরকারের সেই রাত্রের মুভমেণ্টস ভাল করে পর্যালোচনা করা। কেন তিনি সব কথা গোপন করলেন?

তৃতীয় : চিঠিটা ও কালিটা সম্পর্কে আর একটু বেশীরকম বিবেচনা করা।

চতুর্থ : কিরীটীর সঙ্গে দেখা করে আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটার একটা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

পঞ্চম : ময়না তদন্তের রিপোর্টটা জানা।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ঘটে আর এক।

সেই রাত্রেই ঘটনার স্রোত সুব্রতকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেল।

হঠাৎ বিকেলের দিকে লালবাজার থেকে এক ফোন পেয়ে সুব্রতকে অফিসে যেতে হলো। সেখানে অফিসের কাজ শেষ হতে হতে রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

রাস্তায় বের হয়ে সুব্রত আমহার্স্ট স্ট্রীটে আর্টিস্ট সুবোধ দত্তর ওখানে গেল।

আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে একটা সরু গলিপথ বের হয়ে গেছে। সেই গলির মধ্যেই ৭ নং বাড়ি আর্টিস্ট সুবোধ দত্তের।

দরজার গায়ে পিতলের প্লেটে লেখা শিল্পী সুবোধ দত্ত।

দরজাটা খোলাই ছিল। সামনেই একটি আলোকিত গলিপথ থেকে ঘরখানা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

উজ্জ্বল পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য ছবি ঝুলছে। কোনটা পেন্‌সিল, স্কেচ, কোনটা ওয়াটার কলার, কোনটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট, কোনটা অয়েল পেনটিং।

ঘরের মধ্যে একজন আধাবয়সী সুশ্রী যুবক পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও ঢোলহাতা পাঞ্জাবী। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ইজেলের পরে রক্ষিত অর্ধসমাপ্ত একটা ছবিতে পেন্‌সিল দিয়ে টাচ দিচ্ছে।

সুব্রত কড়াটা নাড়লে।

কে? ভিতর হতে প্রশ্ন এলো।

boiRboi.net

এটা কি মিঃ সুবোধ বাবুর বাড়ি ?

হ্যাঁ আপনি ?

সুব্রত চমকে পিছনের দিকে তাকাল। একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের স্ত্রীলোক সুব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করছেন। অদূরে গলির মধ্যেকার গ্যাস পোস্টের খানিকটা আলো ভদ্রমহিলার মুখের' পরে এসে পড়ছে। কি সুন্দর মুখখানি ?

টানা-টানা দুটি চোখ। উন্নত নাসা। কয়েকগাছি চূর্ণ কুন্তল কপোল ও কপালে এসে পড়ছে।

মাথার 'পরে আধ-ঘোমটা টানা, নিরাভরণা হাত দুটি। ' কিন্তু সিঁথিতে সিঁন্দুর রেখা, কপালে গোল একটি সিঁন্দুরের টিপ।

পরিধানে কালো পাড়ের শাড়ি। নিরাভরণা সামান্য এই বেশভূষাতেও যেন ভদ্রমহিলাকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে একটু আগে ঘরের মধ্যে দেখা যুবকটিও দরজার'পরে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি রাণী ? কখন এলি ?

এই আসছি দাদা। এই ভদ্রলোক বোধহয় তোমাকে খুঁজছেন···বলতে বলতে ভদ্রমহিলা ওদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

কাকে চান আপনি ?

মিঃ সুবোধ বাবু আছেন ?

হ্যাঁ, আমারই নাম সুবোধ দত্ত। আপনি ?

আমার নাম সুব্রত রায়। আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা ছিল। ভিতরে আসতে পারি কী ?

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করে কী যেন মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, আসুন।

সুব্রত ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে গিয়ে পাশের একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করল।

ছোট্ট ঘরটি। খান কতক চেয়ার পাতা, ছোট্ট একটি টি'পয়। সুবোধবাবু নিজে একখানি চেয়ারে বসে অন্য একটি চেয়ারে সুব্রতকে নির্দেশ করে বললে, বসুন।

সুব্রত নির্দেশমত চেয়ারে উপবেশন করল।

সুব্রতই প্রথমে কথা সুরু করলে, আমার পরিচয়টা আগেই দেওয়া ভাল মিঃ দত্ত। আমি সি, আই, ডি'র লোক। ব্যাঙ্কার ও জুয়েলার মিঃ সরকারের খুনের তদন্ত আমি করছি।

সুবোধবাবু নির্বিকার ভাবে প্রশ্ন করলেন, কি চাই আপনার আমার কাছে ?

কয়েকটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আশা করি, যথাযথ উত্তর পাবো। সুবিমল চৌধুরী নামে কোন ভদ্রলোককে আপনি চেনেন ? মহালক্ষ্মী

boiRboi.net

ব্যাংকে চাকরী করেন। শুনলাম, তিনি আপনার বিশেষ বন্ধু। বহুকালের জানা শোনা আপনাদের।

সুব্রত স্পষ্ট লক্ষ্য করলে, সুবোধবাবুর মুখখানা যেন সহসা একটু গম্ভীর হয়েই তখুনি আবার প্রশান্ত ও নির্লিপ্তভাব ধারণ করল। সামান্যই তার সঙ্গে জানা শোনা। তাও কিছুদিন আগে ছিল, এখন আর নেই।

ওঃ! আচ্ছা, আপনি তাকে কখনও চায়না থেকে আনা চায়নীজ ভায়োলেট রংয়ের একটি কালির শিশি উপহার দিয়েছিলেন কি?

প্রথম কথা, জীবনে আমি চীনে কোনদিনই যাইনি। দ্বিতীয়, আপনার বর্ণনামত কোন কালির শিশিই তাকে আমি উপহার দিইনি।

দেননি!

না।

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন।

কিন্তু তিনি যে সেই রকম কথাই আজ সকালে আমায় বললেন।

তিনি যদি বলেই থাকেন যে আমি তাকে কালিটা দিয়েছি, সেটাই সত্য হবে, আর আমার কথাটা মিথ্যে হয়ে যাবে।

না, না, তা নয়। তবে—

আচ্ছা তিনি, বলছিলেন, আপনারা দু'জনে ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন?

না। কস্মিন কালেও নয়।...ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব।

এরপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই সুব্রতকে উঠতে হলো।

আশ্চর্য! এভাবে সুবিমলবাবুর মিথ্যা কথা বলবার কি প্রয়োজন ছিল?

সে রাত্রে সুব্রত আর বাড়িতে ফিরল না। সোজা মমতাজ হোটেলের দিকেই চলল। সমগ্র ব্যাপারটা যেন আগাগোড়া কেমন জটিল হয়ে উঠছে।

চিঠিটা সত্যি তবে তাকে কে লিখল? সুবিমলবাবুর হাতের লেখার মতই অবিকল হাতের লেখা। অথচ সে কথাটা স্বীকার করল না কেন?

ঠিক ঐ রংয়ের কালিও তার কাছে আছে। অথচ যে জায়গা থেকে সে কালিটা পেয়েছে বললে, সেটা দেখা যাচ্ছে মিথ্যা!

কাকে সে বিশ্বাস করবে? কোন্ সূত্র ধরে কোন্ পথে ও এখন চলবে?

সুব্রত হোটেলে যখন ফিরে এলো রাত্রি তখন প্রায় নয়টা।

অসহ্য ক্লান্তিতে সর্বশরীর অবসন্ন।

বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

ফ্ল্যাটে ফিরে প্রথমেই সে বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে।

boiRboi.net

শরীর যেন অনেকটা ঠাণ্ডা করলে।

হোটেল থেকে ও ডিনার খেল।

*　　*　　*

রাত্রি তখন বোধ করি একটা বেজে গেছে।

সুব্রত ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু ঠিক কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিল, তা ও বলতে পারে না।

হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

অন্ধকার ঘর।

ঘরের নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট শব্দ। যেন কে বা কারা ঠিক পাশের ঘরেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

নাকের পরে একটা যেন নরম তুলোর মত স্পর্শ। অথচ কী ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ! যেন শ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে!

হঠাৎ সে হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে টান মেরে কি একটা মেঝেতে ফেলে দিল।

বুঝতে পারলে কেউ তার মুখের পরে একটা ক্লোরোফরম স্পঞ্জ দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি ও উঠে বসল।

নিকষ কালো অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন জমাট বেঁধে উঠল।

প্রথমটায় ও কিছুই দেখতে পেল না।

তারপর একটু একটু করে অন্ধকারটা চোখ থেকে সরে গেল। দু'ঘরের ভাঙ্গা করা দরজার ঈষৎ ফাঁকে একটা অস্পষ্ট মৃদু আলোর আভাস। বুঝলে, কেউ ওর ফ্ল্যাটে এসেছে।

সুব্রত বিছানা থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়ল।

মাথাটার মধ্যে তখনও কিন্তু ঝিম্‌ঝিম্ করছে। বালিশের তলা থেকে সাইলেন্সার দেওয়া রিভলভারটা নিয়ে ও পায়ে পায়ে নিঃশব্দে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ফাঁকে চোখ রাখতেই ও ভয়ংকর রকম চম্‌কে উঠল। দেখলে, সবুজ ঘেরা টোপ ঢাকা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে দু'জন মুখোসধারী লোক। তারা সুব্রতর সিক্রেট ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। কিন্তু সুব্রতর মাথা থেকে ক্লোরোফরমের আমেজটা তখনও যায়নি। হঠাৎ মাথাটা কেমন একটু ঘুরে উঠতেই ও সামলে নিতে গিয়ে ওর হাতের ধাক্কায় সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'টো খোলা জানালা পথে পালাবার চেষ্টা করলে। এবং চকিত ওদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা

boiRboi.net

নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার! নিশ্ছিদ্র আঁধার!

সুব্রত তবু শব্দ ও দিক লক্ষ্য করে রিভলভারের ট্রিগার টিপল। নিঃশব্দে একটা আগুনের ঝিলিক সাঁ করে অন্ধকারের বুকে ছুটে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ!

সুব্রত ততক্ষণে আবার সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুব্রত তড়িৎ পদে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শব্দ ও আর্তনাদ লক্ষ্য করে ঢুকে পড়ল।

যে লোকটা আহত হয়েছিল, তারই ঘাড়ের উপরে সুব্রত অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

হুমড়ি খেয়ে পড়তেই লোকটা অন্ধকারে সুব্রতকে জাপটে ধরে।

তখন সুরু হল দু'জনে ঝটাপটি।

লোকটার গায়ে বেশ শক্তি আছে। তথাপি সুব্রত যখন তাকে প্রায় ঘায়েল করে এনেছে, তখন মাথার 'পরে কে একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল সুব্রতর সুব্রতর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে এলো, হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল।

চোখের পলকে লোকটা সুব্রতর কবল হতে নিজেকে মুক্ত করে নিল এবং দ্রুতপদে সুব্রতর শয়ন ঘরের দিকে পালিয়ে গেল।

সুব্রত আবার নিজেকে ভালো করে সামলাবার আগেই লোক দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথমে সুব্রত ঘরের আলোটা জ্বালালো।

কিন্তু ঘর তখন খালি।

অতঃপর সুব্রত শয়ন ঘরে এসে ঢুকল। শয়ন ঘরটাও খালি।

দরজাটা হা হা করছে খোলা। ও বুঝলে সে যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন এই দরজা খুলেই সুব্রতর ঘরে আততায়ীরা প্রবেশ করেছিল। সুব্রত দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আশ্চর্য। কী নিতে ওরা তার ঘরে প্রবেশ করেছিল?

সুব্রত আবার পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল?

ড্রয়ার দু'টো তখনও খোলা!

ড্রয়ারের কাছে ও এগিয়ে গেল। অনেক আবশ্যকীয় গোপনীয় কাগজপত্র ওর ড্রয়ারে থাকে।

হঠাৎ আবার ওর নজর পড়ল একটা ভাঁজ করা কাগজ মেঝেতে পড়ে। একান্ত

boiRboi.net

কৌতূহলবশেই ও সেটা তুলে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরতেই চমকে ওঠে। একটা চিঠি সেই ডিপ্ ভায়োলেট কালিতে সেই হাতে লেখা!

চিঠিটায় লেখা আছে :

মানকে, গোবরা,

আজ রাত্রেই যেমন করে হোক কাজটা শেষ করা চাই। খবর পেয়েছি, সুব্রত হোটেলেই আজ আছে এবং সেটা ওই ঘরেই অথবা ওর জামার পকেটে নিশ্চয়ই আছে। রক্ত ক্ষয় বা প্রাণহানির কোন প্রয়োজন নেই। ক্লোরোফর্ম দিয়েই কাজ সারবে, এবং কোন সূত্র রেখে এসো না। ঘরে অনায়সেই ঢুকে পারবে। ন— তোমাদের সাহায্য করবেন।

চাবির ডুপলিকেটটা তার কাছে চাইলেই পাবে। আমার নাম করলেই এবং পাস ওয়ার্ডটা বললেই ···না নিয়ে কোন মতেই ফিরবে না। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে রাত্রি দুটো থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে চিৎপুরের 'খালসা' কেবিনে আমার সঙ্গে দেখা কর। অপেক্ষায় থাকবো।

ইতি—

॥ দশ ॥

সুব্রত তার হাত ঘড়িটা বালিশের তলা থেকে নিয়ে দেখলে তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। কী এখন করে সে? কী তার করা উচিত?

ও দেখলে, মেঝেতে তখনও খানিকটা রক্ত জমে আছে। ও বুঝতে পারল, লোক দু'টোর মধ্যে একজন নিশ্চয়ই তার পিস্তলের গুলিতে আহত হয়েছে।

হয়ত গুরুতরভাবে আহত হয়নি। পালিয়ে যেতে পেরেছে যখন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

কিন্তু চিঠির মধ্যে ঐ 'ডট্' গুলোর অর্থ কী? চকিতে ওর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তবে কী···হাঁ, তিনটে 'ডট' মানে চিঠিটা। চিঠিটা ও ড্রয়ারেই রেখেছিল দুপুরের দিকে!

তাড়াতাড়ি ও ড্রয়ারের কাগজপত্রগুলো ঘাটতে শুরু করলো। না, চিঠিটা নেই, চিঠিটা খুনী চুরি করলে কেন?

প্রমাণ! তার বিরুদ্ধে এটা একটা প্রমাণ। তাই চিঠিটা সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল?

কিন্তু কেন সে তখন সাবধান হল না?

boiRboi.net

কেন সে এই ড্রয়ারের মধ্যে চিঠিটা রেখেছিল ?

কিন্তু চিঠির মধ্যে ঐ 'ছঁয়টি' ডটের মানে কী ? নিশ্চয়ই কোন লোকের নাম হবে—যার নিকট হতে পত্রবাহক মানকে ও গোবরাকে তার ফ্ল্যাটে ঢুকতে না পারলে সাহায্য নিতে বলেছে ? চাবির ডুপলিকেটও তার কাছেই পাওয়া যাবে। কিন্তু কার কাছ হতে তার এই ফ্ল্যাটের চাবির ডুপলিকেট পাওয়া সম্ভব ?

একমাত্র হোঁটেলের ম্যানেজারের। কী তার নাম ? ঠিক। তার নাম কামতা-প্রসাদ। হাঁ, ছয়টি ডট্। তাহলে মিলে যাচ্ছে। হু! কামতাপ্রসাদই তাহলে তার শত্রুদলকে সাহায্য করেছে।

একটা ব্যাপার কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র আছে মিঃ সরকারের এই খুনের ব্যাপারে। কোন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি টাকার সাহায্যে অন্য লোকের দ্বারা এইসব কাজ চালাচ্ছে। একটা দল সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করছে। তাছাড়া চিঠির প্রথম তিনটি 'ডট' যদি 'চিঠিটা' বলে ধরা যায়, চিঠির শেষ তিনটি 'ডট'য়েরও একই বিশ্লেষণ দাঁড় করান যেতে পারে। কিন্তু আর এখানে বসে থাকলে ত' হবে না। এখুনি একবার 'খালসা' হোটেলে চিৎপুরে যেতে হবে। দেখা যাক, সেখানে যদি কিছুর সন্ধান মেলে !

সুব্রত চটপট জামা বদলে সাধারণ লোকের মত সাজসজ্জা করে নিল।

মুখে খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে কালি। মাথার চুল রুক্ষ, গায়ে সাধারণ একটা ছেঁড়া ডোরাকাটা টুইলের সার্ট।

পরিধানে মলিন একখানা ধুতি। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো।

সুব্রত তার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে হোটেল থেকে বের হয়ে নীচের রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

মাথার উপরে রাত্রির কালো আকাশ। অসংখ্য তারার মিটিমিটি চাউনি যেন। সমগ্র বিশ্বচরাচর নিদ্রার কোলে ঢুলে পড়েছে।

কেউ কোথাও নেই।

ধর্মতলার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভার নির্জন রাস্তা পেয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটালে।

সুব্রত চলমান গাড়ির মধ্যে ব্যাকসিটে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুঁঝল !

চিৎপুরের রাস্তাটা বিডন স্ট্রীটের সঙ্গে যেখানে এসে মিশেছে, তারই সামনে 'খালসা' কেবিন।

খালসা কেবিনের সামনে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সুব্রত ভাড়া মিটিয়ে দিল,

boiRboi.net

এবং তাকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বললে।

কেবিনের মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে।

মস্তবড় উনুনটা গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে। উনুনের পরে 'শিক কাবাব' তৈরী হচ্ছে। পাশেই একটা মস্তবড় লোহার কেৎলিতে বোধ করি চায়ের জল ফুটছে।

ভেতরে কতকগুলো টেবিল ও টিনের চেয়ার পাতা।

দশ বারজন নিম্ন শ্রেণীর কুলী, মজুর ও গাড়োয়ান ব'সে চা পান করছে।

ঘরের দেওয়ালে কতকগুলি কুৎসিত ছবি টাঙ্গানো।

কাউণ্টারের একপাশে দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন মোটা মত লুংগীপরা মুসলমান বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে।

একটা গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে।

"তুম্‌কো মোবারক হো
উঁচে মাহলিয়া—
হামকো হায় পিয়াসী
হামারি গলিঁয়া!"

পাশেই একটা কাচের আলমারীতে ডিসে সাজানো ডিমসিদ্ধ, ডিমের কারী, মাংসের কারী আর পরোটা।

সুব্রত এসে হোটেলে প্রবেশ করে এক কাপ চা দিতে বলে। তারপর একটা লোহার চেয়ারে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

একটা ছোকরা এসে ময়লা কাপে এক কাপ চা দিয়ে গেল।

সুব্রত চা খেতে খেতে ঘনঘন রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই ও দেখলে, দু'জন লোক এসে কেবিনে প্রবেশ করল। একজন একটু লম্বা। অন্যজন একটু বেঁটে। দু'জনের দেহই বেশ গাট্টা-গোট্টা। বেঁটে লোকটার হাতে একটা পট্টি বাঁধা। পট্টিটার খানিকটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

দু'জনেরই পরিধানে ময়লা পাত্‌লুন ও হাত কাটা হাফসার্ট। দু'জনকেই দেখলেই মনে হয়, নিম্ন শ্রেণীর লোক ওরা।

লোক দু'টো কেবিনে প্রবেশ করে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এবং সুব্রতই পাশের একটা টেবিল অধিকার করে বসল।

সুব্রত কান খাড়া করে সজাগ হয়ে রইল।

দু'কাপ গরম চা দোকানের ছোকরাটা এসে ওদের সামনে রাখলে।

লোক দু'টো চা খেতে খেতে ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

সুব্রতর চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে আর এক কাপ চায়ের

boiRboi.net

অর্ডার দিল, ইধার আউর এককাপ চা।

এমন সময় ওদের মধ্যে একজন দেওয়ালে টাঙ্গান বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, রাত্রি প্রায় পৌনে তিনটে যে।

অন্যজন বলে, এখনও আসবার নামটি নেই। বেটাদের আককেল দেখলে প্রাণ জ্বল হয়ে যায়। বেটাদের টাকা আছে। তাই ভাবে, যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের বসিয়ে রাখতে পারে।

ব্যস্ত হোস নে মানকে, বেশত বসে আছি এখানে। দোকান ত আর বন্ধ হচ্ছে না। কালু মিঞার 'খালসা কেবিন'! আহা বেঁচে থাক। কিন্তু তুই ভাল করে ক্লোরোফরম্ দিস্‌নি মানকে, নইলে বেটা জেগে ওঠে!

আমার বাবা কোন দিন ক্লোরোফরম্ দিয়েছে? তুলোটা নাকের পরে রেখে চলে এসেছিলাম। বেটা যে ক্লোরোফরম্ পেয়েও চাংগা হয়ে উঠবে অমন করে, কে জানত বল? হাতটা এখনও টনটন করছে।

ভাগ্যে প্রাণে বেঁচে গেছিস! গোবরা বললে।

ঠিক এমন সময় একজন এসে হোটেলে প্রবেশ করল।

লোকটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফিট হবে। বলিষ্ঠ পেশল গঠন।

পরিধানে স্যুট। গ্রে কালারের চোখে গগলস্।

লোকটাকে কেবিনে ঢুকতে দেখেই গোবরা ও মানকে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

দু'জনারই মুখে অদ্ভুত একপ্রকার হাসি জেগে উঠে। স্যুটপরা লোকটা গিয়ে কোণের একটা টেবিল অধিকার করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গোবরা ও মানকে লোকটার পাশে গিয়ে দু'খানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

লোকটার দাড়ি নিখুঁতভাবে কামান। কিন্তু বেশ পাকানো গোঁফ আছে। কপালের দু'পাশে একটু করে কাটা।

সুব্রত অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না লোকটাকে কোথাও দেখেছে কিনা।

সেই লম্বা লোকটি এবং গোবরা ও মানকে কী সব ফিসফিস করে কথাবার্তা সুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে।

সুব্রত তাদের কথাগুলো ঠিক বুঝতে না পারলেও, গোবরা ও মানকের মুখ ও হাত নাড়া দেখে বুঝতে পারলে কোন বিষয় নিয়ে তাদের দু'জনের সঙ্গে লোকটার মতের গোলমাল হচ্ছে।

হঠাৎ মানকে বেশ চড়া গলাতেই বললে, কেন? এখনই এখানে দিয়ে দিলেই ত লেঠা চুকে যায়।

boiRboi.net

গোবরা চড়া গলায় বললে, কী আমার কুটুম্বিতে। দশ জায়গায় দেড় করিয়ে হায়রান করা।

লম্বা চশমা পরা লোকটিও ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীর চাপা গলায় ঘরের দিকে তাকিয়ে বললে, অবুঝের মত চেঁচামেচি করে কোনই লাভ নেই মানকে। আমার সঙ্গে চলো। আসল মালিকের হাতে মালটা পৌঁছে দিলেই তোমাদের পাওনা তোমরা তখুনিই পেয়ে যাবে। এক মিনিটও দেরি হবে না, এসো।

বলতে বলতে লম্বা লোকটি কেবিনের বাইরে চলে গেল। ওরাও লোকটাকে অনুসরণ করলো।

ওরা খালসা কেবিন থেকে বের হয়ে যেতেই সুব্রত উঠে পড়ে কাউণ্টারে এসে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার অপর পাশে একটা বড় বট গাছের নীচে অন্ধকারে একটা কালো রংয়ের সিডন বডি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। লোকগুলো গাড়িটার দিকেই যাচ্ছে দেখা গেল।

লোকগুলো গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিতেই, সুব্রত একটু দূরে যেখানে তার ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে দেখলে ট্যাক্সিওয়ালা সামনের সিটে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সুব্রত ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে তুলে অগ্রগামী গাড়িটাকে অনুসরণ করতে বলে গাড়িতে উঠে বসল।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

আগের গাড়িটা চিৎপুর রোড ধরে বাগবাজারের দিকে চলেছে।

প্রায় হাত দশ পনের ব্যবধান রেখে সুব্রতর ট্যাক্সিও আগের চলমান গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলল। আগের গাড়িটা বরাবর চলতে চলতে এসে ঠিক চিৎপুর ও বাগবাজারের মোড়ে একটা প্রকাণ্ড চারতলা পুরাতন বাড়ির অল্প দূরে এসে থামল।

সুব্রতও ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ি থামাতে বললে।

সুব্রত গাড়ির মধ্যে বসে বসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, বাড়িটার সামনে একটা লোহার গেট। গেটের সামনেই ডানদিকে একটা গ্যাস লাইট পোষ্ট—

গ্যাস লাইটের আলো নীচের রাস্তার আশে পাশে এসে পড়েছে। তাতেই চারিপাশ বেশ দেখা যায়।

বাড়িটার দোতলা, তিনতলা, চারতলার সমস্ত জানালাই বন্ধ। মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না। পুরান পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়।

boiRboi.net

মানকে, গোবরা ও লম্বা লোকটা তিনজনে গাড়ি থেকে নামে। আগে আগে লম্বা লোকটা ও তার পিছনে মানকে ও গোবরা গেটের মধ্যে প্রবেশ করল।

সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে।

ওরা তিনজন এগিয়ে চলেছে।

সুব্রত বেশ একটু ব্যবধান রেখে ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।

গেট পার হলেই একটা খোলা জমি। জমিটার দু'পাশে টিনের শেড্ ঘর।

কতকগুলো লরী দেখা যায়। জমিটা পার হয়েই একটা ভেজান দরজা ঠেলে লোক তিনটে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুব্রত দরজার সামনে এসে দরজাটা ঠেলে দেখলে, ওরা দরজাটা বন্ধ করেনি, খুলেই রেখে গেছে।

মিনিট দু'তিন অপেক্ষা করে সুব্রত দরজার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

নিকষ কালো অন্ধকারে সহসা যেন ওর চোখ দু'টো অন্ধ হয়ে গেল। পকেটে যদিও পেন্‌সিল টর্চ আছে, তবু আলো জ্বালবার ভরসা হল না। ক্রমে একটু একটু করে অন্ধকারটা চোখে কতকটা যেন সয়ে গেল। সুব্রত পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে রাখল, কোন শব্দ শোনা যায় কিনা।

এগিয়ে যেতে যেতে ওর মনে হল, মাথার 'পরে কার যেন পায়ের চলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ও বুঝলে, লোকগুলো দোতলাতেই গেছে।

কিন্তু দোতলায় যাবার সিঁড়ি কোথায়? যতদূর মনে হচ্ছে নীচের তলায় কেউ নেই ও পকেট থেকে টর্চটা বের করে বোতাম টিপে আলোটা জ্বালাতেই দেখতে পেল, যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে, সেটা লম্বা একটা বারান্দা।

সামনেই একটা প্রশস্ত জংগলাকীর্ণ আবর্জনাপূর্ণ আঙ্গিনা। বারান্দার মেঝেতে এক ইঞ্চি পরিমাণ ধুলো বালি জমে আছে। বেশ বোঝা যায় যে বাড়িটায় কেউ বাস করে না। আর বসবাস করলেও এমনভাবেই বাস করে যে, বসবাসের তারা কোন চিহ্নই রাখতে চায় না। নীচের তলায় প্রায় সাত আটটা ঘর। প্রত্যেকটা ঘরই খালি, আবর্জনাপূর্ণ! দরজাগুলোতে শিকল দেওয়া।

আলো ফেলে ফেলে ঘুরতেই ও দেখতে পেল, উপরে উঠবার সিঁড়ি। আর কাল বিলম্ব না ক'রে টর্চটা নিভিয়ে অন্ধকারেই পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ও উপরে উঠতে লাগল।

উপরের তলাতেও ঠিক এমনি একটি বারান্দা। কোণের একটা ঘরের আধ-

ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। সুব্রত পা টিপে টিপে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

কাদের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন।

সুব্রত যে ঘরটা থেকে আলো আসছিল, তার পাশের ঘরটাতে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরটার এককোণে একটা সবুজ ঘেরটোপে ঢাকা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। ঘরটা খালি। কেউ নেই ঘরে। ভাগ্যক্রমে ও দেখলে, যে-ঘরে লোকগুলো কথাবার্তা বলছিল, সেই ঘর থেকে এই ঘরে আসা-যাওয়ার একটা প্রবেশদ্বার আছে। সেখানে ভারী একটা পর্দা টাঙ্গানো।

সর্বাগ্রে সুব্রত চট্ করে ঘরটার চারপাশে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

একপাশে একটা লোহার খাটে শয্যা বিছান। একটা কাঠের আলমারী এককোণে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করান। এককোণে একটা কুঁজো। কুঁজোর মুখে একটা গ্লাস উপুড় করা।

আর এককোণে একটা লোহার সিন্দুক। একটা আলনায় গোটাকতক কাপড়ও ঝুলছে। সুব্রত আস্তে আস্তে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার ঝুলন্ত পর্দার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

পাশের ঘরের লোকগুলো বেশ জোরে জোরেই কথা বলছে।

একজনের গলা শোনা গেল, একটু কর্কশ গলার স্বর, তাহলে তোমরা চিঠিটা সত্যি উদ্ধার করে এনেছো?

হ্যাঁ সর্দার! কিন্তু বেটা গোয়েন্দাটা আর একটু হলেই পিস্তলের গুলি চালিয়ে মানকের প্রাণটা নিয়েছিল আর কি।

আগের লোকটি ঐ কথায় কর্কশ গলায় হেসে উঠলো।

চিঠিটা যদি আজ তোরা না আনতে পারতিস—লোকটা বলতে লাগল। তবে আজ বহু টাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। সাবাস! খুব বাহাদুর!

গোবরা জবাব দিলে, তাতে আর সন্দেহ কি সর্দার! তা চিঠির মালিক সেই টাকা দেনেওয়ালা আজ এখানে এসেছিল কী?

না, আমিই সন্ধ্যার সময় তাজ হোটেলে দেখা করেছি! বলেছে চিঠিটা উদ্ধার হলে কাল এসে সে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আমাদের দেনা পাওনার কি হবে সর্দার?

কুছ্ পরোয়া নেই! টাকা সে আগাম দিয়ে গেছে।

এমন সময় সেই লম্বা লোকটার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

দিয়ে বিদায় করে দাও সর্দার!

BoiRboi.net

হ্যাঁ, টাকা পাশের ঘরের সিন্দুকে আছে। এখুনি এনে দিচ্ছি। ব্যস্ত কেন?

সুব্রত বুঝলে এখুনি হয়ত সর্দার এ ঘরে আসবে। ও চটপট বড় আলমারীটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং লুকাবার আগেই সে দেখে রেখেছিল ঘরের আলোর সুইচটা কোথায়।

যেখানে লুকিয়েছে তারই পাশে, অনায়াসেই হাত বাড়িয়ে সুইচটা পাওয়া যায়। আর আলমারীর পাশেই সিন্দুকটা।

একটু পরেই কে যেন এসে ঘরে ঢুকলো। সুব্রত আলমারীর পিছনে দাঁড়িয়ে পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

আগন্তুক এসে সবে চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলতে যাবে, সহসা সুব্রত এসে তার সামনে দাঁড়াল। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মোটাসোটা গড়ন। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল। নাকটা চ্যাপ্টা! চোখ দু'টো ছোট ছোট কুতকুতে। মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ। কুৎসিত!

লোকটা হঠাৎ সুব্রতকে সামনে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় যেন। কিন্তু যেমন সে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

টুঁ শব্দটি করেছো কী পিস্তলের গুলি তোমার বুকে গিয়ে তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাবে।

একটা কুৎসিত হাসির রেখা লোকটার মুখে যেন বিদ্যুৎ চমকের মতই খেলে গেল।

সুব্রত জানত না যে, যার সামনে সে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই লোকটা কত বড় দুঃসাহসী, নৃশংস ও ভয়ংকর! এর চাইতেও সংকটাপন্ন ভয়ংকর মুহূর্তেও সে তার উপস্থিত বিবেচনা, শক্তি ও সাহস হারায়নি।

লোকটা তার কুৎকুতে ভয়ংকর ধারালো ছুরির ফলার মত দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর হঠাৎ হ্যাঁ হ্যাঁ করে কর্কক হাসি হেসে উঠলো।

সুব্রত চমকে উঠলো, চুপ।

লোকটার কিন্তু ভ্রুক্ষেপও নেই। তেমনিই হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসছে!

সুব্রত আলোটার পরে লক্ষ্য করে একটা গুলি চালাল।

ঝন্ ঝন্ শব্দ করে মুহূর্তে ঘরটা নিশ্ছিদ্র আঁধারে ভরে গেল।

ইতিমধ্যে ওর হাসি শুনে পাশের ঘরের লোকগুলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছুটে এসেছে, সর্দার! সর্দার কী হলো?

boiRboi.net

একটা লোক ঘরের মধ্যে !

লোক ঘরের মধ্যে ? কোথা থেকে এলো ? মানকের গলা।

হ্যাঁ, আলমারীর দিকে···

সুব্রত ততক্ষণে আলমারীর দিক থেকে অন্ধকারে শিকারী বিড়ালের মত দেওয়াল ঘেঁষে এগুচ্ছে দরজার দিকে।

মানকে গম্ভীর গলায় বললে, ওরে শয়তান, শীঘ্র বের হয়ে আয়। সিংহের গুহায় পা দিয়েছিস্ ! বলতে বলতে অন্ধকার তাক্ করে একটা ছুরি ছুঁড়ে মারল মানকে !

ছুরিটা এসে সাঁ করে সুব্রতর ডান হাতে আঘাত হানল ; সঙ্গে সঙ্গে রিভল-ভারটা ওর হাত থেকে ঠন্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

সুব্রত পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেবার আগেই কে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের উপর।

সুব্রত এক ঝাঁকানি দিয়ে লোকটাকে ফেলে দিতেই লোকটা অন্ধকারে সুব্রতর পা চেপে ধরল।

সুব্রত আবার পড়ে গেল।

ততক্ষণে আরো একজন এসে সুব্রতর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল সেই অন্ধকারেই।

সুব্রত একজনের পেটে একটা প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিল। লোকটা গ্যাঁক করে শব্দ করে ছিটকে পড়ল।

সুব্রত সবে উঠে দাঁড়িয়েছে। সহসা কে তার মাথার'পরে অন্ধকারেই একটা প্রচণ্ড আঘাত হানল।

সুব্রত চোখে অন্ধকার দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ যে সুব্রত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তা ও বলতে পারে না।

ক্রমে একসময় একটু একটু করে ওর জ্ঞান ফিরে এল।

মাথাটা তখনো বেশ ভারী। ঝিম্‌ঝিম্ একটা ভাব। শরীরটা বরফের মত জমাট বেঁধে গেছে। রক্ত চলাচল একেবারে বন্ধ।

চোখের পাতা দু'টো খুলতে তখনো বেশ কষ্ট হয়। কোথায় আছে সে ?

কী অন্ধকার ! কালো বাদুড়ের ডানার মত অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠেছে যেন।

একটা ধুলো বালির সোঁদা গন্ধে নাক জ্বালা করে।

পাশ ফিরতে গেল, সমস্ত শরীরটা যেন একই সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো।

boiRboi.net

ও বুঝতে পারলে ওর হাত পা সব বাঁধা শক্ত দড়ি দিয়ে।

হাত দু'টো বাঁধা অবস্থাতেই চোখের কাছে নিয়ে এল। হাত দু'টো শক্ত করে বাঁধা, পৃথক করবার উপায় নেই।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ও চেয়ে দেখতে লাগল, ওই মাথার'পরে দেওয়ালের গায়ে ঘুলঘুলি দিয়ে একটু যেন ক্ষীণ আলোর আভাস পাওয়া যায়।

ও বুঝতে পারলে ওকে হাত পা বেঁধে একটা ধূলিমলিন তক্তপোষের 'পরে ফেলে রেখে গেছে ওরা।

এই বদ্ধঘরের অন্ধকার থেকে কে তাকে মুক্তি দেবে? ঝোঁকের মাথায় সহসা অমনভাবে একটা মাত্র পিস্তলের 'পরে নির্ভর করে চারজন শত্রুর সম্মুখীন হওয়া তার কোনমতেই উচিত হয়নি।

কপালের দু'পাশের রগ দু'টো যেন বেদনায় দপ্‌দপ্‌ করছে।

শরীরের সর্বত্র একটা ক্লান্তি বেদনা।

উঃ, কী অন্ধকার!

চোখের দৃষ্টি বুঝি অন্ধ হয়েই যাবে!

কিছুক্ষণ একান্ত নিঃসহায় ভাবেই ও কান পেতে যেমন পড়েছিল, তেমনি পড়ে রইলো। যদি কোন শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃত্যুর মধ্যেই জমাট শীতল অন্ধকার যেন অক্টোপাশের মত অষ্ট মৃত্যুবাহু বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ঘরে মধ্যে বদ্ধবায়ু—যেন শ্বাস নিতেও কষ্টবোধ হয়।

সহসা পাগলের মত সে একবার হাতের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করলে কিন্তু সবই বৃথা! সরু শক্ত দড়িতে এমনভাবে বাঁধা যে, সাধ্য কি তার ছিঁড়ে ফেলে সে বাঁধন? দড়িটা খুলবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফল এই হল যে, হাতের পরে বাঁধনটা চামড়া ও মাংস কেটে আরো শক্ত হয়ে বসে গেল।

উপায় নাই!

এমনি ভাবেই বদ্ধ অবস্থায় এই অন্ধকার বায়ুলেশহীন ধূলিমলিন ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে মুক্তি দেয়।

কিন্তু কেইবা তাকে মুক্তি দিতে আসবে এই অন্ধকার কারাগুহা থেকে? কেইবা জানতে পারবে?

সে কোথায় আছে তা ত সেও জানে না।

এখনো কি সেই চিৎপুরের বাড়ীটারই কোন ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে সে?

boiRboi.net

এখন কী রাত্রি, না দিন হয়েছে ?

হয়ত এমন কোন পোড়ো বাড়ির এক কুঠুরীর মধ্যে তাকে বন্দী করে রেখেছে যার আশেপাশে মাইল খানেকের মধ্যে হয়ত মানুষের চিহ্নও নেই! মানুষ হয়ত সেখানে মোটেই আসে না।

হয়ত তিলতিল করে তাকে এই বদ্ধ বায়ুলেশহীন অন্ধকার ঘরের মধ্যে এমনি হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে মরে যেতে হবে। কেউ জানবে না। কেউ শুনবে না তার আর্ত-কাতর চিৎকার।

আর যদিবা কেউ আসে, সে হয়ত শত্রুপক্ষেরই কেউ হবে। যে তার দুর্দশা দেখে নেকড়ের মত দাঁত বের করে হ্যা হ্যা করে নিষ্ঠুর হাসি হাসবে।

কিন্তু না, এ সব কি পাগলের মত ভাবছে ও!

যেমন করেই হোক তাকে মুক্তি পেতেই হবে।

মনে পড়ল, বহুদিন আগে একবার সে এমনি এক ঘরে বিখ্যাত দস্যু কালো-ভ্রমরের চক্রান্তে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে ত সে পালিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে যেন আশার একটা জোয়ার এসে ঝাপটা দিল।

ওর সমগ্র অন্তর যেন বাঁচবার একটা অদম্য প্রেরণায় সহসা আবার নবীন বলে বলীয়ান হয়ে উঠলো!

বাঁচতে তাকে হবেই। বিপদে সাহস হারালে চলবে না।

ধীরে ধীরে বহু কষ্টে ও কোনমতে ঐ বাঁধা অবস্থাতেই উঠে বসল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, তার ডান পায়ের জংঘার নীচে একটা তীক্ষ্ণ জাপানী ছুরি বাঁধা আছে।

কিন্তু সে ছুরিটা সে বের করবে কী করে?

নীচু হয়ে দাঁত দিয়ে ও হাঁটুর উপরের কাপড়টা ছিঁড়ে ফেললে। তারপর কোন মতে বাঁধা হাতের আঙ্গুল দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করল। তখন তার বাঁধন কাটতে বেশী দেরী হলো না।

ছুরিটা দাঁতে চেপে ধরে প্রথমেই হাতের বাঁধন একটু একটু করে সে কেটে ফেললে। তারপর পায়ের ও শরীরের।

সে এখন মুক্ত!

আনন্দে ওর মুখের 'পরে হাসি ফুটে উঠলো।

বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে ও খাটের উপর থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল।

পকেট হাতড়ে দেখলে তার পেনসিল টর্চটা আছে কিনা?

ধন্যবাদ! ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, টর্চটা তখনো তার পকেটের ক্লিপে আঁটা

BanglaBoi.net

আছে। শত্রুরা নিয়ে নেয়নি।

বোতাম টিপতেই একটা সরু আলোর রেখা অন্ধকারের বুক চিরে জেগে উঠলো যেন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী একটা দৃষ্টি!

প্রথমেই আলো দিয়ে ও খুঁজতে লাগল ঘরের কোন দরজা আছে কি না।

একদিককার দেওয়ালে একটা বন্ধ দরজা ওর নজরে পড়ল। কিন্তু দরজাতে ধাক্কা দিয়ে দেখলে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তাছাড়া, দরজাটা শক্ত সেগুন কাঠের। সাধ্য কী ওর দরজাটা ভেঙ্গে ফেলে পায়ের জোরে!

লোহার মতই শক্ত। তবু একবার ও দেহের সমগ্র শক্তি একত্রিত করে দরজাটার 'পরে চাপ দিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

তখন কতকটা হতাশ হয়েই সে ঘরের দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

নিরেট ইট ও সিমেণ্টের তৈরী দেওয়াল। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

দেওয়ালে দেওয়ালে ও টোকা মেরে দেখলে, যদি কোথাও ফাঁপা থাকে। কিন্তু না, শক্ত নিরেট দেওয়াল।

পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে ওর কপালের 'পরে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

থুপ করে সুব্রত তখন ধূলিমলিন মেঝের 'পরে বসে পড়ে দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরল।

না, কোন আশাই নাই। কিন্তু কী করবে ও এখন?

॥ এগার ॥

কিন্তু এমনি করে বসে থাকলে ত চলবে না।

মুক্তির একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে। আবার তখন দ্বিগুণ উৎসাহে সুব্রত উঠে দাঁড়াল। এবারে সে হাতের টর্চটা জেলে আলো ফেলে ফেলে ঘরের মেঝেটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে সুরু করল।

শক্ত সিমেণ্টে গড়া মেঝে। লোহার মত কঠিন।

প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে।

ধুলো সরিয়ে সরিয়ে সুব্রত মেঝে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় ওর নজর পড়ল, একটা লোহার উঁচু বল্টুর মত কী যেন মেঝে থেকে উঁচু হয়ে আছে।

সুব্রত তখন সেটাকে নিয়ে প্রবল উৎসাহে নাড়াচাড়া করতে সুরু করলে।

boiRboi.net

কিন্তু সেটা মেঝের সিমেন্টের সঙ্গে একেবারে গাঁথা।

সুব্রত ভাবলে এটা যখন মেঝেতে আছে, এর একটা উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই আছে।

হঠাৎ মেঝেতে একটা লোহার বল্টুর মতই বা থাকতে যাবে কেন?

সুব্রত আবার আলো ফেলে ফেলে ঘরের মেঝের সর্বত্র খুঁজে দেখলে। কিন্তু আর কোথাও ও রকম লোহার বল্টু তার নজরে পড়ল না।

সুব্রত যখন অনেক চেষ্টা করে ও গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সেটাকে এতটুকু নড়াতে পারল না, তখন সে তার ছুরিটা দিয়ে বল্টুর চার পাশ কুরে কুরে ফেলতে লাগল।

ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বল্টুটা আরো একটু সজাগ হয়ে উঠল। এবার হঠাৎ কী ভেবে সুব্রত বল্টুটার'পরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড একটা চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘড়ঘড় শব্দ। চোখের নিমেষে বল্টুটার ঠিক হাতখানেক দূরে মেঝের পাথর সরে গিয়ে একটা গোলাকার গর্ত দেখা গেল। সুব্রত এক লাফ দিয়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়াল।

বুকটার মধ্যে তখনও তার উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে!

সুব্রত এগিয়ে এসে গর্তটার মুখে আলো ফেললো। দেখলে, মেঝেতে যেখানে পাথর সরে গিয়ে ফাঁকা হয়ে গেছে, সেখানে একটা গোলাকার সিমেন্টের ঢাকনা-মত নিচের দিকে ঝুলছে। গর্তের মুখে ও আবার আলো ফেলল। ধাপে ধাপে অপ্রশস্ত সিঁড়ি নীচে কোন্ অন্ধকার গহ্বরে নেমে গেছে, কে জানে? ও এতক্ষণে বুঝতে পারলে এটা একটা গোপন সুড়ংগ পথ। কোন স্প্রিং বা ওই জাতীয় কিছুর সাহায্যে কাজ করে।

সুব্রত মনে মনে ভাবলে, আশ্চর্য! জানি না, এই সিঁড়ি কোথায় গিয়ে শেষ শেষ হয়েছে। এই সিঁড়ি ধরে এগুলো শেষ পড়ন্ত কোথায় যেতে হবে কে জানে? হয়তবা সাক্ষাৎ মৃত্যুর গহ্বরে বরাবর চলে গেছে। এখন এই পথ ধরে অগ্রসর হওয়া উচিত কি না? কিন্তু না অগ্রসর হয়েই বা লাভ কী? এইখানে এই ঘরের মধ্যে বসে থাকলেও ত মুক্তির কোনই উপায় হবে না। এখানে তাকে এইভাবে বন্দী করে রেখেছে শত্রুপক্ষ। তারা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত আরামে বসে থাকবে না। তারা যদি দলে ভারী হয় এবং তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে মুক্তির পথ আরো দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় বিবেচনা করে দেখতে গেল অগ্রসর হওয়াই উচিত। হয়তবা এই পথের শেষে মুক্তি মিলেও মিলতে পারে। চান্স একটা নেওয়া দরকার।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, সে এই পথ ধরেই অগ্রসর হবে।

boiRboi.net

সুব্রত গর্তের ভিতরে নামল এবং সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে সুরু করল। উঃ, কী অন্ধকার? গাঢ় কালির মতই শ্বাসরোধকারী জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

সুব্রত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একবার থমকে দাঁড়াল। কোন শব্দ শোনা যায় কি না?

না, কিছুই শোনা যায় না।

সুব্রত আবার সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল। এক, দুই।...এমনি করে প্রায় বারোটা সিঁড়ির 'পরে ওর পা সমতল ভূমিতে ঠেকল।

ও দাঁড়াল। হাতের টর্চটা জেলে ও চট্ করে একবার তার আশপাশ আলোতে দেখে নিল। সরু অপ্রশস্ত গলিপথ। কিন্তু কোথায় গিয়ে যে ঐ পথ শেষ হয়েছে কিছুই তার বোঝবার উপায় নেই। যেন বিরাট একটা কালো অজগর মুখ ব্যাদন করে আছে।

সুব্রত আবার অগ্রসর হলো।

বোধহয় দশ পাও সে অগ্রসর হয়নি। সহসা কার তীব্র কণ্ঠস্বর নির্ঘোষে ওর কানে এসে বাজল, থাম।

তারপরেই একটা তীব্র আলোর রশ্মি ওর চোখেমুখে এসে সুতীব্র ঝাপটা দিল।

কিহে মাস্টার, চলেছো কোথায়?

বিস্ময়ে ও ঘটনার আকস্মিকতায় সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ও দেখলে গলিপথ কখন প্রশস্ত হয়ে গেছে। সামনে যমদূতের মত দু'জন লোক। তাদের দু'জনেরই হাতে উদ্যত পিস্তল।

সুব্রত তার হাতের টর্চটা জ্বালালে এবং নিঃশব্দে লোক দু'টোর মুখের 'পরে প্রতিফলিত করল। শান্ত অবহেলার ভঙ্গীতে লোক দু'টি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তাদের কঠোর সংকল্পের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি।

সুব্রত নিরস্ত্র। সম্বল মাত্র জাপানী ছুরিটা! দু'টো পিস্তলের কাছে ওটা কিছুই নয়।

সুব্রত চকিতে তার আশেপাশে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। সামনেই গলিপথটা প্রশস্ত হয়ে গেছে। সামনেই দেখা যায় দু'দিককার দেওয়ালে দু'টো দরজা। একটার কবাট বন্ধ, অন্যটার খোলা। খোলা কবাটের সামনেই লোক দু'টো দাঁড়িয়ে।

তিনজনেই নিস্তব্ধ, নিঝুম। কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা—অন্ধকারে কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। সহসা আবার সুব্রত তার

boiRboi.net

টর্চের আলো একজনের মুখের 'পরে প্রতিফলিত করলে। লোকটা হঠাৎ চোখটা বুঁজে ফেললে মুহূর্তের জন্য। আর সেই মুহূর্তের অবকাশে সুব্রত চোখের পলকে মরিয়া হয়ে বিড়ালের মত নীচু হয়ে বসে পড়ে লোকটার পায়ে এক লাথি মারলে।

লোকটার হাতে টর্চ ছিল। সে হঠাৎ ঐভাবে আক্রান্ত হয়ে একপাশে ছিটকে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার করে উঠলো। লোকটার হাত থেকে টর্চ ও পিস্তলটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

অন্য লোকটা ততক্ষণে সুব্রতর 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুব্রত তাকে জাপানী যুযুৎসুর প্যাঁচে মুহূর্তে ধরাশায়ী করল।

অন্য লোকটার পায়ে বেশ চোট লেগেছিল। কিন্তু তবু সে উঠে বসেছে। সুব্রত তাকে আক্রমণ করবার সুযোগমাত্র না দিয়ে আবার যুযুৎসুর পাঁচে ধরাশায়ী করলে এবং পরক্ষণেই সে আলো জেলে প্রথমেই পিস্তল দু'টো করায়ত্ত করে নিল।

লোক দুটোর পিস্তলের লোহার বাঁটটা দিয়ে লোকটার মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত করতেই লোকটা অস্ফুট কাতর শব্দ করে তখুনি আবার জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা তখন উঠে বসে সুব্রতর দিকে পিটপিট করে চাইছে।

সুব্রত লোকটার দিকে এগিয়ে এসে তার মাথায় পিস্তলের নলটা দিয়ে একটা মৃদু খোঁচা দিয়ে ব্যঙ্গ করে বললে, কিহে বন্ধু! কেমন মনে হচ্ছে এখন? লক্ষ্মী ছেলের মত উঠে দাঁড়াও ত দেখি!

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

শোন, সোনার চাঁদ! যা বলবো আমি, তাই কর ত দেখি। নইলে আমার হাতে পিস্তল—

লোকটা দেখতে যেমন মোটা, তেমনি লম্বা-চওড়া।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বিশ্রস্ত, এলোমেলো।

ডান দিককার কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। চোখ দু'টো গোল কুতকুতে। দৃষ্টি নিষ্ঠুর ধারালো ছুরির ফলার মতই। রক্তলালসায় হিংস্র যেন।

পরিধানে সাধারণ কুলিদের মত ময়লা ধুতি ও একটা কোর্তা।

লোকটা তার কুতকুতে দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে ভারী খনখনে গলায় বললে, কি চাও তুমি?

এই সুড়ঙ্গ থেকে প্রথমে বের হতে চাই। লক্ষ্মী ছেলের মত এখন আমায় বের হবার পথ দেখিয়ে দাও দেখি, সোনার চাঁদ!

boiRboi.net

বেশ চল! লোকটি অগ্রসর হলো।

লোকটার পিছুপিছু সুব্রতও অগ্রসর হলো।

॥ বার ॥

প্রায় পাঁচ মিনিট চলার পর দেখা গেল আবার একটা সিঁড়ি।

সুব্রত অগ্রগামী লোকটাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

সিঁড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা টানা বারান্দায়। বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগুবার পর সামনে দেখা গেল দু'টো দরজা। একটা খোলা, অন্যটা বন্ধ। লোকটা খোলা দরজাটার দিকে না গিয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে এগিয়ে চলল।

সুব্রত হঠাৎ থামল। বললে, ঐ খোলা দরজাটা দিয়ে চল।

লোকটা ফিরে দাঁড়িয়ে আগের মতই খনখনে গলায় বললে, না।

সুব্রত ভ্রূ দু'টো কুঁচকে সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, কেন না?

লোকটা বললে, এইটাই বাইরে যাবার রাস্তা। বলে সে বন্ধ দরজাটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

খোলা দরজাটা দিয়ে তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?

লোকটা ভারী গলায় জবাব দিলে, অত খোঁজে তোমার দরকার কী? এ বাড়ীর বাইরে যেতে চাও, চল, বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।

উঁহু! আগে আমাকে বলতে হবে, ঐ দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়। সুব্রত কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলে।

বলতে পারবো না। লোকটা সমান গলায় জবাব দিলে।

সুব্রত পিস্তলটা উঁচিয়ে লোকটার দিকে আরও একটু এগিয়ে এলো। তারপর তীক্ষ্ণ আদেশের স্বরে বললে, দেখ সোনার চাঁদ, গোলমাল করে লাভ হবে না। পাশার দান উল্‌টে গেছে। আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই তোমার মরণ-বাঁচন! আমার কথা না শুনলে মুহূর্তে তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে পারি, তা জান? এসো, ভাল চাও ত লক্ষ্মী ছেলের মত দরজাটা খুলে এগোও।

না।

কিন্তু আমি বলছি, হ্যাঁ। তোমাকে খুলতেই হবে।

খুলবো না। তোমার হাতের ও পিস্তলকে আমি ডরাই না। তাছাড়া মরার থেকে আমরা বেশী ডরাই 'নেকড়ের থাবা'-কে!

সুব্রত ক্ষণকাল যেন কি ভাবলে। হঠাৎ মনে হল তার মাথার 'পরে কার

boiRboi.net

যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

এমনি করে প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চিত ভাবে আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সময়ক্ষেপ করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বললে, বেশ চল, যে রাস্তা দিয়ে যেতে চাও।

লোকটা তখন অগ্রসর হয়ে পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বার করে একটা চাবি দিয়ে দরজাটা খট্ করে খুলে ফেললে।

দরজাটা খুলতেই একটা ঠাণ্ডা শীতল হাওয়ার ঝলক এসে সুব্রতর চোখেমুখে যেন শান্তি ও আরামের ঝাপটা দিল।

আঃ! সুব্রত একটা আরামের নিঃশ্বাস নিল।

লোকটা দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললে, চলে যাও—সামনেই রাস্তা।

সুব্রত একটু মৃদু হেসে বললে, ধন্যবাদ! কিন্তু বন্ধু, একা একা যেতে আমি রাজী নই। তোমাকেও আমার সঙ্গে কিছুটা পথ যেতে হবে!

আমি আর এক পাও যেতে পারবো না। লোকটা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল।

কিন্তু আমার হুকুম, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

যদি না যাই?

তবে যাতে যেতে বাধ্য হও সেই চেষ্টাই করা হবে।

লোকটা সুব্রতর কথায় সহসা বাজখাঁই গলায় হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো। তারপর হাসতে হাসতেই বললে, কোথায় যেতে হবে কর্তা?

এই খানিকটা রাস্তা।

নিশ্চয়ই থানায়?

খুব সম্ভব।

যাঃ! তুমি কিন্তু ঠাট্টা করছো!

তাহলে তুমি যাবে না?

না।

সহসা আর বাক্য ব্যয় না করে সুব্রত বাঘের মত লোকটার 'পরে লাফিয়ে জাপানী যুযুৎসু দিয়ে চেপে ধরল। এইবার!

উঃ, ছাড়, ছাড় লাগে। কী ইয়ারকী করছো।

সুব্রত ততক্ষণে পকেট থেকে একটা শিকল বের করে বেশ করে লোকটার হাত দুটো বেঁধে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়াল। এইবার লক্ষ্মী ছেলের মত চল চাঁদ।

boiRboi.net

লোকটা সুব্রতর নির্দেশমতো উঠে দাঁড়ালো। লোকটা উঠে দাঁড়াতেই সুব্রত লোকটার কোমর থেকে চাবির গোছাটা কেড়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

তারপর লোকটার ঘাড়ে জোরে জোরে দুটো ঘুঁষি মেরে বললে, চল্ বেটা!

লোকটাকে ধাক্কা দিতে দিতে সুব্রত এগিয়ে নিয়ে চলল।

সামনেই রাস্তা, কিন্তু অন্ধকার।

চারিদিকে একবার চোখ বুলোতেই ও বুঝতে পারলে, এটা চিৎপুর রোড।

তবে যেখান দিয়ে ও ঐ বাড়িতে প্রবেশ করেছিল, এটা সে অংশ নয়। অন্য একটা অংশ।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূর্বাশার প্রান্ত ঘেঁষে রাত্রির বিলীয়মান অন্ধকার। প্রথম ভোরের উদীয়মান অস্পষ্ট আলোর চাপা আভাস দিচ্ছে।

রাস্তাঘাট এখনো নির্জন! লোকজনের চলাচল এখনো সুরু হয়নি।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে লোকটাকে নিয়ে এগুতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ও পিছন ফিরতেই দেখতে পেলে একটু আগে যে দরজা পথে ওরা বের হয়ে এসেছে, সেই দরজার সামনে চারজন লোক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ও বুঝতে পারলে না যে, লোকগুলো ওদেরই অনুসরণকারী কিনা? কেন না লোকগুলো সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে অন্ধকারে।

সুব্রত বোধহয় সেখান থেকে দশ পাও এগোয়নি। সে আবার কি ভেবে লোকটাকে নিয়ে ফিরে এসে সেই চাবিটা দিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে আবার অগ্রসর হলো।

সুব্রতর এখন প্রধান লক্ষ্য আশেপাশে কোন পুলিশ দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকেই ও দেখতে পেল না।

এমন সময় হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ঐ দিকে আসছে দেখা গেল। সুব্রত হাতের ইশারায় ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করালে।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই সুব্রত লোকটাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল এবং ড্রাইভারকে লালবাজার থানার দিকে চালাতে বললে।

ট্যাক্সি তীব্র গতিতে ছুটলো লালবাজারের দিকে।

কিন্তু হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ল ট্যাক্সিটা লালবাজার থানার দিকে না গিয়ে উল্টো পথে ছুটছে।

ব্যাপার কী। ড্রাইভারটা কোথায় গাড়ী নিয়ে চলেছে।

boiRboi.net

সুব্রত একবার বন্দীর দিকে তাকাল। লোকটা নিঝুমভাবে গাড়ীর সীটে হেলান দিয়ে বসে আসে। সম্পূর্ণ নির্বিকার সে।

লোকটাকে কোথাও দেখেছে বলে সুব্রতর মনে হয় না।

আবার সুব্রত রাস্তার দিকে তাকাল। বুঝলে গাড়ি আবার চিৎপুর রোডের দিকেই চলেছে।

ও তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে বললে, এই, কোথায় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিস্? তোকে না লালবাজার থানার দিকে যেতে বলেছিলাম।

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড্ আরো বাড়িয়ে দিলে, সুব্রতর কথায় সে কানই দিল না।

সুব্রত ক্ষিপ্রগতিতে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ড্রাইভারের মুখের কাছে নিয়ে বললে, এই ভাল চাস্ ত' গাড়ী থামা। না হলে তোকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো শয়তান।

ড্রাইভার গাড়ির গতি আরো দ্রুত করে দিলে। কী করবে এখন সুব্রত? এই স্পিডের উপর যদি সত্যি সত্যিই ও ড্রাইভারকে গুলি করে, তবে গাড়ি উল্টে ওরা সবাই এখুনি মারা যাবে।

এমন সময় হঠাৎ গাড়িটা আবার ধীরে ধীরে থেমে গেল।

সুব্রত গাড়ির ব্যাক্‌সীট্ থেকে নেমে পিস্তল হাতে ড্রাইভারের সামনে এসে দাঁড়াল। বেটা শয়তান! এখন তুই যদি আমার কথামত গাড়ি না চালাস্ ত' তোকে গুলি করে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

এমন সময় হঠাৎ সুব্রত দেখলে চারজন ষণ্ডাষণ্ডা লোক গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুব্রত দেখলে আর দেরী করা উচিত নয়। এ এক লাফে গাড়ির সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসে, হাতের পিস্তলটা ড্রাইভারের কপালে ছুঁইয়ে বললে, শীগগির চল, লালবাজারের দিকে।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি আবার তীব্র গতিতে ছুটে চলল।

এবারে আর ড্রাইভার উল্টো পথে না গিয়ে সোজা লালবাজার থানার দিকেই চলল।

গাড়ি যখন লালবাজার থানার গেটের মধ্যে এসে ঢুকল, সুব্রত গাড়ি থেমে নেমে পিছনের দিকের দরজা খুলতে গিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সিট খালি। বন্দী নেই।

গভীর উত্তেজনায় ও গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট বন্দীর দিকে তাকাবারও এতক্ষণ

boiRboi.net

অবকাশ পায়নি।

ও বুঝতে পারলে গাড়ি যখন একটুক্ষণের জন্য থেমেছিল, সেই লোকগুলোই বন্দীকে নিয়ে পালিয়েছে।

রাগে সুব্রতর সর্বশরীর তখন ফুলছে। ড্রাইভারের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে, চল্ বেটা, থানায় চল্। আজ তোর শয়তানির আমি শেষ করবো।

ড্রাইভারকে নিয়ে সুব্রত সোজা তার অফিস ঘরে এসে ঢুকল। চেয়ারের 'পরে বসে ও লোকটার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। জাতিতে শিখ। লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় পাগড়ী। ঢিলে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরনে।

কি নাম তোর?

বলবন্ত শিং।

লোকটা কি করে পালাল?

আমি কি করে বলব সাহেব? আমি ত' সামনের সীটে বসেছিলাম।

শোন্। এখন আমি তোকে যা যা জিজ্ঞাসা করবো, তার ঠিক ঠিক জবাব যদি না দিস্, তবে তোকে এখুনি হাজতে বন্দী করবো। আর যাতে দশ বছর তোর শ্রীঘর বাস হয় তার ব্যবস্থা করবো।

সাহেব আমি কিছু জানি না। গরীব লোক।

এখন বল্, ঐ লোকগুলোকে আগে থাকতে তুই চিনতিস্ কিনা?

আজ্ঞে না সাহেব।

তুই উল্টো পথে গাড়ি চালিয়েছিলিস্ কেন?

সাহেব, আমার কোন কসুর নেই! আমি ঐ পথে গাড়ি নিয়ে আসছিলাম, এমন সময় সেই বাড়ি থেকে চারজন লোক বের হয়ে এসে আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বললে, এখুনি একজন লোক একটা বন্দীকে নিয়ে ওই পথে আসবে। ওদের নিয়ে উল্টো পথে আবার এখানে আসবি। আমি ভেবেছিলাম, আপনি ওদেরই লোক। সেই ভেবে আমি গাড়ি উল্টো পথে নিয়ে গেছি। আমার কোন কসুর নেই সাহেব।

লোকগুলোকে দেখে তোর মনে কোন সন্দেহ হয়নি?

না।

ওদের কাউকেই তুই কোনদিন দেখিস্‌নি? চিনতিস্‌ও না?

না সাহেব।

যে লোকটা আমার সঙ্গে গাড়িতে ছিল তাকেও না!

বেশ, আজ সন্ধ্যাবেলা আবার তোকে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। পারবি?

boiRboi.net

কেন পারবো না সাহেব। খুব পারবো!

তোর গাড়ির নং, লাইসেন্স নং, ঠিকানা সব আমাকে দিয়ে যা। আর আজ সারাদিন তুই হাজতে থাকবি। ওখানে আমাকে পৌঁছে দিলে তোর ছুটি।

সুব্রত কলিংবেল টিপল। একজন সার্জেন্ট এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল।

এই লোকটাকে হাজতে বন্দী করে রাখ। আর এই গাড়ির লাইসেন্সের নাম্বার আমাকে দিয়ে যাও।

সার্জেন্ট লোকটাকে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * * *

সুব্রত যখন আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসায় ফিরে এলো, বেলা তখন প্রায় সাতটা।

ভৃত্যকে ডেকে এক কাপ চায়ের আদেশ দিয়ে সুব্রত সোজা গিয়ে তার শয়ন ঘরে প্রবেশ করল।

বড় ক্লান্ত সে। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সর্বশরীর তখন তার নেতিয়ে পড়ে।

প্রথমেই সে কাপড়-জামা ছেড়ে স্নানঘরে গিয়ে বেশ ভাল করে স্নান-পর্ব শেষ করলে। তারপর এক কাপ চা খেয়ে সোজা গিয়ে সে শয্যায় আশ্রয় নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ তের ॥

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উতরে গেছে। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে।

সুব্রত তালুকদারকে কতকগুলো আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়ে লালবাজার থানা থেকে বের হলো।

আগের রাত্রের ট্যাক্সিতে উঠে ও ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

সুব্রত আগে থেকেই তার প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিল। চিৎপুর রোড ও রিডন স্ট্রীট যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে এসে সুব্রত ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে। গাড়ি থেকে নেমে সুব্রত ড্রাইভারকে বললে, তুমি এখন যেতে পার।

ড্রাইভার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বললে, সেখানে যাবেন না সাহেব!

না, তুমি যাও।

ড্রাইভার সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। পরক্ষণেই সুব্রতকে একটা সেলাম দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল উল্টো পথে।

গাড়িটা হাত দশ-পনের যেতে না যেতে অন্য একটা ট্যাক্সি এসে সুব্রতর সামনে

boiRboi.net

দাঁড়াল। সুব্রত চকিতে গাড়ির মধ্যে উঠে বসে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললে পীতাম্বর, Quick ওই আগের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ কর।

পীতাম্বর সুব্রতর নির্দেশমত গাড়ি নিয়ে ওখানে এসে সুব্রতর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আগের গাড়িটা সোজা চিৎপুর রোড ধরে গিয়ে মেছুয়া বাজারের মধ্যে দিয়ে নয়া রাস্তার দিকে তখন ছুটছে।

সুব্রতর গাড়ি আগের গাড়িটার পিছু পিছু চলতে লাগল।

সুব্রত দেখতে লাগল, আগের গাড়িটা নয়া রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে আবার বিডন স্ট্রীটে ঢুকল। তারপর বিডন স্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে এসে পড়ল।

চিৎপুর রোডে পড়ে বরাবর সেই বাড়িটার দিকেই এগুতে লাগল। বাগবাজারে কাছাকাছি এসে সহসা গাড়িটা আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

পীতাম্বরও গাড়ি থামালে।

সুব্রত পীতাম্বরকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে গলির দিকে এগিয়ে গেল। কেন না, আগের ট্যাক্সির ড্রাইভার তখন গাড়ি থেকে নেমে গলির মধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে।

সুব্রত গলির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলে গলিটা বেশ প্রশস্ত। গলির মাথায় একটা মস্ত বড় পুরাতন বাড়ি। তারই একটি নীচের ঘরে আলো জ্বলছে এবং অনেক লোকের গোলমাল শোনা যাচ্ছে। খোলা দরজার 'পরে একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে, 'চাচার হোটেল'।

সুব্রত ইতিমধ্যেই গাড়ির মধ্যে বসে বসে তার বেশভূষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন [illegible] নিয়েছি[illegible]। এখ[illegible] কেউ [illegible]কে দে[illegible]ল [illegible]রণ [illegible]লি [illegible]র [illegible]
[illegible]না। [illegible]

ওরা কী বলাবলি করছে।

সুব্রত শুনতে পেলে কাউন্টারের লোকটা বলছে, তোর পিছু কেউ নেয়নি ত' রে ?

না, টিকটিকি ব্যাটা মাঝ-রাস্তায় নেমে গেল। উঃ, খুব বেঁচে গেছি! শালা আমার সব ভুল নম্বরগুলো নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কর্তা আজ এখানে আসছে নাকি ?

তা' বলতে পারি না। তবে তোর প্রাপ্য কুলীর কাছে আছে। চাইলেই পাবি।

একটা ছোকরা এসে এক কাপ চা সুব্রতর সামনে টেবিলের ওপর রেখে গেল।

সুব্রত এতক্ষণে স্পষ্টই বুঝতে পারলে লোকটা ঐ দলেরই একজন। তাকে ধাপ্পা দিয়েছে বেমালুম। কিন্তু এখন সে কী করবে ? যেমন করেই হোক বাড়িটার মধ্যে তাকে আবার ঢুকতে হবে। হাত দিয়ে পকেটে অনুভব করে দেখলে চাবির গোছা ঠিক আছে! সুব্রত তাড়াতাড়ি চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে অন্ধকার গলিপথে বের হয়ে এল।

অন্ধকার অলক্ষ্যে গলিপথে দাঁড়িয়ে সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বেশ ভাল করে বাড়িটা দেখে নিল।

বাড়িটা অনেকখানি লম্বা। কিন্তু আগাগোড়া বাড়িটা সবটাই অন্ধকার। কোথাও কোন আলোর আভাস পর্যন্ত নেই।

সুব্রত গলিপথ ধরে এগুতে পাগল।

খানিকটা এগুবার পর ও আবার প্রশস্ত চিৎপুর রোডের 'পরে এসে পড়ল। হঠাৎ ও লক্ষ্য করলে, সেই বাড়িটা—যার মধ্যে গতকাল রাত্রে প্রবেশ করে ও বন্দী হয়েছিল এবং সামনেই সেই দরজাটা, যেটায় গতকাল রাত্রে নিজহাতে সেই চাবি লাগিয়েছিল।

সুব্রত আর চিন্তামাত্র না করে তখুনি পকেট থেকে গত রাত্রের সেই চাবির গোছাটা বের করে একটু চেষ্টার পরই দরজা খুলে ফেললে।

নিঃশব্দে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলে সুব্রত।

অন্ধকার ?…একটা চাপা ভ্যাপসা দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে। পকেট থেকে টর্চটা বের করে ও আলো জ্বালালে এবং টর্চের আলোয় ও নিঃশব্দে অগ্রসর হলো।

গত রাত্রের সেই বন্ধ দরজাটার কাছে এসে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

টর্চ হাতে করে সুব্রত সেই দরজাপথে প্রবেশ করে দেখলে একটা খালি আবর্জনাপূর্ণ মাঝারি গোছের ঘর।

আলো ফেলে সুব্রত ঘরের চারপাশ ভাল করে দেখে নিল। আর একটা বন্ধ দরজা ওর নজরে পড়ল। সে দরজাটাও খোলাই ছিল। ঠেলতেই ফাঁক হয়ে গেল।

সামনেই একটা বারান্দা। বারান্দার এক কোণে প্রশস্ত সিঁড়ি ওর নজরে

boiRboi.net

পড়ল। শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি বেয়ে ও উঠতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই দেখলে নীচের তলার মতই আর একটি বারান্দা। কোন একটা ঘরের ঈষৎ ভেজান দরজার ফাঁকে খানিকটা আলোর রশ্মি এসে বারান্দার 'পরে লুটিয়ে পড়ছে।

সুব্রত ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল পা টিপে-টিপে।

যে-ঘর থেকে আলো আসছিল তারই পাশের ঘরের দরজাটা খোলাই আছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখল ঘরটা অন্ধকার। নিঃশব্দে ও ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। পাশের ঘরে যেন কাদের মৃদু কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার মাঝে একটা ভারী পর্দা ঝুলছে।

সুব্রত পা টিপে-টিপে সেই পর্দার সামনে এসে দাঁড়াল।

ও দেখলে, মাঝারি গোছের একখানি ঘর।

ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল পাতা, টেবিলের চারপাশে পাঁচ-ছয়জন লোক বসে। প্রথমেই ও লক্ষ্য করলে গত রাত্রের সেই সুবেশধারী বলিষ্ঠ ঢ্যাংগা লোকটা মাঝখানে বসে আছে। মানকে ও গোবরাও দলে আছে, বাকী :দু'জনকে ও চিনতে পারলে না। হঠাৎ ও দেখলে একটা ট্রেতে করে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে একটি দশ-এগার বছরের মেয়ে ঘরে প্রবেশ করল, অন্য দিককার একটি পর্দা সরিয়ে।

মেয়েটার চেহারা অত্যন্ত রুগ্ন। মুখখানি মলিন বিষণ্ণ। টানা-টানা ছলছল দু'টি চোখ। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। একমাথা রুক্ষ চুল, এলোমেলো। দু'হাতে একগাছি করে কাচের চুড়ি। পরিধানে ময়লা ছেঁড়া একটি তাঁতের ডুরে শাড়ি।

মেয়েটি ট্রে হাতে করে টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই সকলে এক এক করে হাত বাড়িয়ে এক একটি চায়ের কাপ তুলে নিতে লাগল।

ঢ্যাংগা লোকটির চায়ের কাপটা ট্রের ওপর থেকে তুলতে গিয়ে মেয়েটি একটু নড়ায় খানিকটা চা ছল্‌কে লোকটার প্যাণ্টের ওপর পড়ে গেল। পরক্ষণেই লোকটা চায়ের কাপটা টেবিলের 'পরে নামিয়ে রেখে গর্জন করে উঠলো : হারামজাদী চোখের মাথা খেয়েছিস্ ?

মেয়েটি ভীত-চকিত করুণ দৃষ্টি মেলে ঢ্যাংগা লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

একজন মোটা লোক ঢ্যাংগা লোকটার পাশেই বসেছিল। সে উঠে দাঁড়াল। তার মুখখানা তখন রাগে ফুলছে, সে খিটখিটে গলায় বললে, ফের তুই অসাবধান হয়ে কাজ করবি ! কতদিন না তোকে সাবধান করেছি সর্তক হয়ে কাজ করতে !

boiRboi.net

বলতে বলতে লোকটা এসে মেয়েটির চুলের মুঠি চেপে ধরল : আজ তোরই এক-দিন কী আমারই একদিন !

ওগো, আমায় আর মেরো না গো ! আমায় আর মেরো না ! আর অসাবধান হব না ! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি ! করুণ কান্নায় মিনতিতে মেয়েটির কণ্ঠস্বর গুঁড়িয়ে গেল।

না, আজ আর তোর রক্ষে নেই। চল বলতে বলতে লোকটা মেয়েটির চুলের মুঠি চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সুব্রতর সতর্ক হবার পূর্বেই এ ঘরে এসে ঢুকলো।

মেয়েটির পিঠে দুম্ করে একটা কিল মারতেই মেয়েটি আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো।

সুব্রতর সর্বশরীর তখন রাগে ফুলছে। পাশের ঘরের লোকগুলি মেয়েটির আর্ত করুণ চীৎকার শুনে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল ! আর নয়। সুব্রত বাঘের মতই লাফিয়ে পড়ে লোকটার নাকের 'পরে অন্ধকারেই লক্ষ্য করে এক ঘুষি বসালে। ঘুষি খেয়ে লোকটা অতর্কিতে প্রথমটায় ভয়ানক হকচকিয়ে গেল। কিন্তু সে সতর্ক হবার পূর্বেই সুব্রত একটা প্রচণ্ড লাথি বসালে লোকটার পেটে। একটা গ্যাঁক করে শব্দ করে লোকটা মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো।

এঘরে ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে।

লোকগুলো পাশের ঘর থেকে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুব্রত এক লাফ দিয়ে মেয়েটিকে নিজের পিছনে টেনে এনে দাঁড়াল তাকে আড়াল করে।

লোকগুলো যেন সুব্রতকে ঐ সময় ঐ ঘরে দেখে বিস্ময়ে একেবারে 'থ' বনে গেছে।

ঢ্যাংগা লোকটাই সর্বপ্রথম কথা বললে, কী করছিস্ তোরা দাঁড়িয়ে। ধর ব্যাটাকে !

মানকে সুব্রতর দিকে এগিয়ে এলো, সুব্রতর কঠিন একটা ঘুষি দুম করে লোকটার নাকের ডগায় এতে পড়তেই লোকটা চোখে শর্ষেফুল দেখে। সে বসে পড়ল।

বাকী তিনজন তখন এগিয়ে এসেছে। সুব্রত সমানে ঘুষি চালাতে লাগল। আর বিদ্যুৎ গতিতে চারপাশে চরকির মত ঘুরতে লাগল। আর একজন ধরাশায়ী হলো।

ঢ্যাংগা লোকটা তখন পিছন থেকে এসে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরেছে। জুজুৎসুর প্যাঁচে সে-ও কাবু হলো। বাকী ছিল একজন। সে এক লাফে ঘর থেকে বের হয়ে পালাল। সুব্রত তখন চকিতে মেয়েটির হাত ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে সোজা ঘরের বাইরে এসে এপাশ থেকে শিকল তুলে দিল এবং তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে অন্য দরজাটায় ও শিকল তুলে দিল। লোক চারটিকে বন্দী করে সুব্রত

BanglaBoi.net

সোজা মেয়েটির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে লাগল। এ বারান্দা ও-বারান্দা দিয়ে ঘুরে অবশেষে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তায় নামতে ও দেখতে পেলে ওর নির্দেশমত কয়েকজন পুলিশ তখন রাস্তার 'পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে সে পীতাম্বরের ট্যাক্সিতে মেয়েটিকে নিয়ে বসল।

কোথায় যাবো, হুজুর ?

তাই ত'! এখন কোথায় যাওয়া যায় ? হোটেলেই প্রথমে যাওয়া যাক। তারপর ভেবে দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়। সুব্রত বললে, মমতাজ হোটেল। গাড়ি মমতাজ হোটেলের দিকে তীব্রগতিতে ছুটলো।

এতক্ষণে সুব্রত মেয়েটির দিকে তাকাল।

গাড়ির এক কোণে অত্যন্ত সংকোচে জড়সড় হয়ে মেয়েটি বসে আছে।

দরদভরা কণ্ঠে সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী খুকী ?

ওরা আমায় ক্ষেন্তী বলে ডাকে। কিন্তু আপনি ? আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, বাবু ? একরাশ উৎকণ্ঠা মেয়েটির কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ল।

আমি তোমাকে খুব ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। যেখানে কেউ আর তোমাকে কষ্ট দেবে না, কেউ মারবে না।

কিন্তু ওরা মানকে-গোবরা !

কোন ভয় নেই। তারা তোমার নাগাল পেলে ত' !

না—না, আমাকে সেখানে রেখে আসুন। আমি আপনার সঙ্গে যাবো না। না, যাবো না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ! কেটে গঙ্গায় ফেলে দেবে !

কেন তুমি ভয় করছো খুকী ! ওরা তোমাকে পেলে ত' ! ওরা টেরই পাবে না, কোথায় তুমি আছো ?

না—না, আপনি জানেন না ওদের, ওরা সব পারে ! ওরা আমাকে আবার খুঁজে বের করবেই ! সর্দারকে আপনি চেনেন না !

দেখলে না, তাদের আমি ঘরে বন্ধ করে রেখে এলাম। এতক্ষণে তাদের জেলে ধরে নিয়ে গেছে আমার লোকেরা। তারা সব জেলে বন্ধ হয়ে থাকবে, কেমন করে তারা তোমাকে খুঁজে পাবে ?

না—না, তারা ধরা পড়বে না। সর্দারকে কেউ কোনদিন ধরতে পারেনি। কতবার সে জেলে গেছে, আবার সে পালিয়ে এসেছে যেন কেমন করে। সর্দার বলে, জেলে তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না !

সুব্রত নানাভাবে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। এমন সময় গাড়ি এসে মমতাজ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

boiRboi.net

সুব্রত মেয়েটির হাত ধরে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ চোদ্দ ॥

মেয়েটি সুব্রতর দরদপূর্ণ সাদর ব্যবহারে বিস্ময়ে একেবারে হকচকিয়ে গেছে। এ শুধু অজানিতই নয়, অভাবিতও।

সে ত' কোনদিনই কারো কাছে এতখানি মধুর ব্যবহার পায়নি। তার শিশুচিত্তের ব্যথা-বেদনাতে কেউই ত' দরদের সোনার কাঠি ছোঁয়ায়নি!

সেদিন থেকে তার সামান্য জ্ঞান হয়েছে ও পেয়ে এসেছে শুধু নিষ্ঠুর কঠিন ব্যবহার। পেয়েছে শুধু উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে তিরস্কার আর তিরস্কার। নিত্য প্রহার আর শত লাঞ্ছনার অশ্রুজলে তার প্রতিটি দিন রাত্রির কাব্যখানি ভরা।

তার অন্ধকারময় জীবনযাত্রা-পথে কেউ ত' মণিদীপ জেলে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোয়নি।

তাই ত' আজ সুব্রতর ব্যবহারে ওর সদা-শংকিত শিশুচিত্ত বিস্ময়ে কেমন আত্মহারা হয়ে গেছে।

ঐ চেয়ারটায় বসো খুকী।

মেয়েটি কিন্তু চেয়ারে বসল না। তার মলিন ছিন্ন বেশভূষার দৈন্য যেন এই সুখ-ঐশ্বর্যের মণিকোঠায় তাকে আরো বেশি কুণ্ঠিত করে ফেলেছে। সে নীরবে মাথা হেলিয়ে বসতে অস্বীকার করে বললে, আমার নাম ক্ষেন্তী। ওরা মাঝে মাঝে আমাকে পেত্নী বলেও ডাকত। সুব্রত এবারে হাত ধরে এনে মেয়েটিকে একখানা সোফার 'পরে বসিয়ে দিল।

মেয়েটি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে বসল। কুণ্ঠাতে যেন তার রুগ্ন দেহখানি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়। চিরকাল সে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

রাত্রে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেতে আরশুলা ও ইঁদুরের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে একটা ছেঁড়া চটের 'পরে শুয়ে শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছে।

এই বিলাস-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তার স্বপ্নেরও অগোচরে ছিল চিরদিন। চোখের কোল দু'টি তার অকারণেই যেন জলে ভরে আসতে চায়।

কেন যেন খালি কান্না পাচ্ছে। একটা অহেতুক ভয়, একটা অজানিত আশংকা যেন তার সমগ্র শিশুচিত্তখানি সন্দেহের দোলায় দোলাচ্ছে।

boiRboi.net

কী করবে ও। উঠে পালিয়ে যাবে?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না ত' ও? যেমন করে মাঝে মাঝে রাত্রে সেই ছেঁড়া ময়লা চটের'পরে একা একা শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছে: কী সুন্দর তার চেহারা! লালপেড়ে শাড়ি পরা। মাথায় ঘোমটা। ঘোমটার আড়ালে মমতা-ভরা দু'টি চোখের সকরুণ চাউনি। ধীরে ধীরে তিনি এসে ওর শয্যার পাশটিতে বসেছেন। তাঁর নরম ঠাণ্ডা হাতখানি ওর আতপ্ত কপালের'পরে গভীর স্নেহে ন্যস্ত করেছেন।...মা! মাগো! তোমায় যে কেবলি মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে মা! কেবলই আসো তুমি ঘুমের ঘোরে। জেগে উঠলে কেন তোমাকে দেখতে পাই না! কেন পাই না তোমাকে খুঁজে? কোথায় তুমি লুকিয়ে থাকো? কোন্ রহস্যের পরপারে! কোন্ স্বপ্নের সোনার পালঙ্কে থাক তুমি ঘুমিয়ে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ঐ দুর্দান্ত লোকগুলোর কথা। তাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার। তাদের গালাগালি, তাদের চীৎকার। মার খেয়ে খেয়ে ওর সমস্ত দেহ ব্যথা হয়ে গেছে। শিউরে উঠে ও চোখ বুজে ফেলল। ও যেন শুনতে পাচ্ছে তারা চীৎকার করে বলছে, ক্ষেন্তী হারামজাদী, আজ তোকে মেরে খুন করবো!

সুব্রত কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল।

বেয়ারা এসে সেলাম দাঁড়াল।

দু'জনের খাবার নিয়ে এসে। কী খাবে তুমি খুকী?

মেয়েটি কাতর দৃষ্টি তুলে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

কী খাবে? রসগোল্লা? সন্দেশ?

রসগোল্লা, সেটা কী? মেয়েটা বোকার মতই যেন প্রশ্ন করলে।

সুব্রত বেয়ারাকে দোকান থেকে কিছু ভালভাল খাবার আনতে বললে। আরো বললে ঘণ্টাখানেক বাদে ম্যানেজারকে ডেকে দিতে।

বেয়ারা সেলাম দিয়ে চলে গেল।

শোন খুকী, ক্ষেন্তী ছাড়া তোমার আর কোন নাম নেই?

মেয়েটি সুব্রতর প্রশ্নে আবার মুখ তুলে তাকাল। অনেকদিন আগে আমার একটা পুরাতন নাম ছিল।

কী নাম তোমার মনে নেই?

আছে। বাবলু।

বাবলু! বাঃ কী সুন্দর নাম!

কিন্তু ওরা ত' আমাকে ও নামে ডাকত না। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বললে।

তা' হোক, এখন থেকে তোমাকে সবাই ও নামেই ডাকবে।

boiRboi.net

কেউ আমাকে ও নামে ডাকে না, ও নামটা আমি ভুলেই গেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, কে যেন ঐ নামে চুপি চুপি কেবলই ডাকছে। বাবলু, সোনামণি! মেয়েটির চোখের কোল দু'টি ছলছলিয়ে এলো।

কতদিন তুমি ওদের ওখানে আছো, বাবলু? মনে পড়ে তোমার?

না। তা' অনেক দিন! অনেকদিন আগে একদিন আমার মনে পড়ে আমি ঘুমিয়েছিলাম মার কাছে। জেগে উঠে দেখি ওদের বাসায় আমি কখন এসে গেছি। কত কাঁদলাম মা মা করে, কিন্তু মা আর এলো না, আর মাকে খুঁজে পেলাম না। ওই মোটা লোকটা যে আমাকে মার ছিল না ওর নাম 'অবু' সর্দার, ওকে 'অবু' বলে ডাকে। অবু বললেঃ আমি একটা পেত্নী, পেত্নীর মা থাকে না! আমার মা কোনদিনই ছিল না।

অবু মিথ্যা কথা বলেছে বাবলু। তোমার মা নিশ্চয়ই আছেন। আমরা তাঁকে খুঁজে বের করবো। তুমি কিছু ভেব না। কেমন?

সহসা বাবলুর মলিন মুখখানা যেন একটু আনন্দের খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, সত্যি পাবেন? সত্যি আমার স্বপ্নের মাকে খুঁজে দেবেন? আপনাকে তাহলে আমি খুব ভালবাসব। আপনার সব কথা শুনবো। আপনার সব কাজ করে দেবো।

না, বাবলু। আমার জন্য তোমায় কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে ভালবেসো। আমি তোমার মাকে নিশ্চয়ই খুঁজে দেবো। কিন্তু যখন তুমি তোমার মাকে পাবে, আমাকে ভুলে যাবে না ত'?

আপনাকে ভুলে যাবো? না, কোনদিনও না। আপনি এত ভাল! আপনাকে আমি কি বলে ডাকব, বাবু?

জান বাবলু, আমার ছোট বোন নেই। তুমি আমার বোন হবে? আমাকে দাদা বলে ডাকবে?

হ্যাঁ, আপনি আমার দাদা।

দাদাকে তুমি ভাল বাসবে ত' বাবলু?

হ্যাঁ, খুব ভাল বাসবো।

জান বাবলু, আমার মা নেই?

আহা, আপনার নিশ্চয়ই তাহলে আমার মতই কষ্ট!

হ্যাঁ কিন্তু আমার নিজের মা না থাকলেও, আর একজন মা আছেন।

এমন সময় বেয়ারা ট্রেতে করে নানা প্রকারের লোভনীয় খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

boiRboi.net

বাবলু! তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি ত' কিছু খাওনি। এস দু'জন খাওয়া যাক্।

সুব্রতর কথায় বাবলু যেন সহসা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে উঠলো, না না, আমার এখন ক্ষিদে পায়নি দাদা? তাছাড়া রোজ রাত্রে ত' আমি খেতাম না। আপনি খান দাদা।

তা' কি হয় ভাই, এসো, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে খাবো।

সুব্রত সস্নেহে বাবলুকে নিজের পাশে সোফার 'পরে এনে বসাল। আমার কাপড়-জামা ময়লা, দাদা। আপনার সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তুমি কিছু ভেব না বাবলু! আমার অনেক আছে। এসো এখন খাওয়া যাক্।

সুব্রত একটা রসগোল্লা বাবলুর ত্রস্ত কুণ্ঠিত হাতখানার 'পরে তুলে দিল। নাও, খাও। ধীরে ধীরে অতি সংকোচের সঙ্গে বাবলু খেতে শুরু করে।

কেমন লাগছে খেতে বাবলু?

খুব ভাল!

সুব্রত ধীরে ধীরে বাবলুর সংকুচিত ভীত শিশুচিত্তকে নিজের সস্নেহ ব্যবহারে নিজের দিকে টেনে নিতে লাগল। একটু একটু করে তার মনের বিশ্বাস আনতে লাগল। সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বাবলু শিশুচিত্তের মধ্যে এমন একটা সংকোচ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে যেটা দূরীভূত করতে সময়ের প্রয়োজন। আজ তার কাছ থেকেও যা ব্যবহার পাচ্ছে, এ শুধু ভর করে, অসম্ভবই নয়, অভাবিত। স্নেহ ও দরদ দিয়ে ওর শিশুচিত্তকে জয় করতে হবে। অল্পে অল্পে বাবলু যে তার স্নেহের সিঞ্চনে পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

খাওয়া হয়ে গেল। সুব্রত বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে ও দেখে বাবলু সযত্নে উচ্ছিষ্ট প্লেটগুলো নিয়ে বাথরুমের দিকে চলেছে।

ওকি! বাবলু ও-সব এঁটো প্লেট নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

এগুলো ধুতে হবে না দাদা। ধুতে নিয়ে যাচ্ছি!

ছি! ছি! ওসব নোংরা কাজ তোমার না, রেখে দাও, রেখে দাও, এখুনি বেয়ারা এসে নিয়ে যাবে।

ভয়চকিত দৃষ্টিতে বাবলু সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, কেন দাদা? আপনি কি আমার উপরে কোন রাগ করছেন? ওদের ওখানে সব বাসনপত্র ত' আমিই ধুয়ে রাখতাম। তাড়াতাড়ি না ধুলে তারা মারত। তবু খেতে দিত না আমাকে।

বাবলুর কথা শুনে সুব্রতর চোখে জল এসে যায়, সে কোনমতে অশ্রু গোপন

boiRboi.net

করে মৃদু সস্নেহে কণ্ঠে বললে, না ভাই, এখন ত' আর তুমি তাদের ওখানে নেই। আমার এখানে ওসব নোংরা কাজ একেবারেই করতে হবে না। রেখে দাও এগুলো নাবিয়ে। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। বাবলু একবার কাতর দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল ট্রেটা আবার মাটিতে নামিয়ে রেখে।

সুব্রত এসে আবার সোফায় বসে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো।

এই মেয়েটি কে? কার মেয়ে? কেমন করে মেয়েটি ঐ গুণ্ডার দলে জড়িয়ে গেল? মেয়েটির আসল পরিচয় কী? কোথায় বাড়ি? নানাচিন্তা একসঙ্গে ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

হঠাৎ একটা কথা ওর মাথার বিদ্যুৎ-চমকের মত এসে উদয় হয়। অদ্ভুত চিঠিটার অনুসন্ধান করতে লোকগুলো তার ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিল এবং তাদেরই অনুসরণ করতে ও শেষ পর্যন্ত ঐ গুণ্ডার দলে গিয়ে পড়ে। সেইখানেই আশ্চর্য-ভাবে মেয়েটিকে পাওয়া গেল। তবে কি মিঃ সরকারের হত্যার সঙ্গে মেয়েটির জীবনের কোন সূত্র পাক খেয়ে আছে?

প্রথম থেকে আগাগোড়া ব্যাপারটা সমালোচনা করলে স্পষ্টই এখন বোঝা যায় মিঃ সরকারের মৃত্যুর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা জটিল রহস্য পাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা যতখানি ও সহজ ভেবেছিল ঠিক ততখানি সহজ ত' নয়ই, বরং বেশ কিছু গোলমালে, জটিল!

পরপর দু'টোদিন ও নানাভাবে এতো ব্যস্ত রয়েছে যে কিরীটীর সঙ্গে গিয়ে বর্তমান 'কেস'টা সম্পর্কে যে একটা খোলাখুলি আলোচনা করবে তার সময় পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর যে চারজন লোককে ও সেই বাড়িতে বন্দী করে পুলিশের হেফাজতে তুলে দিয়ে এসেছে, কাল সর্বাগ্রে তাদের নাড়াচাড়া করে দেখতে হবে। হয়তো বা সেদিক থেকেও কোন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তার সন্দেহ যদি সত্যই অমূলক হয়, তবে সর্বাগ্রে যেমন করেই হোক বাবলুকে একটি বিশেষ নিরাপদ স্থানে রেখে আসা দরকার। কিন্তু কোথায় সে বাবলুকে রাখতে পারে? হোটেল ত' সে বর্তমানে ছেড়েই দেবে। কেন না গত রাত্রের ব্যাপারে ও স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে হোটেলের ম্যানেজারকে ওরা হাত করেছে। ম্যানেজারকে আর বিশ্বাস করা চলে না। নিজের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে যাবে? বাড়িতে এক রাজুর মা। বাকী সব বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকে। গুণ্ডার দলের কিছুই অসাধ্য নেই। মেয়েটিকে সত্যিই যদি তাদের প্রয়োজন থাকে, তবে যে কোন সময় চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। কিরীটীর

boiRboi.net

ওখানে রাখবে? না, তাও সম্ভব নয়। তবে কোথায় রাখা যেতে পারে? কোথায় মেয়েটি নিরাপদে থাকবে? হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। নিশীথের বোন অমিয়াদি শ্যামবাজারে থাকেন। তাঁরও দু'টি তিনটি ছেলেমেয়ে আছে ঠিক। অমিয়াদির বাসাতেই আপাতত এখন বাবলুকে কিছুদিন রাখাই সর্বাপেক্ষা যুক্তি সংগত মনে হয়। তাছাড়া বাবলুকে যদি অমিয়াদির বাসাতেই রাখা যায়, তবে গুণ্ডার দল হয়তো ওর সন্ধান সহজে নাও পেতে পারে। সুব্রতর আড্ডাগুলো ত' ওদের জান থাকাই বেশী সম্ভব। বাবলুকে অমিয়াদির ওখানে কিছুদিন রাখতে হবে।

চিন্তার স্রোতে সুব্রত ভেসে চলেছিল। বাবলুর কথা ওর মনেই ছিল না। হঠাৎ চোখ মেলে চাইতেই দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে বাবলু ভীরু দৃষ্টি মেলে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

সুব্রত ব্যস্ত হয়ে উঠল। একি বাবলু, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোস।

আপনি ত' আমাকে বসতে বলেননি দাদা।

বোস, বোস—

বাবলু এবার সোফাটায় বসল সংকুচিতভাবে।

॥ পনের ॥

শোন বাবলু, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। যতটা তুমি জান, সব জবাব তুমি আমাকে দেবে, কেমন?

বলুন।

আচ্ছা বাবলু, তোমার মনে পড়ে, কতদিন তুমি ওদের সঙ্গে আছো?

কার, অবুর কাছে?

হাঁ।

অনেক দিন। ঠিক কতদিন তা আমার মনে নেই দাদা। তবে অনেক দিন।

আচ্ছা, ঐ যে ঢ্যাংগা লম্বা লোকটা যার গায়ে তুমি রাত্রে চা ফেলে দিয়েছিল, তার নাম কী জান?

ওকে সবাই সর্দার বলে ডাকে। তবে মাঝে মাঝে 'সিংহ' যখন আসত, ওকে 'বঙ্কা' বলে ডাকতে দু'একবার শুনেছিলাম।

সিংহ! সে আবার কে?

সিংহ, তাকে আপনি চেনেন না? সবাই তাকে খুব ভয় করে। জানেন, সর্দারও তাকে ভয় করে। সিংহ ত কারো সঙ্গে কথা বলে না। যখন সকলে

boiRboi.net

বাড়ি থেকে চলে যায়, অনেক রাত্রে সিংহ তখন আসে। তখন কেউ বাড়িতে থাকে না। আমি দু'দিন লুকিয়ে লুকিয়ে সিংহকে দেখেছি। আমি নীচের যে ঘরটাতে থাকতাম, রাত্রে সিংহ তার পাশের ছোট ঘরটায় এসে সর্দারের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলতো।

বাবলুর কথা শুনে সুব্রতর কৌতূহল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে গভীর আগ্রহে বাবলুর কথা শুনতে লাগলো।

তুমি সিংহকে দেখেছো বাবলু? সে কেমন দেখতে? আবার দেখলে তাকে তুমি চিনতে পারবে?

না। যে দু'বার তাকে দেখেছি, তার মুখে একটা কালো রংয়ের মুখোস ছিল। লোকটা দেখতে কিন্তু জোয়ান আর খুব লম্বা।

তাদের কথাবার্তা কিছু তোমার মনে আছে বাবলু?

সব কথা ত ওদের শুনতে পারিনি। সর্দারকে আমার বড্ড ভয় করে। একদিন শুধু···

হঠাৎ বাবলু যেন সন্ত্রস্তভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

কি থামলে কেন? বল কী শুনেছিলে? বল।

আপনি কাউকে বলে দেবেন না তো দাদা? সর্দার শুনতে পেলে কিন্তু ঠিক আমাকে মেরে ফেলবে। কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

তোমার কোন ভয় নেই ভাই। তুমি বল। কাউকে আমি বলবো না। তাছাড়া, তোমাকে এমন জায়গায় আমি রেখে আসবো, কেউ তোমায় সন্ধান পাবে না।

কয়েকদিন আগে আমি আমার ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ পাশের ঘরে কথাবার্তার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি পা টিপেটিপে উঠে দুই ঘরের মাঝখানে যে জানালাটা বন্ধ থাকত, সেখানে গিয়ে কান পেতে দাঁড়ালাম। জানালাটার একটা কবাট ফাটা। সেই ফাটা দিয়ে পাশের ঘরের সব কিছু দেখা যেত। দেখলাম, ঘরের মধ্যে তিনজন আছে। সর্দার, সিংহ, আর একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে কোনদিনও আমি দেখিনি তাই চিনতে পারলাম না। তাছাড়া, ভদ্রলোক জানালার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। তাদের দু'একট কথা শুনে বুঝলাম, তারা আমার কথা নিয়েই আলোচনা করছে। শুনলাম, সিংহ ভদ্রলোকটিকে বলছে, তোমার কোন ভয় নেই। কেউ ও মেয়ের সন্ধান পাবে না। কেউ জানবে না যে, এইখানে এ বাড়িতে বংকার কাছে লুকানো আছে। কিন্তু টাকা ত্রিশ হাজার চাই। ভদ্রলোক তার উত্তরে বললেন, বেশ, ত্রিশ হাজারই পাবে। মেয়েটার কোন অযত্ন হচ্ছে না ত'? সর্দার বললে, আপনি

boiRboi.net

পাগল হয়েছেন। ভদ্রলোক বললেন, উঃ, ঐ মেয়েটাই আমার কাল।

তারপর?

তারপর তারা টাকা সম্পর্কে আরো কী বলাবলি করলে। তারপর সবাই চলে গেল।

ভদ্রলোকের নাম কিছু শোননি?

না।

সুব্রত এতক্ষণে বুঝলে, তার সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়! এই হতভাগ্য মেয়েটির জীবনের সঙ্গে একটা জটিল রহস্য জড়িয়ে আছে। এবং খুব সম্ভব সেই রহস্যের সঙ্গে হয়ত মিঃ সরকারের হত্যারও কোন যোগাযোগ আছে।

এমন সময় বন্ধ দরজার গায়ে 'নক্' শোনা গেল!

কে?

আমি ললতা প্রসাদ।

ভিতরে আসুন।

ললতা প্রসাদ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সুব্রতকে নমস্কার জানাল।

সুব্রত বললে, আপনাকে ডেকেছিলাম ম্যানেজার সাহেব। আমি কাল থেকে আপনার হোটেলের ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবো। আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, হঠাৎ ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবেন কেন মি রায়? কোনরকম অসুবিধা···

না, ধন্যবাদ। এখানে থাকার আর আমার দরকার নেই। তাই ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। নমস্কার।

অগত্যা ম্যানেজারকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে হল।

সুব্রত উঠে দরজাটায় খিল দিয়ে আবার সোফায় এসে বসল।

সুব্রত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে, রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা। এবারে শোওয়া দরকার। কাল সকালে অনেক কাজ। এখন কিছু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

বাবলু, তোমার ঘুম পায়নি?

না দাদা। আজ কেন যেন আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না। আপনার মত কেউ আগে আমার সঙ্গে এত ভাল করে কথা ত' বলেনি। কেউ ত' আগে আমাকে এত আদর করেনি, এত ভালবাসেনি!

তুমি যে আমার ছোট বোন। তোমাকে কি আমি ভাল না বেসে থাকতে পারি ভাই।

আমাকে আপনি কখনো বকবেন না, দাদা?

না। তুমি আমার লক্ষ্মী বোন। রাত্রি অনেক হল, এবার আমরা ঘুমাবো।

boiRboi.net

এই ঘরে ঐ বিছানায় তুমি শোও। আমি এই সোফাটার 'পরে শোবো।

না—না—দাদা, আপনি খাটের 'পরে বিছানাটায় শোন। আমি মাটিতেই ঐ পাশের ঘরে শোবো।

দূর পাগলী, তা কি হয়? মাটিতে কি কেউ শোয় নাকি! অসুখ করে, ঠাণ্ডা লাগে!

কেন দাদা, আমি ত' রোজ মাটিতেই শুতাম। কখনো আমার অসুখ করেনি। কখনো আমি খাটের বিছানায় শুইনি।

তবে আর কি, আজ প্রথম শোও। এবার থেকে ত' তুমি খাটেই শোবে। যাও, লক্ষ্মী মেয়ের মত এবার গিয়ে শুয়ে পড়।

তবু যেন বাবলুর সংকোচ যায় না। সে ইতঃস্তত করে।

কই যাও, শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। যাও।

আমার ময়লা কাপড়-জামা। আপনার সুন্দর বিছানা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে দাদা।

আরে পাগলী! তাতে কী হয়েছে। আবার ধোপার বাড়ি দিয়ে কাচিয়ে নিলেই হবে, যাও।

এবারে আর বাক্যব্যয় না করে ধীরে ধীরে বাবলু গিয়ে সুব্রতর শয্যায় শুয়ে পড়ল।

সুব্রত কিন্তু তখনও ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য চিন্তা। একটার পর একটা কেবলই যেন তার মাথার মধ্যে এসে জট পাকাচ্ছে।

একসময় সুব্রত ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে দিল।

ধীরে ধীরে সুব্রত শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল।

নিভাঁজ নিখুঁত পরিষ্কার শয্যার 'পরে বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারী একান্ত সংকোচের সঙ্গে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে।

নীল মৃদু আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে দুঃখ-তাপক্লিষ্ট অভাগা মেয়েটির মুখখানি। রুক্ষ মলিন চুলগুলি বিশ্রস্ত, এলোমেলোভাবে উপাধানের 'পরে বিক্ষিপ্ত।

ছিন্ন মলিন শাড়িখানি দিয়ে সর্বাংগ ঢেকে নিয়েছে।

ধীরে ধীরে গভীর স্নেহে সুব্রত তার হাতখানি বাবলুর কপালের 'পরে রাখল। আহা, বেচারী, কার স্নেহের দুলালী! ভাগ্যের স্রোতে বিড়ম্বিতা!

সুব্রতর চোখে জল এসে গেল।

boiRboi.net

॥ ষোল ॥

অনেক রাত্রে সুব্রত ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভাঙল যখন, প্রভাতের রৌদ্র খোলা জানালা পথে ঘরে এসে ঢুকেছে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, বাবলু সুব্রতর জুতো জোড়ায় একমনে কালি দিচ্ছে।

ওকি হচ্ছে, বাবলু?

দাদা আপনার জুতোটা ময়লা হয়ে গিয়েছিল। তাই পরিষ্কার করে রাখছি।

আরে পাগলী মেয়ে, থাক্ থাক্। তুমি এদিকে আমার কাছে এস ত'।

সসংকোচে বাবলু এসে সুব্রতর পাশটিতে দাঁড়াল। সুব্রত সস্নেহে হাত দিয়ে জড়িয়ে বাবলুকে আরো কাছে টেনে আনল। কাল রাত্রে খুব ঘুমিয়েছো, না বাবলু?

হ্যাঁ।

তোমার খিদে পায়নি? চা খাবে না?

চা ত' আমি খাই না, দাদা। তাছাড়া, সকালে কিছুই খাই না আমি।

কিন্তু এবার থেকে রোজ সকালে তোমাকে কিছু খেতে হবে।

বেশ। আপনি যখন বলবেন, খাবো।

সুব্রত কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে জলখাবার ও চা আনতে বলে বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল। প্রত্যহ ভোরে স্নান তার বহুদিনের অভ্যাস।

স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে সুব্রত ঘরে ঢুকে দেখল, রেডিওটার সামনে দাঁড়িয়ে বাবলু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যন্ত্রটার দিকে।

সুব্রত এগিয়ে এল। এটা কি জান, বাবলু?

না ত'!

এটা রেডিও, 'বেতার যন্ত্র'। এতে গান শোনা যায়। শুনবে গান?

আমি গান খুব ভালবাসি দাদা। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, রোজ রাত্রে না আমাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতেন। বাবলুর চোখ দু'টি ছলছলিয়ে এলো।

সুব্রত সুইচ টিপে রেডিওটা চালিয়ে দিল।

রেডিওতে কল্পনা গুপ্তার গান হচ্ছে, রবীন্দ্র-সংগীত।

বেয়ারা ট্রেতে করে চা ও খাবার নিয়ে এলো।

খেতে খেতে সুব্রত বললে, প্রথমে আমরা দোকানে যাবো বাবলু। সেখান থেকে তোমার জামা-কাপড় কিনে তারপর তোমাকে এক দিদির বাড়িতে নিয়ে যাবো। এখন কিছুদিন সেখানেই তুমি থাকবে। যতদিন না তোমার মাকে খুঁজে পাই। কেমন?

থাকবো।

boiRboi.net

বেয়ারা ডিস্ কাপগুলো নিয়ে এলো। সুব্রত ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিতে ও একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বললে।

কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, হাতে তাঁর বিল।

সুব্রত বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়ে বললে, দুপুরের দিকে আমার লোক এসে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে।

ম্যানেজার টাকা নিয়ে চলে গেল।

ট্যাক্সি হোটেলের নীচেই অপেক্ষা করছিল। সুব্রত বাবলুকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। কমলালয়ের সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে বাবলুকে সঙ্গে করে দোকানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল সে।

সুব্রত একজন সেলারকে ডেকে বলল, এর গায়ের মাপে বেশ ভাল ফ্রক ও জামা দিন। একে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে জামা পরিয়ে দিন। আরও তিন-চার সেট ভাল ভাল জামা-কাপড় দেবেন।

বাবলু যখন আবার সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। মলিন শতচ্ছিন্ন বেশভূষার দৈন্যে তার যে স্বাভাবিক রূপ ঢাকা পড়েছিল, এখন সুন্দর বেশভূষায় তা' যেন শতদলের মতই বিকশিত হয়ে উঠলো।

ফিকে নীল রংয়ের সুন্দর একখানা ফ্রক। পায়ে সাদা মোজা, সাদা জুতো, মাথায় লাল রিবন। বাবলু সলজ্জ কুণ্ঠিত হাসিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

সুব্রত বললে, বাঃ, এই ত আমাদের বাবলুরাণী! এইবার চল দিদির বাসায় যাই।

অন্যান্য কাপড়গুলি কাগজের বাক্সে দোকানদার সুব্রতর সামনে এনে রাখলে।

দাম মিটিয়ে দিয়ে সুব্রত বাবলুর হাত ধরে ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসল, চল শ্যামবাজার।

ট্যাক্সি শ্যামবাজারের দিকে ছুটে চলল।

* * * *

অমিয়াদির স্বামী ডাঃ অচিন্ত্য বোস কলকাতার মধ্যে একজন বিশেষ নামকরা ডাক্তার। শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্কের উত্তর কোণে ডাঃ বোসের আধুনিক কেতায় তৈরি কংক্রিটের ত্রিতল বাড়ি।

বাড়ির সামনের দিকে পার্ক। পিছনের দিকে একটা সরু রাস্তা। রাস্তার হাত পাঁচ-ছয়েকের মধ্যেই বেলগাছিয়া ক্যানেল বয়ে গেছে।

অমিয়াদির তিনটি মেয়ে, ছেলে নেই। প্রথম মেয়েটির বয়স দশ-এগারর মধ্যে,

boiRboi.net

নাম রাণু। রোগা লিক্‌লিকে চেহারা। প্রায়ই অসুখে ভোগে। দ্বিতীয়-তৃতীয় যথাক্রমে নয় বছর ও পাঁচ বছরের।

ডাঃ বোস অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা গোছের মানুষ। দিন ও রাত্রির প্রায় বেশিরভাগ সময়ই তাঁর কলে রুগীদের নিয়ে বাড়ির বাইরে বাইরেই কাটে।

বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী অমিয়াদি।

অমিয়াদিকে সুব্রতর খুবই ভাল লাগে। মোটাসোটা গড়ন। সমগ্র মুখখানি জুড়ে যেন একটা মাতৃত্বের প্রশান্তি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। অর্থশালী লোকের স্ত্রী হয়েও হাবভাব অত্যন্ত সাদাসিধে। চালচলনে, কথাবার্তায় এতটুকু বড়মানুষী ভাব নেই।

সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সিওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে বাবলুর হাত ধরে সোজা গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

বেলা তখন প্রায় ন'টা হবে। একধামা তরিতরকারী নিয়ে বঁটি পেতে অমিয়াদি থালার 'পরে সকলের রান্নার জন্য তরকারী কুটছেন। পরিধানে একখানা চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি। সদ্য স্নানের 'পর ভিজে চুলগুলি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বুকের 'পরে এলান। সামনেই বসে ছোট মেয়ে টুলটুল একটা হাসিখুশির বই নিয়ে পড়ছে—

ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে,
ঈগল পাখী পাছে ধরে।

সুব্রত এসে ডাকল, অমিয়াদি।

কে রে? ওমা, সুব্রত! কী খবর ভাই? কতদিন 'পরে এলে ভাই। সঙ্গে ওটি কে? সুন্দর মেয়েটি ত।

সামনেই একটা বেতের মোড়া ছিল। সেটার 'পরে বসতে বসতে সুব্রত বললে তোমার 'পরে একটা কাজের ভার দিতে এলাম অমিয়াদি। এই মেয়েটি আমার একটি বোন, বাবলু। বলতে বলতে সুব্রত সস্নেহে বাবলুকে হাতের বেড় দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিল।

টুলটুল ততক্ষণে পড়া থামিয়ে তার শিশুসুলভ কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাবলুর দিকে পিট্‌-পিট্‌ করে তাকাচ্ছে।

চা খেয়ে এসেছো ভাই?

খেয়ে এসেছি। কিন্তু আর এক কাপেও বাধা নেই।

অমিয়াদি ভৃত্য মাধবকে চা করে আনবার জন্য আদেশ দিলেন।

বেশ মেয়েটি। এসো তাহলে বাবলু। অমিয়াদি সস্নেহে বাবলুকে কাছে

boiRboi.net

ডেকে নিয়ে বললেন, ঠিক যেন প্রতিমার মত মুখখানি! কোথায় পেলে একে সুব্রত?

সুব্রত সংক্ষেপে বাবলুর সব কথা অমিয়াদিকে খুলে বললে। বাবলুর কাহিনী শুনতে শুনতে ততক্ষণে একান্ত স্নেহশীলা অমিয়াদির দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। দু'হাতে গভীর স্নেহে অমিয়াদি বাবলুকে বুকের 'পরে টেনে নিলেন, আহা, বাছারে!

সুব্রত বলল, ওর মাকে যতদিন না খুঁজে পাই, ততদিন ওকে আপনার কাছে রাখতে হবে, অমিয়াদি। আপনার বাড়িতে ওর সমবয়সী আছে। কোন কষ্ট হবে না বেচারার। আপনার কোন আপত্তি হবে না ত' দিদি?

আপত্তি! তুমি কি যে বল সুব্রত! যতদিন খুশি ও আমার বাড়িতে থাকুক।

সহসা সুব্রত ও অমিয়াদি দু'জনেই লক্ষ্য করলেন, মেয়েটি অমিয়াদির বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

অমিয়াদি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি হলো মা, কাঁদছো কেন?

বাবলু অশ্রুসজল মুখখানি সুব্রতর মুখের 'পরে তুলে ধরে বলল, দাদা আপনারা এত ভাল। আপনারা আমাকে এত ভালবাসেন!...আমি জানি, আবার আমাকে 'অবু'র হাতে যেতে হবে। কেন যেন কেবলই আমার মনে হচ্ছে, এসব সত্যি নয়, এ আমি স্বপ্ন দেখছি! আমি শুনতে পাচ্ছি কেবলই 'অবু' আমাকে ডাকছে। আমাকে সে একবার পেলে আর রক্ষে রাখবে না। খুব মারবে, কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

অমিয়াদি গভীর স্নেহে বাবলুর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, না, না বাবলু। তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তোমাকে আর আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

ভৃত্য এমন সময় ডিসে করে কিছু ভাল খাবার ও চা নিয়ে এসে সামনে রাখল।

অমিয়াদি বাবলুকে কোলে বসিয়ে ডিস থেকে একটা রসগোল্লা তার হাতে তুলে দিলেন।

আমি সকালবেলা অনেক খেয়েছি দাদার সঙ্গে। এখন আর খাবো না।

তাতে কী হয়েছে? লক্ষ্মী মেয়ে, আর একটা খাও।

বাবলু রসগোল্লাটা মুখে পুরে দিল।

তুমি আমার কাছে থাকবে ত' বাবলু? কাঁদবে না? অমিয়াদি জিজ্ঞেস করলেন।

থাকবো। কাঁদবো কেন? আপনারা আমাকে কত ভালবাসেন। আমাকে কেউ কোনদিন এত ভাল বাসেনি।

তারপর তোমার মাকে যখন তোমার দাদা খুঁজে দেবেন, তখন তুমি তাঁর কাছে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ত'?

boiRboi.net

না, আপনাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আপনাদের কাছে চিরকালই আমি থাকবো। আপনারা আমাকে আর অবুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন না ত' ?

না না, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে।

আপনাকে আমার কি বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে জানেন ? বাবলু অমিয়াদির বুকে মাথা গুঁজে মৃদুস্বরে বললে।

কী ?

মা ! আপনাকে আমি 'মা' বলে ডাকবো।

বেশ, আমাকে তুমি 'মা' বলেই ডেকো। আমি তোমার মা !

॥ সতের ॥

বাবলুকে অমিয়াদির বাসায় নিরাপদে রেখে সুব্রত চলে গেল।

স্নেহান্ধ জননীর প্রাণ মুহূর্তেই চিরদুঃখিনী মেয়েটিকে তাঁর হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে আপনার করে টেনে নিল।

টুলটুলের কাছে বাবলুর সংবাদ পেয়ে রাণু পড়া ফেলে বাবলুকে দেখতে এল।

একটু বেশি বয়সে রাণু হওয়ায়, মা বাপের স্নেহ সে একটু বেশি করেই পেয়েছিল।

তাছাড়া, ছোট বয়স থেকেই চিররুগ্না থাকায় অমিয়াদি তাঁর অন্য দু'টি সন্তানের চেয়ে রাণুকে বেশি ভালবাসতেন।

ক্রমে যখন আরো দুটি ছোট ছোট বোন এসে রাণুর মায়ের স্নেহের একাধিপত্যে ভাগ বসালে, রাণু সেটা মোটেই সুনজরে দেখেনি।

মা যদি কখনো তাঁর অন্য সন্তানদের কোলে নিয়ে আদর করতেন, রাণু সেটা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কান্নাকাটি বাধিয়ে দিত। বাধ্য হয়েই মাকে ফিরে রাণুর দিকেই নজর দিতে হত। এক কথায় রাণুর মনটা ছিল একটু বেশি রকম একলাসেঁড়ে ও হিংসুক প্রকৃতির।

তার মায়ের আদরে কেউ ভাগ বসাচ্ছে, এটা সে আদপেই সহ্য করতে পারত না।

মাও মেয়েকে বেশি কিছু বলতেন না। একে সে চিররুগ্না, তার উপর বিশেষ খেয়ালী।

সেই রাণু যখন টুলটুলের মুখে শুনলো, কে একজন উড়ে এসে তার কোল জুড়ে বসেছে, হিংসায় রাগে সে ফুলতে ফুলতে বই ছড়িয়ে ফেলে নীচে ছুটে এলো।

বাবলু তখন তার মায়ের কোলে বসে গল্প করছে।

দূর থেকে বাবলুকে তার মায়ের কোলে বসে থাকতে দেখে রাগে রাণু ফুলতে

boiRboi.net

লাগল। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললে, মা, ও কে ?

মা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

রাণুর চাইতে বাবলু অনেক বেশি সুন্দর দেখতে। হাজার অযত্ন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ হলেও, তার স্বাভাবিক একটা সৌন্দর্যের দ্যুতি ছিল, যা তাকে করে তুলেছিল রমণীয়তায় ঢল-ঢল! তার ওপর আবার সদ্য ক্রীত নতুন পোশাকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

রাণুর চেহারা রোগা লিক্‌লিকে। গায়ের রং কালো, মাথার চুল 'বব্‌' করে কাটা। তাছাড়া, তার সহজাত হিংসার প্রবৃত্তি তার মুখের সমস্ত শিশুসুলভ কমনীয়তাটুকু যেন নিঃশেষে শুষে নিয়ে তাকে করে তুলেছিল রুক্ষ ও কঠিন।

মানুষের মনটাই হচ্ছে তার আসল রূপ। সেই আসল রূপ যার যেমন, বাইরের চেহারায়, বিশেষ করে মুখের ভাবে, সেইটাই ফুটে উঠে।

মেয়ের চিৎকারে মা মুহূর্তে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে বুঝে নিলেন মেয়ের চিৎকারের কারণটা কী ?

তিনি সস্নেহে রাণুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আয় রাণু! এই দেখ, কেমন সুন্দর তোর একজন খেলার সাথী এসেছে। এর নাম বাবলু।

রাণু তীব্রদৃষ্টিতে একবার মার মুখের দিকে, পরক্ষণেই অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দুমদুম করে আবার তখুনি উপরে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

অমিয়াদি বললেন, পাগলী মেয়ে। ওর ধারণা, ওর মার স্নেহ ও ভালবাসা সবটুকু অন্যে ছিনিয়ে নিল। ওর ভাগে কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

* * * *

সন্ধ্যা হওয়ার আর তখন খুব বেশী দেরী নেই। বাবলু ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিল। বিলীয়মান সূর্যের অস্তরাগে আকাশ রাঙা হয়ে আছে। সামনের দেশবন্ধু পার্কে কত ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কার মৃদু স্পর্শে বাবলু চমকে ফিরে তাকাল। দেখল, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রাণু।

চোখের দৃষ্টিতে যেন ফুটে উঠেছে তার একটা ঘোর বিতৃষ্ণার ভাব।

একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ ও হিংসা যেন আগুনের শিখার মতই তার সমগ্র মুখখানিতে ব্যেপে আছে।

বাবলু সহসা যেন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে ছাদের প্রাচীর ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। রাণু তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাবলুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর

boiRboi.net

বললে, তোমার নাম বাবলু ?

হ্যাঁ। ঢোক গিলে কোনমতে বাবলু সভয়ে শব্দটা উচ্চারণ করলে।

তুমিই বুঝি আমার জায়গা দখল করতে এসেছো! আমার মার ভালবাসার ভাগীদার হতে এসেছো!

না, না। তুমি ভুল বুঝছো রাণু। আ—আমি, আমি…

থাম্। চুপ কর রাক্ষসী? আমি জানি, কেন তুই এসেছিস্? কিন্তু শোন বাবলু, তা হবে না। কখনোই তা হতে দেব না আমি। তোর মা থাকে ভাল, তারই কাছে চলে যাবি। আর না থাকে তো যেখানে খুশী তুই চলে যা। এখানে তোর থাকা হবে না। শুনতে পাচ্ছিস কালামুখী, পেত্নী! এ বাড়িতে তোর থাকা হবে না। আর যদি তুই আমার কথা না শুনিস, তবে তোকে খুন করে ফেলবো। আমার মাকে তুই ভালবাসতে পারবি নে! পারবি নে!

বলতে বলতে ঝড়ের মতই এক প্রকার দৌড়ে রাণু নীচে নেমে গেল। আর বাবলু! তার দুই চোখের কোল বেয়ে তখন দরদর ধারায় অশ্রু নেমে এসেছে। সহসা সে ছাদের ওপরে লুটিয়ে পড়লো।

কেন? কেন তাকে দাদা এখানে রেখে গেল? সে এখন কী করবে?

ক্রমে একটু একটু করে রাত্রি ঘনিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু বাবলুর কান্না যেন আর শেষই হয় না। অভিমানে ব্যথায় তার ছোট্ট কচি বুকখানা যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাথার উপরে কালো আকাশটার বুক তারাগুলো সোনার প্রদীপের মত পিট্‌পিট্ করে জ্বলছে। মা গো কোথায় তুমি? কোন দূর দেশে? ঐ আকাশের তারাগুলোর মাঝখানে কি তুমি লুকিয়ে আছো মা মণি! এত তোমাকে ডাকি, সাড়া দাও না কেন? তোমার বাবলু যে এত তোমাকে ডাকছে তা কি শুনতে পাও না মা মণি!

কাঁদতে কাঁদতে কখন একসময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কার মৃদু সস্নেহ স্পর্শ ও চোখ মেলে তাকাল। চোখের কোলে এখনো তার অশ্রুর ভিজা আভাস।

বাবলু! বাবলু সোনা? এখানে এমনি করে ঘুমিয়ে কেন, মা! অমিয়াদি বাবলুকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

বাবলু অমিয়াদিকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—মা!

কি হয়েছে সোনা? কাঁদছো কেন? চল খাবে চল। আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ?

boiboi.net

॥ আঠারো ॥

বাবলুকে অমিয়াদির কাছে রেখে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই সুব্রত এসে ট্যাক্সীতে উঠে বসল এবং ট্যাক্সীওয়ালাকে লালবাজার থানার দিকে গাড়ি ছোটাতে বললে। থানায় এসে যখন ও পৌঁছাল বেলা তখন প্রায় এগারটা। নিজের বসবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই তালুকদারকে ডেকে পাঠাল। একটু পরেই তালুকদার এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এই যে তালুকদার। কালকের সেই আসামীরা ধরা পড়ে ছিল ত?

হ্যাঁ, তারা চারজনেই হাজত ঘরে বন্দী আছে।

তাদের এই ঘরে আনাও ত। লোকগুলোকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।

তালুকদার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একজন সার্জেণ্টকে আসামীদের সুব্রতর ঘরে হাজির করতে বলে এলো।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দু'জন পুলিশ আসামী চারজনকে নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

সুব্রত তখন কী একটা কাগজের 'পরে কী যেন লিখছিল। কলমটা টেবিলের 'পরে একপাশে নামিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকাতেই বিস্ময়ে সে যেন 'হা' হয়ে গেল। একি! এরা কে? এদের কোথা থেকে ধরে আনলে?

চারজন কুলীমজুর লোক, অতি মলিন ছিন্ন বসন পরিধানে।

তালুকদার বললে, কেন? এদেরই কাল ধরে আনা হয়েছে?

হেড কনেষ্টবল রমজান কোথায়? তাকে ডাক। সেই কাল সেখানে ছিল।

রমজানকে ডেকে আনা হল। রমজান বললে, এই চারজন লোককেই গতকাল রাত্রে চীৎপুরের বাড়িতে বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেছে। লোকগুলোকে নানাভাবে প্রশ্ন করেও সুব্রত কিছুই বুঝতে পারলে না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল সত্যিকারের আসল আসামীরা কোন গুপ্ত উপায়ে সরে গিয়ে প্রকাণ্ড চাল চেলেছে, সুব্রতকে জব্দ করবার জন্য। নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে কোথাও গুপ্ত-দ্বার ছিল, যার সাহায্যে তারা সরে পড়ে এই লোকগুলোকে তাদেব জায়গায় রেখে গেছে। উঃ, কী শয়তান! কী ধরিবাজ! কী জব্দই না করছে তাকে।

সুব্রত লোকগুলোকে আপাততঃ হাজতেই বন্দী করে রাখতে বললে। সার্জেণ্ট বন্দীদের নিয়ে চলে গেল।

কী করবে এখন সে? কোন্ পথ ধরে এগুবে।

আজই আর একবার সে-বাড়িটা গোপনে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে। বাড়িটার কোথায় কোন রহস্য গোপন হয়ে আছে, তার সব সন্ধান তাকে খুঁজে

boiRboi.net

বের করতেই হবে।

দ্বিপ্রহরের দিকে সুব্রত মিলের অফিসে সুবিমল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুবিমলবাবু তাঁর অফিস ঘরে বসে কতকগুলো কাগজ পত্র সই করছিলেন। সুব্রত ডোরস্ক্রিন ঠেলে অফিস ঘরে ঢুকতেই কাগজ পত্র থেকে মুখ না তুলেই বললেন, আসুন।

সুব্রত একখানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

একমিনিট। এই কাগজপত্রগুলো সই করে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলবো।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সুবিমলবাবুর কাজ শেষ হয়ে গেল। ঘন্টি বাজালেন। বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

বেয়ারার হাতে কাগজপত্রগুলো তুলে দিয়ে সুবিমলবাবু বললেন, এগুলো ডেস্প্যাচ ক্লার্ককে দিয়ে এস।

বেয়ারা কাগজপত্রগুলো নিয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

তারপর কী সংবাদ বলুন? আপনার তদন্ত কতদূর এগুলো?

এগুচ্ছে ধীরে ধীরে। মৃদুভাবে সুব্রত জবাব দিল।

কেস্টার একটা কিনারা হবে বলে আপনার মনে হয়, সুব্রতবাবু?

নিশ্চয়ই।

সেদিন আপনি সরকার বাড়ির সকলেরই জবানবন্দী নিয়ে ছিলেন সুব্রতবাবু?

হ্যাঁ।

সৌরীনকে কী রকম মনে হলো?

সাধারণ। একটু বেশী রকম নার্ভাস। দোষী বলে তাকে একটুকুও আমার সন্দেহ হয় না।

হয় না! কেন?

ক্ষমা করবেন, মিঃ চৌধুরী? কেন তা আপনাকে আমি বর্তমানে বলতে পারব না।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনি অন্য কাউকে দোষী বলে সন্দেহ করেন?

হয়ত তাই।

আমাকে কী?

এমন কথা আমি নিশ্চয়ই আপনাকে বলিনি, মিঃ চৌধুরী।

মিঃ চৌধুরী হঠাৎ হেসে ফেললেন, যাক্, কতকটা তবু নিশ্চিত হওয়া গেল। তারপর, এখন বলুন দেখি, হঠাৎ আমার কাছে আপনার কী বিশেষ প্রয়োজন হলো?

boiRboi.net

শুনুন মিঃ চৌধুরী। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই। আশা করি সোজাভাবেই জবাবগুলো দেবেন।

মৃদু হেসে মিঃ চৌধুরী বললেন, শোনাই যাক্!

শুনুন মিঃ চৌধুরী, সেদিন আপনার দেওয়া ঠিকানা মত আপনার আর্টিস্ট বন্ধু মিঃ সুবোধ দত্তর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম।

তাই নাকি? তারপর? বেশ লোকটি, না?

হ্যাঁ, বেশই বটে। তবে মনে হলো, গভীর জলের মাছ। সহজে ধরা দিতে চায় না।

হ্যাঁ, আর্টিস্ট মানুষ কিনা? একটু খেয়ালী চিরদিনই! তারপর কী সে বললে?

অনেক কিছুই বললেন—যাতে বেশ আশ্চর্যই হতে হয়েছে আমাকে। প্রথমেই ত' তিনি বললেন, তিনি জীবনে কোন দিনই আপনাকে ও ধরণের ডিপ্ ভায়োলেট কালি উপহার দেননি। জীবনে কোনদিনই তিনি চীনে যাননি।

এতে আশ্চর্য হচ্ছি না আমি এতটুকুও সুব্রতবাবু।

কেন? লোকটা ভয়ানক মিথ্যেবাদী না কী?

না, সে মিথ্যুক কি না তা আমি জানি না।

কিন্তু একথা আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না মিঃ চৌধুরী যে, আপনি বলেছিলেন সেদিন আপনারই জবানবন্দীতে, মিঃ দত্তই আপনাকে কালিটা দিয়েছিলেন।

সত্যি কথাই সেদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম, সুব্রতবাবু। সেদিন আপনাকে যখন ও কথাগুলো বলি, তখন সবকথা আপনাকে খুলে বলা প্রয়োজন মনে করিনি।

শুনতে পারি কি, কেন প্রয়োজন মনে করেন নি? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুব্রত সুবিমল-বাবুর মুখের দিকে তাকাল।

সুবিমলবাবু কিছুক্ষণ মৌন হয়ে বসে রইলেন। তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে বললেন, বলিনি তার কারণ, ব্যাপারটা অতি সামান্য। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে আপনার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। সুবোধের এক বন্ধু চীন থেকে কালিটা নিয়ে আসে এবং সে সুবোধকে কালিটা দেয়। তাকে ঐ কালিতে কয়েকটা জাপানী স্কেচ্ করে দেবার জন্য। সুবোধের সেই বন্ধুটি একজন খেয়ালী জমিদার। সুবোধ বন্ধুর প্রস্তাবে রাজী হয়। কিছুদিন বাদে তার প্রতি-শ্রুতি মত কয়েকখানা ছবি ঐ কালিতে এঁকে দেয়। সুবোধের বন্ধুর মতলব ছিল আলাদা। সে সেই ছবিগুলো চীনের কোন শিল্পীর কাছে চড়া দামে বিক্রি করে

এবং চীনের সেই শিল্পীটি আরো কতকগুলো ছবি চেয়ে পাঠায় সুবোধের বন্ধুর কাছে।

সুবোধ কিন্তু ব্যাপারটা কোন রকমে আগাগোড়া জানতে পারে। এইখানে একটা কথা আছে। একটা বেদনার্ত ইতিহাস। আসলে যার জন্য ব্যাপারটা আপনাকে বলিনি। কোন এক সময় সুবোধের ঐ জমিদার বন্ধুটি সুবোধকে অর্থ দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছিল। সুবোধরা দুটি ভাইবোন। ওর বোন নমিতার বয়স যখন পাঁচ ও ওর বয়েস আঠারো, ওদের মা-বাবা মারা যান। এক ঘণ্টার ব্যবধানে এসিয়াটিক কলেরায়। সুবোধের পিতা হারাধনবাবু কলকাতা কর্পোরেশনের সামান্য পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণী ছিলেন। কাজে কাজেই যা তিনি উপায় করতেন তা ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলাতো না।

পিতার মৃত্যুর পর সুবোধকে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ছোট বোনটির হাত ধরে পথের পরে এসে দাঁড়াতে হলো। কেন না, তার ধনী আত্মীয়-স্বজনরা সকলেই ওই হতভাগ্য পিতৃ-মাতৃহারা ভাইবোন দুটিকে এতটুকু কৃপাদৃষ্টি থেকেও বঞ্চিত করলেন।

দুটো বৎসর সুবোধ বহু কষ্টে বোনটিকে নিয়ে একটি খোলার ঘরে কাটায়। ঐ সময় সুবোধের ঐ ধনী জমিদার খেয়ালী বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ঐ ধনী বন্ধুটির সাহায্যেই সুবোধ আর্ট স্কুলে প্রবেশাধিকার পায়। ক্রমে নিজের সাধনার দ্বারা সুবোধ যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ওর বোন নমিতার খুব একটা বড় রকম অসুখ হয়। বোন একটু সুস্থ হলে, ও বোনকে নিয়ে শিমুলতলায় বেড়াতে যায়।

মাস তিনেক বাদে ও যখন বোনকে নিয়ে ফিরে এলো, দেখলাম, ওর বোনের সিঁথিতে সিন্দুর! কিন্তু শিমুলতলা থেকে ফেরা অবধি সুবোধ যেন কেমন হয়ে গেল। আমার সঙ্গে পর্যন্ত ও সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেললে।

কাণাঘুষায় একদিন সংবাদ পেলাম সুবোধের বোনের একটি মেয়ে হয়েছে হাসপাতালে। সেই মেয়েটির যখন বছর ছয়েক বয়েস, হঠাৎ মেয়েটিকে কারা চুরি করে নিয়ে গেল। সেই থেকে সুবোধ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। কারও সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলে না।

যাই হোক, ঐ সময় বছরখানেক সুবোধের অবস্থা আবার খুব খারাপ হয়ে যায়। আবার সুবোধের জমিদার বন্ধুটি এগিয়ে আসে এবং একটি গার্লস স্কুলে নমিতাকে চাকরি দেয়। আজও নমিতা সেই স্কুলেই চাকরী করছে। এখন ঐ সব কারণেই সুবোধ বন্ধুর ছবি বিক্রির কথা জেনেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়।

pathagar.net

আরো একটা মজার কথা। সুবোধের বন্ধুটি সুবোধের আঁকা ছবিগুলি নিজের নামে আঁকা বলে বিক্রী করেছিল। তাতে সুবোধ খুব বেশী মর্মাহত হয় এবং জগতে তার যত বন্ধু ছিল সকলের উপর চটে যায়। অথচ সেই বন্ধুটি যখন আবার ছবির জন্য বললে, ও ভেবে পেলে না যে কি করবে। একদিকে নিজের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অন্যদিকে বন্ধুর বন্ধুত্বের দাবীতে বিশ্বাসঘাতকতা—দুয়ে বাধল সংঘর্ষ!

এমন সময় হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে আমি যাই। কথায় কথায় ও বলে সুবিমল তুই কালিটা নিয়ে যা। তাকে বলবো, কালি ফুরিয়ে গেছে। তাই ছবি আঁকতে পারলাম না। আমি কালির শিশিটা নিয়ে আসি।

এরই দিন দুই পরে ওর বোনের চাকরীটা যায়। আমাদের অফিসে একজন লেডী ক্লার্কের পদ খালি ছিল। সুবোধের অবস্থা আমি জানি। তাই তাকে বলেছিলাম তার বোনকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিতে। তাতে সে ভয়ানক চটে উঠল, এবং বললে, আর বন্ধুদের পরামর্শ নয়। একজন বন্ধুত্বের মুখোস পরে এসে অভাগিনী বোনটিকে বিবাহ করে গা ঢাকা দিল। একটা মেয়ে ছিল। তবু বোনটার সান্ত্বনা, সেও চুরি গেল। তারপর আর এক ধনী বন্ধু আমার আঁকা ছবি নিজের নামে বিক্রী করল। আর বন্ধুদের সাহায্য আমি চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে!

তার ঐ অভদ্র ব্যবহারে আমি গেলাম চটে। দু'জনে রাগারাগি হল। আমি চলে এলাম। এ সব ব্যাপার ঘটছে আজ প্রায় মাস সাতেক আগে। ঐ ঘটনার পর আর আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ নেই! কেউ কারো সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলি না।

সুবিমলবাবু চুপ করলেন।

সুব্রত সুবিমলবাবুর কথা শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। একটা অন্ধকার রহস্যের যবনিকা যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। একটা সন্দেহ মনের কোণে জট-পাকানো ছিল। তবে কি বাবলুই সেই হারানো মেয়ে? তাই যদি হবে, তবে বাবলুর সঙ্গে মিঃ সরকারের খুনের সম্পর্ক কী?

হঠাৎ একটা আলোর রেখা যেন অন্ধকারের বুকখানাকে ঝলসে দিয়ে গেল। পেয়েছি, পেয়েছি!

এমন সময় সুবিমলবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, কী ভাবছেন সুব্রতবাবু?

ভাবছি আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, তবে কে চিঠিটা লিখল আমাকে?

তা যদি জানতাম তবে সে কথা সেদিনই আপনাকে আমি বলতাম, সুব্রতবাবু?

boiRboi.net

সুব্রত যখন সুবিমলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে চারটে। অফিসের সবে ছুটি হতে সুরু করেছে।

॥ উনিশ ॥

সুবিমলবাবুর ওখান থেকে অফিসে ফিরে আসতেই কতকগুলো কাজে সুব্রত দিন দুই এমনভাবে আটকা পড়ে গেল যে, কোনদিকে আর সে নজর দেবারও ফুরসৎ পেল না।

ইতিমধ্যে একবার সে কিরীটীকে ফোন করেছিল। শুনলে, কিরীটী কলকাতার বাইরে কোথায় গেছে দু'দিনের জন্য। অমিয়াদিকে বলাই ছিল, অন্ততপক্ষে সকালে ও রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দু'বার সুব্রতকে ফোন করে নিয়মিত ভাবে বাবলুর সংবাদ দেওয়ার জন্য। কেন না সুব্রতর একপ্রকার স্থির বিশ্বাসই ছিল, বিপক্ষ দল সহজে সুব্রতকে নিষ্কৃতি দেবে না। তাছাড়া মিঃ সরকারের খুনের ব্যাপারের সঙ্গে বাবলুর জীবন রহস্যের যোগাযোগ সত্যিই যদি তার সন্দেহমত থেকে থাকে, তবে তারা বাবলুকে সরাবার চেষ্টা করবেই।

এই সব নানা কারণে সুব্রত 'ইন্টেলিজেন্স্' বিভাগের দু'জন তরুণ যুবক শিশির ও সমরকে বাবলুর প্রহরায় নিযুক্ত করেছিল।

শিশির ও সমর দু'জনে পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র এক এক সময় এক একজন অমিয়াদির বাড়ির পাশে পাহারা দিত।

বাবলু এ বাড়িতে আসার তৃতীয় দিন বিকালের দিকে হঠাৎ এক সময় রাণু এসে বাবলুর সামনে দাঁড়াল। বাবলু দোতলায় রাস্তার উপরে ঝুলন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নীচের পার্কের ছেলে-মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলা দেখছিল।

রাণু মৃদুস্বরে এসে বললে, বাবলু! তুমি আমার ওপরে সেদিনের ব্যবহারে নিশ্চয়ই রাগ করেছো, না?

হঠাৎ রাণুকে এত কাছাকাছি দেখে বাবলু বেশ যেন একটু থতমতই খেয়ে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে ভীত কাতর দৃষ্টি মেলে রাণুর মুখের দিকে তাকাল।

আমার উপরে রাগ করো না বাবলু। চল, আমরা পার্কে বেড়িয়ে আসি। যাবে?

তার ভয়ে কোনমতে ঢোক গিলে বাবলু বললে, যাবো।

রাণুর পিছনে পিছনে বাবলু পার্কে বেড়াতে গেল। পার্কে খানিকটা ঘুরে এদিক

boiRboi.net

ওদিকে বেড়াবার পর রাণু এক সময় বাবলুকে বললে, খুব বেশি লোকজন এখন পার্কে, তাই এত গোলমাল। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে অনেক দিন আমি লুকিয়ে পার্কে বেড়াতে এসেছি। রাত্রে ঐ মোড়ে রামদিনের কুলপি মালাই পাওয়া যায়। খুব সুন্দর খেতে। আজ রাত্রে এসে খাওয়া যাবে'খন, কেমন?

বাবলু বললে, কিন্তু রাত্রে বাড়ি থেকে বের হলে মা যদি বকেন?

দূর, মা জানতে পারবে কেমন করে? লুকিয়ে আসবো না। বাবলু চুপ করে রইলো। কোন জবাব দিল না।

রাণুর বাবা ডাঃ বোস সাধারণত একটু বেশী রাত্রি করেই বাড়ি ফেরেন। কাজে কাজেই অমিয়াদির সমস্ত কাজ করে শুতে যেতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বেজে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রি নয়টার সময় রাণু এসে বাবলুকে বিছানা থেকে ডেকে তুলল। বাবলু আলাদা ঘরে একাই শুতো। রাণুর পাশেই। ঘুম ভেঙ্গে বাবলু রাণুর মুখের দিকে তাকাল। বারান্দার ঢাকনী দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির রশ্মিটা রাণুর মুখের উপরে এসে পড়েছে। চোখ দুটো যেন তার কী এক উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে। ও সভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

রাণু অধীর হয়ে বাবলুকে আবার ধাক্কা দিল। কই, চল, যাবে না? দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বাবলু উঠে বসল।

দু'জনে পা টিপে টিপে এসে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল।

চাপা গলায় বাবলু বললে, আমার বড্ড ভয় করছে রাণুদি! মা যদি বকেন?

চল। চল বোকা মেয়ে। মা জানতে পারবে কী করে? আমরা ত' একটু-ক্ষণ পরেই এসে আবার শুয়ে থাকবো। কেউ টের পাবে না।

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

আয়, দেরী করিস নে। ফিরতে আবার দেরী হয়ে যাবে।

দু'জনে এসে রাস্তার পারে দাঁড়াল।

অন্ধকার রাত্রি। তার উপর আবার ব্ল্যাক আউটের মহড়া। ঘেরা টোপে ঢাকা গ্যাসের ম্লান আলো রাস্তার পরে একটা যেন স্তিমিত আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

বাড়ির সামনেকায় অপ্রশস্ত জনহীন রাস্তাটা পার হয়ে রাণুর পিছু পিছু বাবলু এসে দেশবন্ধু পার্কের মধ্যে প্রবেশ করল।

পার্কটাও জনহীন। কেউ কোথাও নেই।

BanglaBook.org

ময়দানের মাঝখান দিয়ে লাল সুরকীর অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে দু'জনে এগিয়ে চলে। অদূরে একটা বেঞ্চির পরে বসে কে যেন গান গাইছে।

ও আমার নীলমণি!
তোর জ্বালায় আর পারিনে নীলমণি!
ও আমার কেলে সোনা,
তুমি পাড়ায় যেও না;
পাড়ায় গেলে ধূলো দেবে
গায়ে সবে না॥

কে গাইছে রাণুদি? বাবলু চলতে চলতে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল।

ও বিশু পাগ্‌লা। এই পাড়াতেই থাকে। চল, আবার থামলে কেন? ওই গেটের মুখে কুলপী বরফওয়ালা থাকে। তাড়াতাড়ি চল। দু'জনে এসে যখন ওদিককার গেটের সামনে দাঁড়াল, জায়গাটা খালি খালি, জনমনিষ্যিও সেখানে নেই।

কই, তোমার বরফওয়ালা, রাণুদি?

এখানে আজ নেই দেখছি। বোধহয় ওই রাস্তার মাথায় বসেছে। চল দেখি।

বাবলু বাধা দিল। না না, রাণুদি, আজ থাক। চল, আমরা বাড়িতে ফিরে যাই। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আর একদিন এসে মালাই খাবো। মা যদি আমাদের খোঁজেন, ব্যস্ত হবেন।

রাস্তার পাশের ঢাকনা দেওয়া গ্যাসের আলোর খানিকটা রশ্মি এসে রাণুর মুখের পরে পড়েছে। সহসা রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলুর মনের মধ্যে যেন একটা অজানিত আশঙ্কা শিউরে উঠলো। সমগ্র মুখখানার মধ্যে যেন একটা হিংসা কুটিল ভ্রূকুটি! চোখের তারা দু'টি কী এক উত্তেজনায় যেন জলজল করছে।

দু'জনে চোখাচোখি হতেই একটু পরেই রাণু মুখের পরে একটা হাসি টেনে আনলে। হাসতে হাসতে বললে, কী ভীতু মেয়ে তুই বাবলু। আয় আয়। দু'জনে আছি, ভয় কী। ওই ত রাস্তার মোড় দেখা যাচ্ছে। কতক্ষণই বা লাগবে। যাবো আর আসবো, চল।

সহসা বাবলু যেন বেঁকে দাঁড়াল। আবার রাণুর মুখের পরে একটু আগেকার হিংস্র কুটিল ভাবটা ফুটে উঠলো। চট্ করে এগিয়ে এসে সে বাবলুর একখানা হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলো এবং তীক্ষ্ণ রাগতস্বরে বললে, কী বললি পেত্নী, যাবিনে? তোকে যেতেই হবে। কোন কথা তোর আমি শুনবো না। না যদি যাস্ তবে তোকে খুন করে ফেলবো।

সে রাত্রে পাহারা দেবার কথা ছিল শিশিরের। বাবলু আর রাণু যখন বাড়ি

থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে নামে, শিশিরের সদা সতর্ক দৃষ্টি তারা এড়াতে পারেনি।

রাত্রি নয়টার সময় ওদের দু'জনকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখে ও বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ রাত্রে কেন ওরা বাড়ির বাইরে এলো! দূর থেকে আড়ালে আড়ালে থেকে শিশির ওদের দু'জনকে অনুসরণ করতে লাগল। ওদের দু'জনেরই অজ্ঞাতে এবং ওদের অনুসরণ করতে করতে ওদের দু' একটা কথা ওর কানে আসতেই ও আরো বেশী সতর্ক হয়ে গেল।

ও স্পষ্টই বুঝল, বাবলুর অনিচ্ছা সত্বেও রাণু তাকে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছে!

কিন্তু কেন? এতটুকু মেয়ে রাণু!

বাবলু কিন্তু সহসা রাণুর পরিবর্তনে চমকে গেল। রাণু যেন রাগে তখন ফুলছে। ও বলতে লাগল, পেত্নী, রাক্ষুসী। কেন তুই আমাদের বাসায় এলি? কেন মা তোকে ভালবাসবে? কোন তোকে আদর করবে? কেন তুই মরিস না! কেউ তোকে চায় না!

রাণুদি! রাণুদি! ওকথা বলো না। বোল না! আমি ত' তোমার কিছু করিনি ভাই! আমি তোমাকে কত ভালবাসি! বাবলু কেঁদে ফেলল।

ভালবাসিস্! কে তোকে ভালবাসতে বলেছে! কে চায় তোর ভালবাসা! তুই আর আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবি না! আর তোকে আমাদের বাড়িতে যেতে দেবো না! তুই যদি আবার আমাদের বাড়িতে যাস, তবে তুই ঘুমালে রাত্রে চুপি চুপি উঠে বাবার অপারেশনের ছুরি দিয়ে তোর গলা কেটে ফেলবো!

রাণুদি! রাণুদি! ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি! আমাকে মেরো না! আমি কোথায় যাবো!

তা আমি জানি না। তোর যেখানে খুশী তুই মরগে যা।

ঠিক এমনি সময় একটা কালো রঙের দ্রুতগামী সিডনবডি মোটর গাড়ি সহসা এসে ওদের সামনে ব্রেক কসে দাঁড়াল। গাড়িটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন লোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

শিশির ততক্ষণে চট্ করে বুঝে ফেলল, একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। আর অপেক্ষা করা নয়, সে চট করে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল!

সহসা অন্ধকার থেকে শিশিরকে ওদের সামনে আবির্ভূত হতে দেখে লোক দুটো চমকে ফিরে দাঁড়াল। একজন কর্কশ গলায় বললে, কে তুই? কী চাস্?

শিশিরও সমানে জবাব দিলে, তোরা কী চাস্?

boiRboi.net

সহসা এমন সময় দলের একজন এগিয়ে এসে শিশিরের নাকের পরে অতর্কিতে ঘুসি বসালে।

অতর্কিতে আঘাত পেয়ে শিশির ঘুরে পড়ল।

দলের অন্যজন ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, মানকে আর দেরী নয়, শিগ্‌গির ছুঁড়িকে গাড়িতে তোল।

শিশির কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়ে আবার এগিয়ে এসেছে।

তিনজনে মারামারি সুরু হয়ে গেল।

ঐ ফাঁকে বাবলু বললে, শিগ্‌গির পালিয়ে চল, রাণুদি ?

রাণু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, কোথায় যাবি তুই রাক্ষুসী ? আমি যাবো না !

বাবলু পালাতে চায়। রাণু তাকে জাপটে ধরলো, না তোকে যেতে দেব না।

এমন সময় আর একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে এলো।

বাবলু রাণুর ধৃত হাতখানা এক মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে অন্ধকারে অন্যদিকে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় রাণুকে কে যেন একটা ভারী চাদর দিয়ে ঢেকে ফেললে। রাণু হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু বৃথা। লোকটা রাণুকে চাদর সমেত পোঁটলার মত তুলে নিয়ে গাড়ির মধ্যে গিয়ে ফেলে দিয়ে দরজা আটকে দিল এবং চীৎকার করে বললে, মানকে, গোবরা শিগগীর আয়।

লোকটার চীৎকার শুনে মানকে গোবরা তাড়াতাড়ি শিশিরকে এক প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ছুটে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠে বসল। রাস্তার একটা ইটে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় শিশিরের মাথা তখন কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। সে উঠে যাবার আগেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাবলু হতচকিত হয়ে গিয়েছিল ! তারপর যখন দেখলে গাড়িটা চলে গেল, ও পায়ে পায়ে শিশিরের কাছে এসে দাঁড়াল। শিশির এক হাতে মাথাটা চেপে ধরে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললে, কে ?

আমি বাবলু !

বাবলু ! শিশির চকিতে উঠে দাঁড়াল, তবে তোমাকে ওরা নিতে পারে নি !

একটু একটু করে তখন বাবলুর মনে সাহস ফিরে আসছে। সে শিশিরের কাছে আরো একটু এগিয়ে এলো, কিন্তু ওরা যে রাণুদিকে নিয়ে গেল। কী হবে ? আপনি কে ?

আমার নাম শিশির ! চল এখনি তোমাদের বাড়িতে যাই। সুব্রতবাবুকে ফোন করতে হবে !

বাবলুর সঙ্গে শিশির যখন ডাঃ বোসের বাড়িতে এসে প্রবেশ করল, ঠিক তখনই

BoiRboi.net

ডাঃ বোসও ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামছেন। বাবলু ও শিশির গিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই, ডাঃ বোসও তাদের পিছু পিছু এসে বাইরের ঘরে প্রবেশ করলেন, কে আপনি? কাকে চান? একি বাবলু! এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?

শিশির তখন সংক্ষেপে আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটি ডাঃ বোসকে বলে বললে, আমি এখুনি সুব্রতবাবুকে ফোন করতে চাই। আপনার ফোন কোথায়?

ডাঃ বোস শিশিরের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে যেন হতবাক্ হয়ে গেছেন। কোন মতে হাত তুলে ঘরের কোণে ফোনটা দেখিয়ে দেন।

ওদিকে সুব্রত শিশিরের মুখে ফোনে সংবাদ পেয়ে অতি মাত্রায় চঞ্চল হয়ে বললে, আমি এখনি আসছি। তুমি অপেক্ষা করো।

বাড়ির মধ্যে সংবাদ পৌছাল। হন্ত-দন্ত হয়ে অমিয়াদি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। এসব কি শুনছি। রাণুকে নাকি তারা ধরে নিয়ে গেছে?

ডাঃ বোস তাঁর মেয়ে রাণুর হিংসাপরায়ণ স্বভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। শিশিরের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে মেয়ের জন্য যেমন তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ের কুৎসিত ব্যবহারে লজ্জাও পেয়েছিলেন ঠিক ততোধিক।

বাবলু তখন একটা সোফার পরে বসে হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

স্ত্রীকে সংক্ষেপে সমগ্র ব্যাপারটা খুলে বলে ডাঃ বোস বললেন, রাণু যে আমাদের এতখানি খারাপ হয়েছে, তা' কোনদিনই ভাবিনি, অমিয়া!

অমিয়াদি স্বামীর মুখে সমগ্র ব্যাপার শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের চিন্তার চেয়েও সুব্রতর কাছে মুখ দেখাবেন কী করে সেই আসন্ন লজ্জাকর পরিস্থিতির চিন্তায় মূক হয়ে গেলেন!

অল্পক্ষণ পরেই সুব্রতর গাড়ি এসে বাইরে দাঁড়াল। ঝড়ের মতই দ্রুতপদে এসে সুব্রত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সুব্রতকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই বাবলু ছুটে এসে সুব্রতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে। বললে রাণুদিকে ধরে নিয়ে গেছে দাদা!...মানকে, গোবরা! কী হবে?

কেঁদ না বাবলু! এখুনি রাণুকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

আমিও আপনার সঙ্গে যাবো, দাদা। আমি তাদের সবকিছু জানি। কোথায় তারা রাণুদিকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবে, তা' আমি জানি। হয় উত্তরের ঘরে, নয় ত' পুরাতন বাড়ির নীচের তলায়। কয়েকদিন আমাকে তারা সে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মিঞা সেখানে থাকে নিশ্চয়ই। মিঞার ঘরেই রাণুদিকে তারা আটকে রাখবে।

॥ কুড়ি ॥

বাবলুর কথা শুনে সুব্রত চিন্তিত হয়ে উঠল। যে উপায়ে হোক রাণুকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কোন কাজই হবে না। ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে হবে। বাবলুর কথাগুলো ভেবে দেখবার মত। যদি কথা অনুসারেই কাজ করতে হয় তবে বাবলুর নির্দিষ্ট পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়ত সহজেই সব জায়গাগুলো খুঁজে দেখতে পারবে। সুব্রত বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললে, সেই ভাল বাবলু, চল তুমি আমার সঙ্গে। তুমি ওদের আড্ডার সব গলি-ঘুঁজি জান।

বাবলু চট্‌পট্‌ প্রস্তুত হয়ে নিল।

শিশিরের কপাল অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। ডাঃ বোসের হাতে শিশিরের শুশ্রূষার ভার তুলে দিয়ে এবং অমিয়াদি ও ডাঃ বোসকে রাণুর সম্বন্ধে চিন্তা না করতে বলে সুব্রত বাবলুর হাত ধরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাস্তার 'পরই সুব্রতর ডিমলার গাড়ীখানা অপেক্ষা করছিল। বাবলুর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভারকে চিৎপুরের দিকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বললে সুব্রত।

গাড়ি ছুটে চলল।

চিৎপুর রোডে অবস্থিত সেই বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে সতর্ক করে সুব্রত বাবলুর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামল। রাত্রি তখন বোধ করি প্রায় বারটা। চিৎপুরের রাস্তাটা তখন একেবারে নির্জন হয়ে যায়নি। মানুষের চলাচল তখনো বেশ আছে। দু' একটা খালি মোষের গাড়ি পিচের সড়কের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে চলে গেল।

বাবলু সুব্রতর হাত ধরে এগুচ্ছিল। বাড়িটার কাছাকাছি এসে চাপা স্বরে বললে, দাদা, এ দরজা দিয়ে ঢুকবো না। ওদিককার সরু একটা গলির মধ্যে দিয়ে গেলে বাড়িতে ঢুকবার আরও একটা দরজা আছে। সেটা দিয়েই বাড়িতে ঢুকবো।

বেশ তাই চল। আমি ত' চিনি না। তুমি রাস্তাটা দেখিয়ে নিয়ে চল।

বাবলুর চাপা গলায় আবার বললে, আমার সঙ্গে আসুন।

ফুটপাতের উপর দিয়ে বাড়িটার গা ঘেঁষে ঘেঁষে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা সংকীর্ণ সরু অন্ধকার গলিপথের মধ্যে বাবলু প্রবেশ করলে। সুব্রত তার পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

boiRboi.net

আলো-বাতাসহীন, দুর্গন্ধময় দু'টো বাড়ির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে, আলো জ্বালব বাবলু ?

না। আমার পিছনে পিছনে আসুন। এ পথ একমাত্র দলের লোক ছাড়া কেউ জানে না। নিকষ কালো অন্ধকারে যেন চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।

অতি কষ্টে অন্ধকারে ঠাহর করে করে বাবলুর পায়ের শব্দ অনুসরণ করে সুব্রত এগিয়ে চলে।

হঠাৎ এক সময় চলতে চলতে বাবলু থেমে গেল। দাদা!

এই যে আমি!

একবার আলোটা জ্বালুন ত'।

সুব্রত পকেট থেকে টর্চ বের করে বোতাম টিপে আলো জ্বালাল।

সামনেই একটা জানালা। জানালা কপাট দু'টো বন্ধ!

কত কালের কাঠের পুরাতন কপাট। মসীবর্ণ, জীর্ণ।

বাবলু উঁচু হয়ে জানালার বন্ধ কপাটের গায়ে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিতেই কপাট দু'টো ক্যাঁচ করে মৃদু একটা শব্দ করে খুলে গেল। জানালার গায়ে শিক বসান। মাঝখানের দু'টো শিক নেই। বাকীগুলো আছে।

এই জানালা-পথে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে দাদা। দাঁড়ান, আগে আমি ভিতরে দেখে আসি, তারপর আপনি আসবেন!

বাবলু জানালার একটা শিক দু'হাতে ধরে ঝুলে উঠে পড়ল। এবং পর মুহূর্তে জানালা-পথে শিকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে গলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুব্রত হাতের টর্চ-বাতী নিভিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকারে বাবলুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কতকাল আগে কলকাতার এই শহরের উপরে এইসব বাড়ি তৈরি হয়েছিল কে জানে।

বড় বড় সব বাড়ি। বেশির ভাগই দোতলা তেতলা। খালি পড়ে আছে। একতলাগুলো গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্ধকারে কয়েকটা মশা কানের কাছে ভন্‌ভন্ করছে। হঠাৎ পায়ের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর, সড়সড় করে চলে গেল।

সুব্রত শশব্যস্তে সরে দাঁড়াল একটু। অতি আধুনিক শহরের এই সংকীর্ণ অন্ধকার গলিপথের যেন কোন সম্পর্কই নেই।

সুব্রতর মনের মধ্যে অনেক কথাই এক সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল। মাত্র চারদিনের মধ্যে ঘটনার সংঘাতে কোথায় ভেসে এসেছে।

boiRboi.net

মিঃ সরকারের মৃত্যু তদন্তের ব্যাপারে সব কাজই এখন বাকী। সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখবারও এখন পর্যন্ত সময় পায়নি। কিরীটীই বা কতদূর কী করলো কে জানে?

আজ এই কয়দিনে যে সব ঘটনাগুলো ঘটে গেল, এগুলো কিরীটী জানতে পারলে হয়ত তদন্তের ব্যাপারে অনেকখানি আলোর সন্ধান দিতে পারত। তার-পর এই মেয়েটি। দুঃখধান্ধার মধ্যে এই অল্প বয়সে কী টানা পোড়েনই বেচারীর চলেছে। আশ্চর্য স্বভাব। যে রাণু তাকে অনায়াসেই বিপদের মুখে ঠেলে দিতে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হয়নি, তারই জন্য ও কতখানি ব্যাকুল হয়েই না এই বিপদের মধ্যে ছুটে এলো! এতটুকু দ্বিধাবোধও করলে না।

হঠাৎ এমন সময় ও বাবলুর ডাকে চমকে উঠল।

দাদা!

উঁ! সুব্রত জবাব দিল।

দাদা, সমস্ত বাড়িটাই আমি ঘুরে দেখে এলাম। কিন্তু ওরা কেউ নেই। একমাত্র অবু আর বংকা একটা ঘরের মধ্যে বসে বসে কথা বলছে। এখানে নিশ্চয়ই ওরা রাণুদিকে নিয়ে আসেনি!

তবে?

মিঞার ওখানে এখন যেতে হবে আমাদের। আমার মনে হয়, ওরা নিশ্চয়ই রাণুদিকে ধরে সেখানে নিয়ে গেছে।

বাবলু আবার জানালা-পথে নীচে লাফিয়ে পড়ল, চলুন মিঞার ওখানে যাওয়া যাক!

সে কোথায়?

বড় রাস্তার 'পরেই, অল্প দূরে।

চল।

ওরা দু'জনে আবার গলিপথ থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার উপরে এসে পড়ল। বড় রাস্তার উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আর একটা সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

এ গলিপথটা আগেকার চাইতে সামান্য একটু প্রশস্ত বটে। তবে এখানে আলোর কোন সংস্পর্শ নেই। অন্ধকার।

কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে বাবলু একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

দাদা, এই বাড়িতে মিঞা থাকে। আলো জেলে দেখুন, সামনে একটা ছোট প্রাচীর।

BanglaRboi.net

সুব্রত বাবলুর কথামত টর্চবাতী জেলে দেখলে, সামনেই প্রায় হাত আড়াই উঁচু একটা পুরাতন প্রাচীর। প্রাচীরের গায়েই একতলার ছাদ। ছাদের 'পরে একটা গঙ্গা জলের ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে।

আলোটা নিভিয়ে ফেলুন, দাদা! ঐ প্রাচীরের উপরে উঠে জলের ট্যাঙ্কটার পরে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন বারান্দা। বারান্দাটায় লাফিয়ে পড়বেন। সেটা দোতলার বারান্দা। বারান্দা দিয়ে একটু এগোলেই দেখবেন নীচে নামবার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে আগে দরজাটা খুলে দিন।

সুব্রত নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিল মালকোছা এঁটে! তারপর অন্ধকারে বার দুই লাফিয়ে চেষ্টা করতেই তৃতীয় বারে ও প্রাচীর ধরে ফেললে। নিমেষে ও হাতের 'পরে ব্যালেন্স করে প্রাচীরের 'পরে উঠে বসল। প্রাচীরের উপর থেকে ট্যাঙ্কের উপরে উঠতে বেশি বেগ পেতে হল না।

হ্যাঁ, ঠিক সামনেই সরু একটা ফালিমত বারান্দা দেখা যাচ্ছে বটে।

অতি সন্তর্পণে লাফিয়ে সুব্রত বারান্দায় গিয়ে পড়ল।

বারান্দায় কোন আলো নেই, অন্ধকার। একটা খালি ঘর, তার দরজা খোলা হাঁ হাঁ করছে। সুব্রত কিছুক্ষণ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোথায় কোন সাড়া-শব্দ নেই, হঠাৎ যেন মনে হল, অন্ধকারে কোথা থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছে। সুব্রত থমকে দাঁড়াল, কে কাঁদে না?...হাঁ, তাই ত'। কার কান্নার শব্দ? এমন সময় একটা চাপা গর্জন শোনা গেল, এই থাম ছুঁড়ি!

সুব্রত চমকে উঠলো! কিন্তু ঠিক ঠাহর করে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখেও বুঝতে পারলে না কোথা থেকে শব্দটা আসছে।

আর দেরি নয়। বাবলু একা গলিপথে নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেমানুষ।

ও বারান্দা দিয়ে আর একটু এগিয়ে গেল। আকাশের বুকে তখন সরু এক-ফালি চাঁদ উঠেছে।

চাঁদের ক্ষীণ আলোয় এই ভাঙ্গা পুরাতন বাড়ির খানিকটা যেন ফ্যাকাসে করুণ দেখায়।

সেই মৃদু আলোয় সুব্রত দেখতে পেলে সামনেই একটা ভাঙ্গা পুরাতন কাঠের সিঁড়ি। নীচে একটা সংকীর্ণ উঠান।

উঠানটাও ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যায়।

সুব্রত আর দেরি না করে সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নেমে এল। উঠানের ওপাশে একটা মাত্র ঘর। ঘরের দরজাটা খোলা। আলো হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ও দেখলে, ঘরের মধ্যে একটা খিল আঁটা দরজা। আন্দাজেই ও বুঝতে পারলে,

boiRboi.net

এটাই এ বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার রাস্তা।

সুব্রত থিলটা খুলে ফেলতেই দরজাটা ঠেলে বাবলু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সুব্রত চাপা গলায় বাবলুকে বললে, কার যেন চাপা কান্না শুনতে পেলাম বাবলু।

বাবলু জবাব দিলে, চাপা গলায়, ঠিক। তাহলে তারা এখানেই রাণুদিকে নিয়ে এসেছে। এবারে আমার পিছনে পিছনে আসুন। বাবলু এগিয়ে চলল। উঠানটা পার হতেই আর একটি দরজা। এ দরজাটা ভেজানই ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। সামনেই একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের টেবিলের পরে একটা ধূম্র মলিন হারিকেন বাতি জ্বলছে।

সেই টেবিলের সামনে একটা টুলের 'পরে পিছন ফিরে বসে একটা লম্বা-চওড়া লোক আপন মনে বিড়ি ফুঁকছে!

লোকটার পরিধানে একটা লুঙ্গী, গায়ে একটা কোর্তা। মাথায় একটা মুসলমানী টুপি।

সুব্রত মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতিটা মনে মনে একবার পর্যালোচনা করে নিল। সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চারিধারে পরীক্ষা করে নিল। আশেপাশে আর কোন দ্বিতীয় প্রাণী নজরে পড়ে না। লোকটা চোখ মেলে বসে থাকলেও সজাগ নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় চকিতে লোকটাকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করে ঘায়েল করা।

মনে মনে তাই ও ঠিক করে ফেললে। লোকটাকে আক্রমণই করবে ও।

বাবলু চাপা গলায় বললে, ওই মিঞা বসে আছে দাদা। আপনি ওকে যদি ধরতে পারেন, তবে সেই ফাঁকে আমি ঘরের ভিতর থেকে রাণুদিকে খুঁজে আনতে পারি।

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে, তাই হবে।

সুব্রত চকিতে গিয়ে মিঞাকে পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলে সজোরে। অতর্কিতে সহসা এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে লোকটা ভয়ানক চমকে গিয়েছিল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। পরক্ষণেই লোকটা প্রবল এক ঝাপটা দিয়ে গায়ের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সুব্রতর দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করলে। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। দু'জনে হুটোপুটি করতে করতে খুঁটির 'পরে গড়িয়ে পড়ল। বাবলু ততক্ষণে এক দৌড়ে সামনের ঘরের ভেজান দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

ছোট্ট অপরিসর ঘরটা।

ঘরের এক কোণে একটা কাঠের বাক্সের পরে একটা ধূম্রমলিন হ্যারিকেন বাতি টিম্‌টিম্‌ করে আলোর চাইতে বেশি ধূমোদ্গীরণ করছে। ঘরের মাঝখানে একটা

দড়ির খাটিয়ার 'পরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাণু পড়ে আছে। ঘরের ম্রিয়মান আলোকে বাবলু এসে রাণুর সামনে দাঁড়ালো। রাণু বাবলুকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। বাঁধা হাত-পা নিয়ে আবার হেলে পড়ে গেল।

বাবলু চকিতে রাণুর 'পরে ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি রাণুর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে লাগল।

রাণু বাবলুর ব্যবহারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বাবলুর দিকে চেয়ে দেখছিল।

বাঁধন খোলা হয়ে গেলে রাণু খাটিয়ার 'পরে উঠে বসল।

বাবলু ডাকলে, রাণুদি! শীঘ্র পালিয়ে চল!

রাণু খাটিয়ার উপর থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল।

ওদিকে ততক্ষণ সুব্রত লোকটাকে ঘায়েল করে তার বুকের 'পরে চেপে বসেছে। লোকটা সুব্রতকে তার নিজের শরীরের উপর থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা করছে।

রাণুর হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতে বাবলু ওই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

সুব্রত লোকটাকে কায়দা করে আনলেও নিজে তখন প্রবল ভাবে হাঁপাচ্ছে। বাবলু রাণুর হাত ধরে থমকে যুদ্ধরত সুব্রতর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের চারপাশ একবার চকিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। সহসা ওর নজরে পড়ল ঘরের এক কোণে একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে বাবলু ডাণ্ডাটা হাতে তুলে নিল এবং ডাণ্ডাটা হাতে করে এগিয়ে এসে ভূপতিত লোকটার মাথায় সজোরে ডাণ্ডাটা দিয়ে বসালে এক আঘাত। লোকটা একটা আর্তনাদ করে উঠল এবং দেখতে দেখতে মুষ্টি তার শিথিল হয়ে গেল।

লোকটা জ্ঞান হারাল।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। এবং অদূরে দণ্ডায়মান বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। অজস্র কৃতজ্ঞতায় সুব্রতর চোখের দৃষ্টি তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। সুব্রত দু' হাত বাড়িয়ে গভীর স্নেহে বাবলুকে বুকের পরে টেনে নিল। কৃতজ্ঞতায় তার কণ্ঠস্বরও বুঝি তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু বাবলু বাধা দিল, দাদা, শীঘ্র এখান থেকে পালিয়ে চলুন! কেউ এসে পড়তে পারে!

boiRboi.net

॥ একুশ ॥

বুকভরা উৎকণ্ঠায় অমিয়াদি ও ডাঃ বোস তখনও বাইরের ঘরের দু'খানা সোফায় মুখোমুখি হয়ে জেগে বসেছিলেন।

রাত্রি তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

সুব্রত দু'হাতে রাণু ও বাবলু দু'জনকে ধরে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল, অমিয়াদি ?

কে ? একসঙ্গে দু'জনেই চমকে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

এই নিন অমিয়াদি, আপনাদের রাণু !

অমিয়াদি আকুলভাবে মেয়ের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন। রাণু একপ্রকার ছুটে এসেই মায়ের বুকের পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা, মা-মণি ! অমিয়াদির চোখের কোল দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

ডাঃ বোস প্রশ্ন করলেন, কেমন করে, কোথায় ওকে খুঁজে পেলেন সুব্রতবাবু ? আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আজ আর ছোট করবো না।

ধন্যবাদ যদি দিতেই হয় ডাঃ বোস, তবে আমার বোন বাবলুকে দিন। বাবলু না থাকলে আজ রাণুকে উদ্ধার করা কোনমতেই সম্ভব হতো না।

ডাঃ বোস এগিয়ে এসে বাবলুর মাথার পরে শুধু গভীর স্নেহে একখানা হাত রাখলেন, কী আর বলবেন তিনি। সকল ভাষা আজ যেন তাঁর কৃতজ্ঞতার বন্যায় ভেসে গেছে।

অনেক রাত হয়েছে। ওদের শুতে নিয়ে যান অমিয়াদি ! সুব্রত বললে এখন আমি যাই, কাল সকালে এসে সবকথা খুলে বলবো। হাতে আমার অনেক কাজ বাকী।

ডাঃ বোস বললেন, এই শেষ রাত্রে আর আপনি নাই বা গেলেন সুব্রতবাবু ! আপনার শরীরের উপর দিয়ে ত কম ধকল যায়নি। বাকী রাতটুকু এখানে শুয়েই বিশ্রাম করে নিন।

অমিয়াদিও বললেন, সেই ভাল সুব্রত। আজ রাত্রে আর কোথাও যেও না।

গুরু পরিশ্রমে সুব্রতর শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আপাততঃ খানিকটা বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। তাই সে রাজী হয়ে গেল।

বাবলু আর রাণুকে শুইয়ে সুব্রতর বিছানা পেতে দিয়ে গেলেন অমিয়াদি। সুব্রত শয্যার 'পরে গা এলিয়ে দিল।

boiRboi.net

* * * *

সকালবেলা হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে সুব্রত বের হতে যাবে, সহসা বাবলু পিছন থেকে সুব্রতকে ডাকল, দাদা!

সুব্রত ফিরে দাঁড়াল। সামনেই একান্ত কুণ্ঠিতভাবে বাবলু দাঁড়িয়ে।

কে, বাবলু? আমাকে কিছু বলবে ভাই?

হ্যাঁ? আমাকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন দাদা?

সুব্রত আশ্চর্য হয়ে গেল, কেন? তোমরা কী এখানে থাকতে কোন কষ্ট হচ্ছে মণি?

না, মা আমাকে খুব ভালবাসেন!

তবে তুমি যেতে চাইছ কেন, ভাই?

বাবলু কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

বল! তোমার কী কোন কষ্ট হচ্ছে?

না দাদা, এঁরা সবাই আমাকে খুব ভালবাসেন! রাণুদি বোধ হয় চায় না যে, তাদের বাসায় আমি থাকি। রাণুদির কোন দোষই নেই, দাদা! সে হয়ত চায় না, তার মা-বাবার স্নেহে অন্য কেউ ভাগ বসাক। আমিও হয়ত চাইতাম না। আমারও খুব ইচ্ছা ছিল না। যতক্ষণ না আপনি আমার মাকে খুঁজে দেন, এখান হতে অন্য কোথাও যাই। কিন্তু গত রাত্রের সমস্ত ব্যাপারই তো আপনি দেখেছেন দাদা! তবু আমি চাই না যে, আপনি রাণুদির মা-বাবাকে রাণুদি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন। সব কথা শুনলে হয়তো রাণুদিকে তাঁরা বকা-বকি করবেন। আমার মাকে যদি সত্যি খুঁজে দিতে পারেন, তবে আমি তাঁর কাছেই যাবো। আর যদি তাঁকে খুঁজে নাই পাওয়া যায়, আমি অন্য কোথাও চলে যাবো। আমি এ বাড়িতে থাকলে যখন রাণুদি কষ্ট পায়, কেন তাকে কষ্ট দেবো। আমি এখান থেকে চলে গেলেই আর তার কোন দুঃখ থাকবে না। আর সে কষ্টও পাবে না মনে! সে সুখী হবে।

বাবলুর কথাগুলি শুনে সুব্রত বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় যেন থ হয়ে গেল। এতটুকু মেয়ের এতখানি ঔদার্য! এ শুধু অভাবনীয়ই নয়, অপূর্ব!

সস্নেহে সুব্রত বাবলুকে কোলের কাছে টেনে নিল। তার পর তার রুক্ষ চুলগুলিতে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, আমি সব বুঝেছি বাবলু? আজকের দিনটা তুমি এখানে থাক। কাল সকালে এসে তোমাকে আমি এবাড়ি থেকে নিয়ে যাবো।

বাবলু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

boiRboi.net

বাবলুর মাথায় নীচু হয়ে একটা গভীর স্নেহে চুম্বন করে মুখ তুলতেই সুব্রত দেখলে, কখন একসময় রাণু এসে দরজার পরে দাঁড়িয়েছে। ওরা দু'জনে কেউই তা লক্ষ্য করেনি।

সুব্রত মুখটা বাবলুর দিক থেকে ফিরিয়ে নিল! তারপর বাবলুর দিকে চেয়ে বললে, বাড়ি থেকে কোথাও কারও সঙ্গে কিন্তু বেড়িও না বাবলু। আমি কাল বিকেলে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

* * *

সেইদিন দ্বিপ্রহরে সুব্রত কয়েকজন লাল পাগড়ী ও তালুকদারকে নিয়ে চিৎপুরের বাড়িটায় হানা দিল।

কিন্তু সমস্ত শূন্য বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে! কোথাও জন-প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। সন্ধ্যার দিকে সুব্রত কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

কিরীটী নিজের শয়নঘরে একটা সোফার 'পরে কাত হয়ে শুয়ে একখানা কেমিষ্ট্রী বই পড়ছিল। সুব্রতর পায়ের শব্দে মুখ তুকে তাকাল। সু যে। সুব্রত ক্লান্ত-ভাবে একটা সোফার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে বললে, হ্যাঁ!

তারপর এতদিন ডুব দিয়েছিলি কোথায়? ফোন করে করেও তোর পাত্তা পাই না। ব্যাপার কী?

গিয়েছিলাম অতীতের অন্ধকারে ডুব দিয়ে অতীতের ইতিহাস মন্থন করতে!··· কিন্তু সে অনেক কথা। তার আগে শুনতে চাই তুমি কতদূর এগুলে?

শরীরটা আজ কয়েক দিন খারাপ। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' হয়েছে। কোথাও বের হতে পারিনি। তবে মনে মনে কয়দিন ধরে 'ছক্' কেটেছি।

কোন Suggestion?

কিরীটী মৃদু হাসলে, হাঁ, কিছু আছে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে আমার সমস্ত সূত্রগুলি যেন কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। খুনী কে, আমি তা' জানি সুব্রত!

জানো?

হ্যাঁ।···

কে? সুব্রতর কণ্ঠস্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে। উত্তেজনায় ও অধীর হয়ে ওঠে।

কিরীটী ধীর সংযত কণ্ঠে আশ্বাস দেয়, দাঁড়া, ব্যস্ত হোস্‌নে। খুনী কে, সেটা তো শুধু জানলেই হবে না! একটা 'হাইপথেসিস্' মাত্র। সমগ্র থিওরীটা শূন্যে

boikboi.net

একটা নেবুলার মত পাক খেয়ে ফিরছে মাত্র। 'মোটিভ'টা যেন কোনমতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। ছাখ্ একটা কাজ করতে পারিস্?

কী? সুব্রত উৎসুকভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

সরকার ফ্যামিলির কোন অতীত ইতিহাস আছে কি না, তলে তলে একটা খোঁজ নিতে পারিস্? আমার মনে হয়, পুকুরের তলায় অনেক পচা কাদা জমে আছে!

তবে শোন! সুব্রত ধীরে ধীরে এই কয়দিনের সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া কিরীটীর কাছে খুলে বলে গেল।

সুব্রতর কথা শুনতে শুনতে কিরীটীর মুখের 'পরে নানা ভাব-বৈচিত্র্যের রঙ খেলে বেড়াতে লাগল।

সুব্রতর কাহিনী শেষ হলে, কিরীটী চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, হয়েছে! পেয়েছি! প্রায় সমস্ত সমস্যায়ই মীমাংসা হয়ে গেল সু! কেবল সামান্য দু'চারটে তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেই খুনীকে আমরা হাতেনাতে ধরে ফেলবো।

কিন্তু কথা বলতে বলতে সহসা যেন কিরীটীর ভাব পরিবর্তনে সুব্রতও ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলে, কী হলো?

কিরীটী তখন গম্ভীরভাবে হাত দু'টো পশ্চাতের দিকে পরস্পর মুষ্টিবদ্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করেছে। সুব্রতর কথার কোন জবাবই দিল না সে।

সুব্রত বুঝলে, কিরীটী কোন বিশেষ কারণেই বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ আপন মনেই যেন কিরীটী বিড়বিড় করে বলতে লাগল, শেষ পর্যন্ত! শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াল! কিন্তু···কিন্তু···

অনেকক্ষণ বাদে আবার কিরীটী এক সময় সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, বাবলুকে না হয় আজই আমার বাড়িতে রেখে যা সু! সাবধানের মার নেই! আর কাল সকালে সর্বাগ্রে আমাদের মিঃ সরকারের এটর্নীর কাছে যেতে হবে।

হ্যাঁ ভাল কথা, মিঃ সরকারের ঘর দুটো 'লক আপ' করা আছে ত'?

হ্যাঁ!

কাল রাত্রে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে হবে!

কোথায়?

মিঃ সরকারের বাড়িতে!

বেশ!

তুই বাবলুকে নিয়ে আয় এখুনি!

সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

boiRboi.net

॥ বাইশ ॥

সন্ধ্যা তখন সবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে !

রাত্রির কালো ছায়া পৃথিবীর বুকের পরে ঘন হয়ে চেপে বসেছে।

সুব্রত এসে ডাঃ বোসের বাড়িতে প্রবেশ করল। অমিয়াদি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রামুন ঠাকুরকে রাত্রির রান্নার আয়োজন সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। সুব্রত এসে ডাকল, অমিয়াদি।

কে ? সুব্রত, এসো ভাই।

বাবলু কোথায় অমিয়াদি ? তাকে নিতে এসেছি।

অমিয়াদি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকালেন।

আমি কিরীটীর ওখান থেকে আসছি অমিয়াদি। কিরীটী বলে দিল, বাবলুকে তার ওখানে নিয়ে যেতে।

তুমি কি রাণুর ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছ ভাই ? অবিশ্যি যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার জন্য তোমার জামাইবাবু ও আমার লজ্জার অবধি নেই। ক্ষমা চাইবার মত মুখও আমাদের নেই তোমার কাছে। তবু সে ছেলেমানুষ, তার ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে…

সুব্রত বাধা দিল, ছিঃ ছিঃ ! দিদি, আপনি ও সব কথা মনে করছেন কেন ? রাণু ছেলেমানুষ ! ছেলে-বুদ্ধিতে যদি সে কিছু করেই থাকে, তাই বলে আমরাও ত' সেই সঙ্গে ছেলেমানুষ হতে পারি না অমিয়াদি ! ও সব কথা ভুলে যান। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কিরীটী বাবলুকে তার ওখানে নিয়ে যেতে বলেছে। বাবলুর জীবনের সব কথাই ত' আপনি জানেন অমিয়াদি। আমাদের বিশ্বাস বাবলুর মা-বাবা এখনও বেঁচে আছেন। একটা গভীর রহস্য আবৃত হয়ে আছে ওর জীবনটায়। সেই রহস্যের জটগুলো খুলে ওকে আমরা ওর মা-বাবার হাতে আবার তুলে দিতে চাই। ওর যাওয়াতে আপনি দুঃখিত হবেন না।

বেশ ! তবে নিয়ে যাও ভাই।

বাবলু কোথায় অমিয়াদি ?

ওপরে রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে বসে আছে দেখে এসেছি একটু আগে।

বেশ, আমি নিজেই যাচ্ছি।

সুব্রত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ব্যালকনির অনুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় বাবলু চুপটি করে গালে হাত দিয়ে বসেছিল।

সুব্রত ডাকলে, বাবলুমণি ?

কে, দাদামণি ? বাবলু চমকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল।

boiRboi.net

সুব্রতকে সামনে দেখে বাবলু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে দু'হাতে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল, ভালো আছো দাদামণি ?

হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ ভাই ?

ভাল।

জান বাবলু, তোমাকে আজ আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় যাবো দাদা ?

আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। তুমি যাবে ত' সেখানে ?

নিশ্চয়ই। যেখানে আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাবো।

লক্ষ্মী মেয়ে বাবলু আমাদের। যাও, জামা কাপড় পরে চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নাও। আমরা এখনি যাবো।

বাবলু ধীর মন্থরপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে বাবলু সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবলুর গায়ের রং এই কয়দিনের সেবা-যত্নে অনেকটা উজ্জল হয়ে উঠেছে। দু'গালে গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে যেন।

আকাশ-নীল রংয়ের একটি ফ্রক, মাথায় লাল রংয়ের একটা চওড়া চওড়া ফিতে বাঁধা। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো অমিয়াদি সযত্নে আঁচড়িয়ে দিয়েছেন। আগা-গোড়া সবকিছু মিলে যেন সুন্দর একটি ফোটা ফুলের মতই বাবলুকে মনে হচ্ছিল।

বাবলুর পিছনে পিছনে অমিয়াদি একটা চামড়ার সুটকেশ হাতে এসে দাঁড়ালেন, বাবলু, এই তোমার সুটকেশ। এতে তোমার জামা কাপড়, খেলনা, বই সব গুছিয়ে দিয়েছি।

বাবলুর মুখখানা যেন একটু বিষণ্ণ। অমিয়াদিকে প্রণাম করে সুব্রতর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ সে থেমে গেল।

সুব্রত পিছনে ফিরে ডাকল, কী, থামলে যে ?

আপনি একটু দাঁড়ান দাদা, আমি এখুনি আসছি।

বাবলু ত্রস্তপদে উপরে উঠে গেল।

যে ঘরে রাণু থাকে, সেই ঘরে এসে ঢুকল।

একটা সোফার 'পরে হেলান দিয়ে রাণু একটা ছবির বই দেখছিল। বাবলু সোফার পিছনে এসে মৃদুস্বরে ডাকলে, রাণুদি।

রাণু চমকে বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

সেদিন রাত্রের ঘটনার পর বাবলুর সঙ্গে রাণুর একটি কথাও হয়নি। বাবলু ভয়ে সংকোচে এড়িয়ে চলছিল রাণুকে !

boiRboi.net

দু'জনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব বাঁচিয়ে রেখে বাবলু নিজেকে একেবারে সংকুচিত করে নিয়ে ছিল রাণুর দৃষ্টির সামনে থেকে। আর রাণু!

সে রাত্রের সেই আকস্মিক ঘটনা বিপর্যয়ে তার মনের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বয়ে গেছে।

বাবলু যখন এ বাড়িতে প্রথম পা দেয়, একটা প্রচণ্ড হিংসার ঢেউ রাণুর সমগ্র শিশুচিত্তকে বাবলুর প্রতি একান্ত বিরূপ করে তুলেছিল। বাবলু যে তার মায়ের সমস্ত স্নেহটাকে বেদখল করে লুটে নিতে এসেছে, এটাই বড় হয়ে তার মনে জেগে উঠেছিল।

এমন সময় দুষমণদের দলের একজন, যে সদা সর্বদা ডাঃ বোসের বাড়িতে বাবলুর প্রতি নজর রেখে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরছিল, রাণুকে একদিন সন্ধ্যায় পার্কেও পাকড়াও করলে। রাণুর সঙ্গে সে বাবলু সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতেই বুঝতে পারলে, তীব্র হিংসার হলাহলে বাবলুর প্রতি রাণুর মনটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তখুনি সে মনে মনে মতলব করলে কণ্টক দিয়েই কণ্টকের উদ্ধার করতে হবে। সহজেই সে রাণুকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে মতলব ঠিক করে ফেললে। রাণু বাবলুর সহজে একটা ব্যবস্থা করতে পারায় সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

তারপর ঘটনার আকস্মিকতায় যখন সব ওলট পালট হয়ে গেল, বাবলুর বদলে সে নিজেই শয়তানদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, তখন সে ভয়ে ভাবনায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

তারপর তারা রাণুকে নিজেদের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলে এবং তাকে বললে, বাবলুকে না ধরে আনা পর্যন্ত তার মুক্তি নেই। এমন কি বাবলুকে না পেলে তারা তাকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। কেউ তার সংবাদ পাবে না। বন্দী রাণু খাটের 'পরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এমন সময় বাবলুই সুব্রতকে নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করলে। আবার সে হতভম্ব হয়ে গেল।

উদ্ধার করে আনবার পর সে ভেবেছিল, মা-বাবা নিশ্চয়ই তাকে খুব বকবেন। কিন্তু কেউ যখন তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন সত্যিই সে একটু ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল। বাকী রাত্রিটুকু সে একবারও চোখের পাতা দু'টো বুঁজতে পারলে না। চোখ বুঁজলেই সেই ভীষণ দর্শন শয়তান লোকগুলোর মুখ মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

সহসা রাণুর নিজের কাছে নিজেকে যেন একান্ত ছোট ও হীন বলে মনে হতে লাগল। কতবার সে ভাবলে, বাবলুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু লজ্জা ও

boiRboi.net

সংকোচে সে এক পাও এগুতো পারলে না।

এমনি মনের বিপর্যয়ের মধ্যে সহসা বাবুলুই যখন এসে তাকে ডাক দিল, তখন ও চমকে উঠল।

বাবলু ধীরে সংকোচের সঙ্গে বললে, রাণুদি, আমি চলে যাচ্ছি। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

কথা কয়টি বলে বাবলু ধীরপদে ঘর থেকে বের হবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাবলু! সহসা রাণুর ডাকে ও চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

রাণু এগিয়ে এল বাবলুর একেবারে কাছটিতে। কোথায় তুমি যাচ্ছ বাবলু?

দাদার সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

রাণু বাবলুর একখানা হাত চেপে ধরলো, কেন যাবে ভাই? এবার থেকে তোমাকে আমি খুব ভালবাসব। যেও না তুমি, এখানেই আমাদের বাড়িতে থাক। রাণুর চোখের কোল দু'টি সহসা অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

বাবলুরও চোখে জল এসে গেল। বাইরে সুব্রতর ডাক শোনা গেল, বাবলু এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

যাই দাদা!

॥ তেইশ ॥

পরের দিন সকাল।

কিরীটী ফোনে সুব্রতকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের আর্টিষ্ট সুবোধ দত্তের বাড়িতে যখন কিরীটী ও বাবলু এসে দাঁড়াল, বেলা তখন প্রায় সোয়া দশটা হবে।

দরজায় কড়া নাড়তেই সুবোধবাবু এসে দরজা খুলে দিলেন।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কাকে চান? কে আপনি?

কিরীটী হাসতে হাসতে সুবোধবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনিই শিল্পী মিঃ দত্ত?

হ্যাঁ!

আমার নাম কিরীটী রায়।

আমার কাছে আপনার কী প্রয়োজন? মিঃ দত্তর গলার স্বরটা যেন একটু রূঢ়।

প্রয়োজন একটা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা আপনার সঙ্গে নয়।

তবে কার সঙ্গে?

boiRboi.net

কিন্তু কথাটা ত' ছোট্ট নয়, একটু সময় নেবে। তাছাড়া আমার যা বলবার তা' এই দরজার উপরে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। ঘরের মধ্যে যেতে পারি কি?

ভ্রূ দু'টো কুঁচকে সুবোধবাবু যেন একমুহূর্ত কী ভাবলেন—তারপর বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বললেন, বেশ আসুন। কিন্তু সময় আমার খুব অল্প।

কিরীটী বাবলুকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, সময়ের দাম আমারও আছে মিঃ দত্ত। ঠিক কাজের কথাটুকু বলা হলেই আমি চলে যাবো, এক মুহূর্তও বেশি থাকব না। বা আপনাকে বিরক্ত করবো না।

একটা সোফা অধিকার করে কিরীটী বসল।

বলুন, কি প্রয়োজন আপনার?

আমার প্রয়োজন আপনার বোন নমিতা দেবীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?

সুবোধবাবু দারুণ বিরক্তিতে বললেন, কি প্রয়োজন আপনার আমার বোনের সঙ্গে?

সে কথা আমি তাঁর কাছেই বলতে চাই, আপনার কাছে নয়। তবে আজ যে কথা আমি বলতে এসেছি তাঁর সঙ্গে, তার উপরে আপনার মান-সম্ভ্রম অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

না, তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। আপনার যা বলবার আমার কাছেই বলতে পারেন।

বলেছি ত' মিঃ দত্ত, তা বলতে পারবো না। বৃথা সময় নষ্ট করে দু' দু'টো নির্দোষ জীবন ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবেন না।

না, আমি কোন কথাই শুনতে চাই না। আপনি চলে যেতে পারেন। আমার বোনের সঙ্গে কারও দেখা হবে না।

মিঃ দত্ত চিৎকার করে উঠলেন।

সুবোধবাবু, আপনি অনেক দাগা পেয়েছেন আমি জানি। কিন্তু আজ যদি আপনি আপনার বোনের সঙ্গে আমার দেখা করতে না দেন, তবে যে দাগা পাবেন, তার সান্ত্বনা আপনার কোনদিন মিলবে না।

এমন সময় নমিতা দেবী নিজেই এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, কী হয়েছে দাদা?

নমস্কার, আপনার নাম কী নমিতা দেবী?

হ্যাঁ, নমস্কার! কিন্তু আপনি?

আমার নাম পরে শুনবেন। কোন একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে আমি এসেছি, কিন্তু আপনার দাদা কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতে দেবেন না?

boiRboi.net

কী দরকার আমার কাছে আপনার, বলুন ?

মিঃ দত্ত গজগজ করতে করতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বসুন নমিতা দেবী !

নমিতা সামনেই একখানা সোফা অধিকার করলেন।

বলুন !

ইতিমধ্যেই কিরীটী বাবলুকে নমিতা দেবীর দৃষ্টির আড়ালে নিজের পিছনের একখানা চেয়ারে বসিয়ে রেখেছিল। আরও একটু ভাল করে বাবলুকে নমিতা দেবীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে কিরীটী মৃদুস্বরে বলতে লাগল, বছর নয়েক আগে শিমুল-তলায় আপনার দাদার কোন এক ধনী বন্ধুর সঙ্গে আপনার রেজেস্ট্রী ম্যারেজ হয় ?

হ্যাঁ !

আপনার স্বামীর নামটি জানতে পারি কী ?

না, কেন না আমিও তাঁর সত্যিকারের নাম জানি না। পরিচয়ের গোড়া থেকেই তিনি নাম ভাঁড়িয়েছিলেন আমাদের কাছে। কোনদিনই আমরা জানতে পারিনি তাঁর দেশ ঘর-বাড়ি কোথায়। কিন্তু এসব কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

আমি আজ এমন একটা সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যার উপর আপনার ও আপনার হারিয়ে যাওয়া একমাত্র সন্তানের শুভাশুভ সবকিছু নির্ভর করছে !

কে, কে আপনি ? আমার কথা আপনি জানলেন কী করে ?

ব্যস্ত হবেন না নমিতা দেবী ! সব কথাই ক্রমে প্রকাশ হবে। পরিচয়ও আমার পাবেন। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনার ভাইয়ের মত আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীই, শত্রু নয়।

কিন্তু···

আগে আমার কথাগুলোর জবাব দিন নমিতা দেবী ! আপনার স্বামীর নাম—ছদ্মনাম কী ছিল ?

জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ?

ঐ নামেই বিবাহ হয়েছিল ?

হ্যাঁ।

ও নামটা যে তাঁর ছদ্মনাম, কবে আপনি জানতে পারেন ?

আমার সন্তানের জন্মের মাস দুই আগে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কোন

boiRboi.net

একটা বিশেষ সাংসারিক গোলযোগে তিনি আমাকে তখন তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছিলেন না। পরে সব মিটে গেলে আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। তবে প্রত্যেক মাসে আমাকে দেড়শত টাকা করে ভরণপোষণ বাবদ দেবেন বলেছিলেন। শিমুলতলাতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং বিবাহের কুড়ি দিন বাদেই তিনি হঠাৎ আমাদের কাউকে কোন কিছু না বলে কোথায় চলে যান। তাঁর ঠিকানা আমার কাছে ছিল। মাস পাঁচেক নিয়মিত টাকাও পেয়েছি। কিন্তু ১০।১২ খানা চিঠি লিখে একখানারও জবাব পাইনি। ঠিকানার খোঁজ নিয়ে পরে জেনেছিলাম সেখানে উনি থাকেন না। সেটা একটা মনোহারী দোকান। তারপর হঠাৎ তাঁর টাকা আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর আর তাঁর কোন খোঁজই আজ পর্যন্ত পাইনি! দাদার এক জমিদার বন্ধু ছিলেন তাঁর নাম বিনয়েন্দ্র সরকার। তাঁরই দয়ায় আমি চাকরী পাই! নমিতা দেবী একে একে তাঁর এ কয় বৎসরের জীবন-কাহিনী বলে গেলেন।

আপনার মেয়েটির আর কোন সন্ধান পাননি?

না!

আপনার মেয়েটি যখন চুরি হয়, তখন তার বয়স কত ছিল?

ছয় বছর হবে।

আজ চার বছর সে চুরি গেছে?

হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ বছর হবে।

আপনার মেয়ের নাম কি ছিল?

বাবলু। নমিতা দেবীর চোখের কোল দু'টি অতীত স্মৃতির দোলায় ঝাপসা হয়ে ওঠে।

এমন সময় সহসা কিরীটী বাবলুকে সামনে টেনে এনে নমিতা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে, দেখুন ত' এই মেয়েটিকে আপনি চিনতে পারেন কিনা?

কে? কে? কে এই মেয়েটি! নমিতা দেবী অধীর আগ্রহে বাবলুকে বুকের 'পরে দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন।

পাগলের মতই তিনি মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসি-কান্নায় যেন দুলে উঠলেন, এই ত! এই ত! আমার মেয়ে। কোথায় পেলেন একে? বাবলু! বাবলু সোনা!

মা! মা-মণি!

boiRboi.net

* * * *

কিছুক্ষণ বাদে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, আজ তাহলে আসি, নমিতা দেবী! আপনার স্বামীর পরিচয় শীঘ্রই আমি আনব। কিন্তু তার আগে আপনাকে লেখা আপনার স্বামীর কোন চিঠি যদি আপনার কাছে থাকে, তবে সেটা দিলে আমার খুব সুবিধা হয়।

আছে। প্রথম দু'খানা চিঠি এখনও আমার কাছে আছে। এখুনি এনে দিচ্ছি।

॥ চব্বিশ ॥

আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বের হয়ে, কিরীটী ক্লাইভ স্ট্রীটে মিঃ বি. সরকারের অফিসে গিয়ে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ ধরে এটর্নীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যখন সে এটর্নী অফিস থেকে বের হয়ে এলো, বেলা তখন প্রায় দু'টো। এটর্নী কলকাতায় ছিলেন না। তাই এর আগে কিরীটী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।

টালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এসে কিরীটী দেখলে, বাইরের ঘরে একটা সোফার 'পরে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে সুব্রত।

কিরীটীর পায়ের শব্দে সুব্রত চোখ মেলে তাকাল, এত দেরি হলো যে?

সব কাজ সেরে এলাম। তুই কতক্ষণ এসেছিস?

প্রায় ঘণ্টাখানেক।

মিঃ বি. সরকারের শয়নঘর ও লাইব্রেরীঘর যা চাবি দেওয়া ছিল, সেটা দিয়ে এসেছিস্ ত?

হ্যাঁ!

সকলকেই আড়ালে ডেকে আলাদা আলাদা করে বলে এসেছিস্ ত' যে ও ঘরের মধ্যে যেন কেউ না ঢোকে?

হ্যাঁ!

তারপর তোমার কাজ কতদূর এগুলো?

প্রায় কমপ্লিট! শুধু সামান্য একটু একস্‌পেরিমেণ্ট আজ রাত্রে যা বাকী। ব্যস্, তারপরই খুনী ধরা পড়বে। তুই বোস্, চট্ করে আমি স্নানটা সেরে আসছি। অনেক আলোচনা করবার আছে।

কিরীটী বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

boiRboi.net

* * * *

সামনে ধূমায়িত চায়ের দু'টো কাপ।

কিরীটী বলছিল, প্রথম দর্শনে কেসটা আমার বেশ জটিল বলেই মনে হয়েছিল। তার অবশ্যি কারণ ছিল তিনটি: ১নং, মৃত ব্যক্তি চেয়ারে বসেছিল কেন? মানে, ঐ চেয়ারে বসা অবস্থায় ছিল কেন? ২নং, মিঃ সরকারের হাত ঘড়িটা ভাঙল কি করে? আর ৩নং কারণ, সহজ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে গেলে খুন করবার যে 'মোটিভ্' মিঃ সরকারের উইলের দ্বারা লাভবান হওয়া, তা-ও বাড়ির প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব ছিল। কেন আমি একথা বলছি যে ও বাড়ির প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব ছিল খুন করা?

কারণ, প্রথম দর্শনেই আমি স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, মিঃ বি. সরকারকে খুন করেছে ও বাড়িরই কেউ। বাইরের লোকের দ্বারা ওভাবে মিঃ সরকারের খুন হওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। সে কথাটা সর্বাগ্রে না বলে নিলে বাকী কথাগুলো তোমার কাছে খোলসা হবে না। সব কিছু বিচার করবার আরো আগে যে কথাটা সকলের মনেই সন্দেহের দোলা জাগাতে পারে, সেটা হচ্ছে, মিঃ সরকারের মৃত্যু কী করে ঘটেছিল। ডাক্তারের ময়না তদন্তের বিবরণ থেকে যা প্রকাশ হয়েছে, তা থেকে আমরা জানি বা জানতে পেরেছি, মিঃ সরকারের মৃত্যু ঘটেছে আনুমানিক মধ্য রাত্রিতে অর্থাৎ বারটা একটার মধ্যে। এবং তীক্ষ্ণ 'হাইড্রো সায়ানিক এ্যাসিড্' বিষে তাঁর মৃত্যু ঘটান হয়েছে। এনালিসিস করে তাই পাওয়া গেছে।

তাঁর বক্ষের 'ফিপ্ত ইন্টার কষ্টাল স্পেসে' যে পাংচারউণ্ড দৃষ্ট হয়, সেটার তাৎপর্য মৃত্যুর কারণের পরে কিছুই নেই। অন্য লোককে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওটা স্রেফ্ একটা ধোঁকা মাত্র এবং হয়েছিলও তাই। তুমি তদন্ত করতে গিয়ে সেই ক্ষত চিহ্নটিকে নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলে। সিরিঞ্জের ইতিহাস ও তার গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। আসলে ঐ সিরিঞ্জটাও খুনীর ইচ্ছাকৃত আর একটা চাল এবং নিজের ঘাড় থেকে অন্য এক নির্দোষীর ঘাড়ে খুনের দায়টা চাপিয়ে দেবার জন্য একটা উৎকৃষ্ট উদ্ভাবিত পন্থা মাত্র! কিন্তু কেমন করে সে কথাটা আমার মনে পরিষ্কার হয়ে যায়?

খুনী একটা ভুল করেছিল, সেটা বড় মারাত্মক ভুল। খুন করবার পর ঐভাবে সেটাকে সাজাবার জন্য মৃতের পক্ষে 'ফিপ্ত ইন্টার কষ্টাল স্পেসে' পাংচার করা ও সিরিঞ্জটা অশোকের ঘরে রেখে যাওয়া! ঐ কাণ্ড দু'টো করে সে নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে গেছে।

boiRboi.net

ব্যাপারটার মধ্যে যে এতটুকু সত্যি নেই, আগাগোড়াই সাজান, তা আমি কেমন করে বুঝলাম? প্রথমত, ঐ ভাবে কোন 'নিডল' দিয়ে হার্টকে পাংচার করে কোন মানুষকেই মারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐভাবে মারাটাও একপ্রকার অসম্ভব। ধরে নিচ্ছি, মিঃ সরকারের কোন একান্ত পরিচিত লোকই মিঃ সরকারের হার্টে পাংচার করে কোন বিষ প্রয়োগের দ্বারা মেরেছে।

কিন্তু মারবার সময় তিনি নিশ্চয়ই চীৎকার করে উঠতেন। কেউই ওভাবে অন্যের হাতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত নন। আর যদি ঘুমিয়েই থাকতেন, তবে ঐ সময় —হার্ট পাংচার করবার সময় নিশ্চয়ই জেগে উঠতেন, ও একটা গোলমাল হতো। এই দুটো ব্যাপারেই আমার মনে হয়েছিল 'ফিপ্ত ইনটার কষ্টাল স্পেসে'র পাংচার উণ্ড ও সিরিঞ্জটা খুনীর একটা চাতুরী মাত্র। অন্যের বিচার-পদ্ধতিকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। তাহলে মীমাংসিত হলো মিঃ সরকার বিষ প্রয়োগের দ্বারাই খুন হয়েছেন এবং তাই যদি হয়ে থাকেন তবে সে বিষ প্রয়োগ কী ভাবে সম্ভব হলো? এইখানেই খুনী চরম বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়েছেন।

তোমার হয়ত মনে থাকতে পারে সুব্রত, খুনের পরদিন সকালে যখন তুমি সবার জবানবন্দী নাও, তখন কয়েকটা কথা যা আমার মনে খটকা লাগিয়েছিল। ১নং হচ্ছে, মিঃ সরকারের হাত ঘড়িটা ভাঙ্গল কী করে? বলেছিলাম ভাঙ্গার ত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন ছিল না? তার কারণ তোমাদের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠেছিল মিঃ সরকার নিশ্চয়ই চেয়ারে যখন অধ্যয়ন করছিলেন, এমন সময় খুনী এসে তাঁকে হার্টে সিরিঞ্জের দ্বারা বিষ প্রয়োগ করে খুন করেছে। তোমাদের 'হাইপথেসিস'ই যদি সত্যি বলে মান, তবে হাত ঘড়িটা তাঁর ভাঙ্গবে কেন? এমন নিশ্চয়ই হতে পারে না যে, খুনী খুন করবার পর ইচ্ছা করেই মিঃ সরকারের হাত ঘড়িটা ভেঙ্গে রেখে গেছে। তবে?

দ্বিতীয় কথা, রাত্রি দেড়টার সময় রামচরণের হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে, মিঃ সরকার চেয়ারেই বসে আছেন। এখন কথা হচ্ছে, শব্দটা কিসের? শব্দটা আর কিছুই নয়। মিঃ সরকার মৃত্যু যন্ত্রণায় খাটের উপর থেকে পড়ে যাওয়ায় ঐ শব্দ হয়।

সুব্রত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, খাটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন! তার মানে?

হ্যাঁ, খাটের উপর থেকেই তিনি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন। এবং পড়বার সময় তাঁর হাত ঘড়িটা ভেঙ্গে যায়। রামচরণের জবানবন্দীর একটা কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না। সে বলেছিল, মিঃ সরকার অনেক রাত্রি পর্যন্ত

boiRboi.net

জেগে পড়শুনা করতেন লাইব্রেরী ঘরে বসে। যতক্ষণ না শুতে যেতেন ঘড়িটা তাঁর হাতেই বাঁধা থাকত। অনেক সময় ঘড়ি হাতে বাঁধাই থাকত, শুয়ে পড়তেন। এর থেকেই প্রমাণ হয়, সে রাত্রে ঘড়িটা তাঁর হাতেই বাঁধা ছিল এবং হয়ত মন খারাপ ছিল বলেই রাত্রে যখন শুতে যান ঘড়িটা হাত থেকে খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। ঐ দুটি কারণ থেকে আমি বুঝেছিলাম, মিঃ সরকার রাত্রে পড়াশুনা সেরে শয্যায় শোবার পর খুনী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে।

কথা হচ্ছে, কী ভাবে খুনী বিষ প্রয়োগ করলে? একটা জিনিস তোমার মনে আছে? মৃত ব্যক্তির বাঁ হাতের বড়ে আঙ্গুলে একটা পট্টি জরানো ছিল। মৃত্যুর দিন সকালে ভাঙ্গা গেলাসের কাঁচের টুকরো তুলতে গিয়ে আঙ্গুলটা কেটে যায়। আঙ্গুলটার ঐ ক্ষতস্থান দিয়েই খুনী বিষ প্রয়োগ করে। বিষের ক্রিয়া শুরু হতেই মিঃ সরকারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণ বিষ 'হাইড্রো-সায়ানিক এ্যাসিডের' ক্রিয়া এত দ্রুত যে, কিছু বুঝবার আগে তাঁর মৃত্যু হয়। এবং ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত বিষের যাতনায় তিনি ছটফট করতে গিয়ে খাট থেকে মাটিতে পড়ে যান। খুনীর মানসিক বল অত্যন্ত বেশী। মুহূর্তে সে মৃতদেহ মাটি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। কিন্তু সে পালাতে পারে না। পাশের ঘরেই আত্মগোপন করে। কেন না, ঠিক সেই সময় শব্দ শুনে রামচরণ ঘরে এসে ডাক দেয়। এবং রামচরণও মিঃ সরকারকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে কোন কিছু সন্দেহ না করে, শব্দটা শোনবার ভুল ভেবে চলে যায়।

রামচরণ চলে যাবার পর খুনী তার প্ল্যান কাজে লাগায়। পাশেই ছিল অশোকের ঘর। সমস্ত প্ল্যান সে আগেই ঠিক করে রেখেছিল। ব্যালকনি দিয়ে অশোকের ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে সিরিঞ্জটা চুরি করে এনে মৃতের হার্টে পাংচার করে। তারপর ঐ পথেই ফিরে গিয়ে অশোকের ঘরে আবার সিরিঞ্জটা রেখে আসে। অশোক তখন ঘুমচ্ছে।

এই সব কাজ শেষ হবার পর তার উর্বর মস্তিষ্কে আর একটা চাল উদয় হয়। সে সব ঘড়িগুলো দুটো বাজিয়ে বন্ধ করে দেয়। যাতে সকলের মনে হয়, রাত্রি দুটোর সময় মিঃ সরকারকে খুন করা হয়েছে।

কিন্তু কেন? ঘড়িগুলোতে দুটো বাজিয়ে রাখবার কারণ কি?

খুনী ঐ সময়টা একটা alibe তৈরী করে রাখে। সে দেখাতে চায়, ঐ সময় সে অন্য জায়গায় ছিল। মৃত ব্যক্তির আশে-পাশে কোথাও ছিল না। কিন্তু সেটা পরের কথা। পরে ভেবে দেখলেই হবে। খুন করবার পর সমস্ত প্ল্যান মত সাজিয়ে রেখে খুনী পালিয়ে গেল কোন্ পথে? এবার সেই আলোচনাই

boiRboi.net

করবো। কিন্তু তারও আগে আমাদের একটা কথা ভেবে দেখতে হবে, খুনী এলো কোন্ পথে ?

তাহলে তুমি বলতে চাও, খুনী বাইরে থেকে এসেছিল ?

ঠিক যতটুকু বলেছি তার বেশী কিছুই আমি বলতে চাই না সুব্রত। বাকীটা তোমাকে ভেবে দেখতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে, কার পক্ষে খুন করা সম্ভব। আগেই তোমাকে একটা কথা বলেছি, যে খুন করেছে সে মিঃ সরকারের পরিচিত এবং সে ঐ বাড়ির সব কিছুর সঙ্গে একান্ত পরিচিত। কিন্তু সে কথা বলবার আগে আমি একটা ছোট-খাটো Experiment করতে চাই। আজ রাত্রে মিঃ সরকারের ঘরে সেই Experiment হবে। বলতে বলতে কিরীটী চক্ষু মুদ্রিত করে সোফায় হেলান দিয়ে নীরব হলো।

॥ পঁচিশ ॥

মিঃ সরকারের শয়ন কক্ষ। রাত্রি দুটো বাজতে আর মাত্র মিনিট পনের ষোল বাকী। মিঃ সরকারের শয়ন কক্ষে সকলেই এসে জমায়েত হয়েছেন। কিরীটি, সুব্রত, তালুকদার, সুবিমল চৌধুরী। মৃত মিঃ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র গগনেন্দ্র, কনিষ্ঠ পুত্র সৌরীন্দ্র, ভাই বিনয়েন্দ্র, ভাগ্নে অশোক, ভৃত্য রামচরণ আর গোপাল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখেই একটা গভীর উত্তেজনার কালো ছায়া যেন থমথম করছে। কিরীটী তার হস্তধৃত জলন্ত সিগারে একটা টান দিয়ে বললে, ভদ্র মহোদয়গণ, কেন আজ এই গভীর রাত্রে আপনাদের এখানে সমবেত করেছি তার জবাব এখনি পাবেন। আপনারা সকলেই মৃত মিঃ সরকারের আত্মীয়। পুলিশের লোকদের ধারণা মিঃ সরকার খুন হয়েছেন। আপনারা প্রত্যেকেই হয়ত হিতাকাঙ্ক্ষী। সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই চান যে হত্যাকারী ধরা পড়ুক। আমি হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেবো।

কিন্তু তার আগে একটা জিনিস আপনাদের দেখাতে চাই। আপনাদের ধারণা মিঃ সরকার যখন চেয়ারে বসে এই লাইব্রেরী ঘরে অধ্যয়নে রত ছিলেন, সেই সময় কেউ তাঁকে সিরিঞ্জের সাহায্যে হার্টে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে। কিন্তু আমার ধারণা, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। বলতে বলতে কিরীটী তালুকদারকে ডাকলেন। তালুকদার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে এসে ঐ ঘরে প্রবেশ করল। তালুকদারের দিকে তাকিয়ে ঘরের সব কয়টি প্রাণীই বিস্ময়ে

যেন হতবাক্ হয়ে গেল! তালুকদার একেবারে নিখুঁতভাবে মৃত মিঃ সরকারের ছদ্মবেশে সুসজ্জিত হয়ে এসেছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তালুকদারকে চোখ টিপে ইসারা করতেই সে গিয়ে মিঃ সরকারের শয্যার পরে শুয়ে পড়ল। তার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে একটা পট্টি বাঁধা।

তালুকদার ঘুমের ভান করে চোখ বুঁজে পড়ে রইল শয্যার পরে। এমন সময় পা টিপে টিপে সুব্রত শয্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে চটপট তালুকদারের আঙ্গুলের পট্টিটা খুলে পকেট থেকে একটা শিশি বের করে কী একটা জলীয় পদার্থ সেখানে ঢেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তালুকদার হঠাৎ যেন চমকে উঠে প্রবল মোড়ামুড়ি দিয়ে ধপ করে খাট থেকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

তখন সুব্রত চকিতে তালুকদারকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরী ঘরে চেয়ারের পরে বসিয়ে দিল। পরে পকেট থেকে সিরিঞ্জটা বের করে যেমন তার বুকে বিঁধতে যাবে, সহসা ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে একজন আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল,আমি, আমিই খুনী! আমাকে গ্রেপ্তার করুন। কিন্তু আমাকে খুন করতে বাধ্য করেছিল কে? 'নেকড়ের থাবা'। হ্যাঁ, নেকড়ের থাবা'! বলতে বলতে বক্তা উঠে দাঁড়াল।

ঘরের সব কয়টি প্রাণীর ব্যাকুল দৃষ্টি তখন যেন তীক্ষ্ণ শরের মতই বক্তার উপরে গিয়ে পড়েছে।

কিরীটী কঠিন আদেশের সুরে বললে, বসুন। ছটফট করবেন না। অধীরও হবেন না। আপনি যে খুনী, তা আমি প্রথম দিনেই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রমাণের অভাব এবং উদ্দেশ্য বা 'মোটিভ' খুব ষ্ট্রং মনে না হওয়ায় আপনাকে সেদিন আমি ধরিনি। দীগেনবাবু, আসুন ঘরের মধ্যে। আসামীর হাতে হাতকড়া লাগান।

দরজায় অপেক্ষমান পুলিশের দারোগা দীগেনবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে অপরাধীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

ঘরের সব কটি প্রাণী যেন বিস্ময়ে একেবারে বোবা বনে গেছে। কারও মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই। একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা যেন সমগ্র ঘরখানির মধ্যে মৃত্যুর মতই থমথম করছে।

boikboi.net

॥ ছাব্বিশ ॥

কিরীটী এবারে সকলকে ধীর গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বললে, এবার আমি আপনাদের সকলকে বলবো, কেমন করে আমি খুনের কিনারা করলাম। এই খুনের ব্যাপারে একটা কুশ্রী চক্রান্ত জট পাকিয়ে আছে এবং সেই চক্রান্তের জের টেনে আমাকে অতীত ইতিহাসের মধ্যে যেতে হবে। কিন্তু তারও আগে আমি বিশ্লেষণ করে বলবো প্রথম দিনই কেমন করে আমার চোখে ধরা পড়ে ছিল, খুন করা কার পক্ষে বেশী সম্ভব। এক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যেকেই মিঃ সরকারের খুনের ব্যাপারে সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কেন না মিঃ সরকারের মৃত্যুতে আপনারা প্রত্যেকেই টাকার দিক থেকে লাভবান হন।

প্রথমেই ধরা যাক্, সে রাত্রে এই বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। সৌরীন্দ্রবাবু, অশোকবাবু, রামচরণ। সর্বপ্রথমেই ধরা যাক, অশোকবাবুর কথা। অশোকবাবু একজন মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট। তাঁর পক্ষে বিষ প্রয়োগ করে মিঃ সরকারকে খুন করা এতটুকুও অসম্ভব ছিল না। উইল অনুসারে তিনি মিঃ সরকারের মৃত্যুতে লাভবান। অশোকবাবু অনায়াসেই নিজের ঘরের ব্যালকনি দিয়ে সৌরীন্দ্রবাবুর ব্যালকনিতে এসে, তারপর সেখান দিয়ে মিঃ সরকারের ব্যালকনিতে এসে মিঃ সরকারকে খুন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, চিরকাল তিনি মামার অনুগ্রহেই লালিত পালিত। তাই মামার মৃত্যুতে তিনি লাভবান হলেও তাঁর পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কেন?

অশোকবাবু তাঁর মামাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি জানতেন, মামার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তিনি পাবেন। এক্ষেত্রে তিনি মামাকে খুন করতে যাবেনই বা কেন? অন্ততঃ কোন বিবেচক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা করে না, এবং মানুষের সাধারণ সাইকোলজিও তা বলে না। তার উপর প্রত্যেকেরই জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে অশোকবাবুর স্বভাব ধীর স্থির ও শান্ত। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, রাত্রে গোপাল এসে তাঁর ঘর থেকে যে সময় থালা নিয়ে যায়, ঠিক সেই সময়েরই কিছু পরে মিঃ সরকার খুন হন। যে লোক একটু পরে খুন করতে যাবে, সে ঐ ভাবে নিশ্চিন্তে খেতে পারে না। কিন্তু তবু তাঁর প্রতি সন্দেহ একটু থেকে যায়। এখানে আমি 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট্' এর পক্ষ নিয়েছি। যা হোক, অশোকবাবুকে বাদ দিলে যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন সৌরীন্দ্রবাবু।

সৌরীন্দ্রবাবুর নিজস্ব জবানবন্দীতে ও অন্যান্য সকলের জবানবন্দী থেকে যতটুকু আমরা জেনেছি, তা থেকে কী প্রমাণ হয়? সৌরীন্দ্রবাবুর পক্ষে তাঁর

boiRboi.net

পিতাকে খুন করা এতটুকুও সম্ভব ছিল না। তার কারণ অনেকগুলো। এবারে সেগুলোই একটার পর একটা আলোচনা করব। প্রথমতঃ, সৌরীন্দ্রবাবু ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। যে টাকা মাসোহারা হিসাবে তাঁর বাপের কাছ থেকে তিনি পেতেন, তা দিয়ে তাঁর হাত খরচ কুলাতো না। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিশাপ ঐখানেই। কোন উপায়েই কোথাও শান্তি নেই। টাকার জন্য তিনি জুয়া খেলতেন, রেসে যেতেন পর্যন্ত। দিনের পর দিন অধঃপতনের পথে নেমেই চলেছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ এগার বৎসর আগে একবার তিনি শিমুল-তলায় বেড়াতে গিয়ে এক বন্ধুর বোনকে বাড়ির সকলের অজান্তে রেজেস্ট্রী করে বিবাহ করেন। বিবাহ করবার দিন ২০।২২ দিন বাদেই তিনি অকস্মাৎ গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েন। শিমুলতলায় উনি ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। কিছু দিন পরে উনি ওঁর স্ত্রীর এক চিঠিতে জানতে পারেন যে ওঁর স্ত্রীর সন্তান হবে, তখন উনি স্ত্রীকে নিয়মিত যে মাসোহারা দিতেন, তাও বন্ধ করে দেন। ওঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মায়।

সহসা এমন সময় গগনবাবু বলে উঠলেন, সে কি সৌরীন্দ্র, তুই বিয়ে করেছিস, এ কথা ত' কাউকে বলিস্ না! আর বিয়ে যখন করেছিলিস, তখন বৌমাকে ঘরে আনিস নি কেন?

সৌরীন্দ্রবাবু একেবারে নিশ্চুপ। একটি কথাও মুখে নেই।

কিরীটী এবারে সোজাসুজি সৌরীন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী সৌরীন্দ্রবাবু, আমার কথা ঠিক না?

হ্যাঁ!

এ কথা এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন কেন?

বাবার বকুনির ভয়ে। আমার স্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ! তাছাড়া আমি নাম ও জাত দুটোই গোপন করে বিবাহ করেছিলাম।

সে যা হোক, আপনি জানেন আপনার স্ত্রী ও কন্যা কোথায়?

স্ত্রী কোথায় আছে তা জানি, কিন্তু ছয় বৎসর হলো কন্যার কোন সংবাদ জানি না।

কন্যার সংবাদ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

করেছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাইনি। শুনেছি ছয় বৎসর আগে কে বা কারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

আপনার এ বিবাহের কথা আর কেউ জানত?

না।

boiRboi.net

না সৌরীন্দ্রবাবু, আপনি ঠিক জানেন না। আরো একজন এ সংবাদ জানত।

কে সে?

আপনার কাকা বিনয়েন্দ্রবাবু! কী বিনয়েন্দ্রবাবু, আপনি জানতেন না?

বিনয়েন্দ্রবাবু কোন জবাব দিলেন না। নিঃশব্দে বসে রইলেন।

আপনার বাবার মৃত্যুর দিন রাত্রে কী ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আপনার বাবার ঝগড়া হয়েছিল সৌরীন্দ্রবাবু!

বাবাকে আমি আমার বিবাহের কথা বলেছিলাম বলে। সেই কথার-ই জের টেনে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। বাবাকে ঐ কথা বলায় বাবা একটা নতুন উইল করেন এবং সে উইলের লেখাপড়া ঐ দিনই শেষ হয়। বিকালে বাবা বলেন, সে উইলে আমার ভাগের সমস্ত সম্পত্তির চার ভাগের তিন ভাগ কাকার নামে ও বাকী এক ভাগ আমার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন।

এতদিন যে কথা গোপন করে রেখেছিলেন, হঠাৎ অবার সে কথা বলতে গেলেন কেন?

'নেকড়ের থাবা' আমাকে ব্ল্যাক মেইল করে আমার জীবনান্ত করে তুলেছিল। তাই খাঁই মেটাতে গিয়ে আমাকে রেস খেলতে হত, জুয়া খেলতে হত। অবশেষে আর না পেরে বাবার কাছে সব কথা স্বীকার করেছিলাম।

হুঁ? ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বলছিলাম, সৌরীন্দ্রবাবুর পক্ষে তাঁর পিতাকে খুন করা খুবই সম্ভব ছিল। তিনি থাকতেন পাশের ঘরে। অনায়াসেই যে কোন সময়ে এসে তাঁর বাবাকে খুন করে আবার তিনি চলে যেতে পারতেন। কিন্তু খুন করবার পদ্ধতি দেখে বোঝা যায়, যে খুন করেছে, সে বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। কিন্তু সৌরীন্দ্রবাবুর পক্ষে ওভাবে খুন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সৌরীন্দ্রবাবু ও অশোকবাবুর মধ্যে কেউ একজন যদি ঐ ব্যালকনি পথে এসে খুন করতেন, তবে দু'জনের একজন জানতে পারতেনই। কথাটা চাপা থাকত না। সৌরীন্দ্রবাবু তাঁর বাবাকে খুন করলে ক্ষতিগ্রস্তই হতেন। মিঃ সরকার থাকলে হয়ত কোনও একদিন তাঁর মত বদলাত। ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসত। সেক্ষেত্রে উনি তাঁর বাবাকে খুন করে সব দিক নষ্ট করতে যাবেন কেন?

এরপর আসা যাক্ রামচরণের কথায়। রামচরণকে এক কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সে বলেছিল, রাত্রি দেড়টার সময় শব্দ শুনে সে ঘরে এসে উঁকি দেয়। সত্যিই যদি সে খুনী হতো, তবে সে অত সহজে ও কথাটা বলতে পারতো না। তাছাড়া মিঃ সরকারের মৃত্যুতে তার যা লাভ, বেঁচে থাকলেও

boiboi.net

তাই। তবে সে পুরাতন মনিবের প্রাণ নিতে যাবে কেন?

এরপর যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুবিমলবাবু, গগনবাবু ও বিনয়েন্দ্রবাবু। সুবিমলবাবুর মুভমেণ্ট সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, রাত্রি দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত তিনি Rainbow club থেকে বের হয়ে পার্ক সার্কাসে এক বিখ্যাত জুয়ার আড্ডায় ছিলেন। গগনবাবু সিনেমা থেকে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তার কারণ, তিনি জেনেছিলেন, তাঁর বাবা আর একথা নতুন উইল করেছেন। সেই সম্পর্কে জানতে, অন্য কোন কারণে নয়। আর রাত্রি সাড়ে বারটায় তিনি বাড়ি ফিরে যান। খুন হয়েছে তার পরে সে কথা ময়না তদন্তেই প্রকাশ হয়েছে। বাকি থাকলেন আমাদের বিনয়েন্দ্রবাবু। বিনয়েন্দ্রবাবুই খুনী, সেকথা প্রমানিত হয়েছে। গোড়া থেকেই আমি বিনয়েন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু কেন?

বিনয়েন্দ্রবাবুর একটা চমৎকার এ্যালিবাই ছিল। সেটা হচ্ছে ঐ রাত্রে তিনি বরাহনগরে বন্ধুর বাসায় বিবাহ উৎসবে মেতে ছিলেন। রাত্রি বারটা পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। আগে থেকেই তাঁর প্ল্যান ঠিক করা ছিল। প্ল্যান অনুযায়ী তিনি ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে বাথরুমের বাইরে অপেক্ষা করেন রাত্রি সাড়ে বারোটার পর তিনি বাথরুম দিয়ে এসে দাদার লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর দাদা তখন লাইব্রেরীর ঘরে বসে পড়ছেন। তিনি পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকেন। গজেনবাবু শয্যায় শুয়ে ঘুমাবার পর বিনয়েন্দ্রবাবু তাঁর দাদাকে বিষ প্রয়োগ করেন। তিনি কিছু দিন ডাক্তারী পড়েছিলেন, ও বি-এস-সি পাশ ছিলেন। কোন্ বিষের কেমন ক্রিয়া তাঁর পক্ষে জানা খুবই সম্ভব। তাই খুন হবার পর মিঃ সরকার যখন শয্যা থেকে মাটিতে পড়ে যান, তাড়াতাড়ি তখন তিনি মৃতদেহ তুলে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে চেয়ারের উপরে বসিয়ে দেন। রামচরণের আসতে একটু দেরী হয়েছিল। তার মধ্যেই বিনয়েন্দ্রবাবু কাজ হাসিল করে আত্মগোপন করেন। রামচরণ ঘরের মধ্যে খুঁজলেই বিনয়েন্দ্রবাবুকে দেখতে পেত।

যা হোক, তারপর বিনয়েন্দ্রবাবু সোজা বারান্দা দিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করেন। অশোকবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তার সিরিঞ্জটা চুরি করে নিয়ে আবার দাদার ঘরে এসে প্রবেশ করেন। এবং মৃতদেহের হার্টে পাংচার করে আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে অশোকবাবুর ঘরে যান এবং সিরিঞ্জটা রেখে আসেন। সকলকে একটা ধোঁকা দেবার জন্য সমস্ত ঘড়িগুলো রাত্রি দুটোর সময় বন্ধ করে নীচের সিঁড়ি দিয়ে যখন পালাতে যান, তখন

BanglaBook.net

গোপালের চোখে পড়ে যান। তাড়াতড়ি আবার উপরে চলে আসেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে তখন যে পথে তিনি এসেছিলেন, সেই পথেই আবার পালাতে হয়। যদিও এতখানি দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল, তার উচিত ছিল লাইব্রেরী ঘরের দরজা দিয়েই বের হয়ে যাওয়া। তাই আমার মনে হয়েছিল, দরজা কেন বন্ধ? ওটা বন্ধ থাকাতো উচিত ছিল না।

আবার তিনি ট্যাক্সীতে করে বরাহনগরে বিবাহ বাড়িতে ফিরে যান ও সকালে ফিরে আসেন। দুটো কারণে তাঁকে আমি সন্দেহ করি। এক নং, খুনের পদ্ধতি ও দু' নং, তিনি নিজে একজন আর্টিষ্ট! তাঁর পক্ষে সুবিমলবাবুর হাতের লেখাটা নকল করে একটা চিঠি লেখা অসম্ভব কিছুই ছিল না। এবং করেও ছিলেন তাই। যাতে সুবিমলের উপর সন্দেহটা পড়ে। কিন্তু কেন তিনি খুন করলেন? টাকার লোভে। সৌরীনের বিবাহের সংবাদে নিজে আত্মগোপন করে 'নেকড়ের থাবা'কে দিয়ে তার সাহায্যে নিজের ভাইপোকে তিনি শোষণ করেছিলেন এবং তিনিই ষড়যন্ত্র করে সৌরীন্দ্রবাবুর মেয়েকে চুরি করেন। ইচ্ছা ছিল, সময় মত সৌরীনের কাছ থেকে ঐ মেয়েকে দিয়ে আরো কিছু শোষণ করবেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র ঘুরে গেল। সব ভেস্তে গেল। অতি লোভে তাতি নষ্ট হলো। তাই আমি সেদিন বলেছিলাম, 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হলো তার এঁড়ে গরু কিনে'।

আমার কাজ শেষ হয়েছে। বিনয়েন্দ্রবাবুকে সুব্রতর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সুব্রত ওঁকে দেবে ধর্মাধিকরণের হাতে তুলে। সেখানে হবে ওঁর বিচার। আর সৌরীনবাবু, আপনার মেয়েটিকে সুব্রত 'নেকড়ের থাবা'র কবল থেকে উদ্ধার করেছে। সে এখন তার মার কাছে। কালই সকালে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। আচ্ছা, আসি। নমস্কার। চল যে, সুব্রত! তালুকদার রইলেন, উনি ওঁর অতিথির সম্বর্ধনা করবেন! বন্ধু, বড় চাল চেলে ছিলে। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে আমি কিরীটী রায়!

---

boiRboi.net

তখন রাত একটা বেজে দশ

মনে নেই, আমার কিছুই মনে পড়ছে না ইনেসপেক্টার—বিষণ্ণ ভাবে আবার মাথাটা নাড়ল স্বর্ণরেণু।

কিছুই মনে করতে পারছেন না মিঃ ঘোষাল? আবার প্রশ্নটা করলেন ইনেসপেক্টার সমীর লাহিড়ী, আর একবার একটু ভাল করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন। সে-রাত্রে আপনি ক্লাব থেকে ফিরলেন—

লিফটে করে তিনতলায় উঠে এলাম।

তারপর? ইনেসপেক্টার লাহিড়ী তাকালেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বর্ণরেণুর দিকে।

পকেট থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের দরজাটা খুললাম—সব অন্ধকার—হাত বাড়িয়ে অন্ধকারেই দেওয়ালের গায়ে সুইচটা খুঁজতে গেছি, বোধ হয় দু'পা এগিয়েছি—হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম—

তারপর?

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাই—

বলুন—থামলেন কেন মিঃ ঘোষাল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম জানি না, জ্ঞান হতে দেখলাম, ঘরের মধ্যে আলোটা জ্বলছে। আর সামনে ঠিক হাত খানেকের ব্যবধানে আমার স্ত্রী রত্নার রক্তাক্ত মৃতদেহটা উপুড় হয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে আছে। হাত দুটো ছড়ানো প্রথমটায় ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল, মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা—

তারপর আপনি কি করলেন?

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খেয়াল হল আমার ডান হাতে ধরা ঐ পিস্তলটা, আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না, বার দুই দেখলাম পিস্তলটা তার পরই—

একটা কথা—তখন আপনার ফ্ল্যাটের সদর দরজাটা খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?

boiRboi.net

বন্ধ ছিল।

হুঁ। তারপর বলুন—

আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গেই লোকাল থানায় ফোন করবার চেষ্টা করি এবং কানেকশন না পেলে লালবাজারে ফোন করি—

আচ্ছা মিঃ ঘোষাল, এই পিস্তলটা বা এ ধরনের কোন পিস্তল আগে আপনি কখনও দেখেছেন?

দেখেছি—আমি বছর পাঁচেক আর্মিতে ছিলাম, তাছাড়া নিজেরও ঠিক অমনি একটা পিস্তল আছে, অবিশ্যি তার লাইসেন্সও আছে?

আপনার একটা পিস্তল আছে? কোথায় সেটা?

আমাদের শোবার ঘরে আলমারির মধ্যে—বলে উঠে দাঁড়াল স্বর্ণরেণু এবং এগোল শোবার ঘরের দিকে। সমীর লাহিড়ী তাকে অনুসরণ করেন, মধ্যবর্তী দরজা পথে দু'জনে শোবার ঘরে এসে ঢোকেন।

বসবার বা লিভিং রুমের চাইতে ঘরটা আকারে বেশ ছোটই। তবে ঘরটি ভাল ভাবে সাজানো। একধারে পাশাপাশি হাত দেড়েক মধ্যবর্তী ব্যবধানে দুটো সিংগল খাট, খাটের বিছানা বেশ দামী বেডকভার দিয়ে ঢাকা, দুটো খাটের মধ্যবর্তী শিয়রের কাছাকাছি একটা ছোট টুলের পরে একটি বিদেশী লাল রংয়ের ফোন।

ঘরের পশ্চিম দেওয়াল ঘেঁষে একটা পাল্লায় আর্সী বসানো প্রমাণ সাইজের স্টীলের আলমারি। অন্য দিকে একটি ছোট ড্রেসিং টেবিল, টেবিলের পরে কিছু দামী কসমেটিক পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো—সমস্ত ঘরটির মধ্যে একটা রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতা। সমীর লাহিড়ী ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একবার সব কিছুর পরে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন।

ড্রেসিং টেবিলের পরেই চাবির রিংটা ছিল—সেটা তুলে নিয়ে একটা চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলল স্বর্ণরেণু এবং আলমারির মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও প্রার্থিত বস্তু পিস্তলটি পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য! পিস্তলটা তো দেখছি না।

পাচ্ছেন না পিস্তলটা আলমারির মধ্যে!

না।

কবে শেষ আপনি আলমারির মধ্যে পিস্তলটা দেখেছিলেন মিঃ ঘোষাল?

কাল বিকেলে বেরুবার আগেও দেখেছি, স্পষ্ট মনে আছে আমার—স্বর্ণরেণু বলল।

মনে করে দেখুন তো মিঃ ঘোষাল, কাল বিকালে বেরুবার সময় পিস্তলটা সঙ্গে

boiRboi.net

নিয়ে যাননি তো—are you sure!

নিশ্চয়ই—

লাইসেন্সটা কই দেখি—

আলমারির মধ্যেই লাইসেন্সটা ছিল, সেটা বের করে স্বর্ণরেণু সমীর লাহিড়ীর হাতে দিল। সমীর লাহিড়ী লাইসেন্সটা দেখলেন, তারপর কি ভেবে তখনো হাতে ধরা পিস্তলটা দেখলেন। স্বর্ণরেণুর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, দেখুন তো মিঃ ঘোষাল, এটাই বোধ হয় আপনার পিস্তল, পিস্তলের নম্বর ও লাইসেন্সের পিস্তলের নাম্বারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—

সে কি!

হ্যাঁ, দেখুন না মিলিয়ে—

স্বর্ণরেণু যেন বোবা—মিথ্যা নয়, সত্যিই দুটো নম্বর এক। কেমন যেন নির্বোধের মত তাকাল স্বর্ণরেণু সমীর লাহিড়ীর দিকে।

সমীর লাহিড়ী বললেন, তাহলে এটাই আপনার পিস্তল—আদৌ খোওয়া যায়নি, আর এটাই আপনার হাতে ছিল? তাহলে—

স্বর্ণরেণু সমীর লাহিড়ীর দিকে তাকাল।

আবার একবার মনে করবার চেষ্টা করুন মিঃ ঘোষাল, পিস্তলটা নিশ্চয়ই কাল বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়েছিলেন, নচেৎ এটা আপনার হাতের মধ্যে এলো কি করে? কি মনে পড়ছে—

না, আমি কোন পিস্তল সঙ্গে নিইনি।

নেননি?

না। উঃ, আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে—তবে কি—আমিই—আমিই রত্নাকে গুলি করে হত্যা করেছি—হয়তো—হয়তো তাই! কিন্তু কখন—কখন গুলি করলাম?

বসুন, বসুন মিঃ ঘোষাল, ব্যস্ত হবেন না। আমি একবারও বলিনি যে আপনি আপনার স্ত্রী রত্নাদেবীকে গুলি করে হত্যা করেছেন—

তবে আমার হাতে আমারই পিস্তলটা কোথা থেকে কেমন করে এলো! আশ্চর্য, লালবাজারে যখন ফোন করি কথাটা একবারও আমার মনে হয়নি—আমি আমিই রত্নাকে তাহলে খুন করলাম! শেষের কথাগুলো কেমন যেন বিড় বিড় করে বলে যায় স্বর্ণরেণু।

মিঃ ঘোষাল—

সমীর লাহিড়ীর ডাকটা যেন স্বর্ণরেণুর কানেই পৌছাল না। সে যেন ডাকটা

boiRboi.net

শুনতেই পায়নি মনে হল।

মিঃ ঘোষাল, শুনছেন—শুনুন, আমি এখন যাচ্ছি, কাল আবার আসব, কেমন। সমীর লাহিড়ী উঠে পড়লেন, পাশের ঘরে ডেডবডিটা একটা চাদরে ঢাকা ছিল মৃতদেহটা সর্বাগ্রে পুলিশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন সমীর লাহিড়ী, তারপর সঙ্গের অফিসার বিদেশ চ্যাটার্জীকে বললেন, মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি এখানে থাকবেন, সর্বক্ষণ স্বর্ণরেণুবাবুকে চোখে চোখে রাখবেন দরজার বাইরে একজন ও গেটে একজন আর্মড পুলিশ থাকবে—আপনার বদলি এলে তবে আপনি যাবেন।

ঠিক আছে স্যার—

ঘরের বাইরে আসতেই স্বর্ণরেণুর ভৃত্য সুধাকরের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন। পাশে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে, লোকটার প্রহরায়।

কি যেন নামটা তোমার?

আজ্ঞে সুধাকর পাড়ুই।

এই ফ্ল্যাটে তো তুমি কাজ কর?

আজ্ঞে—

কত দিন কাজ করছ?

তা আজ্ঞে বছর তিনেক।

তুমি কিন্তু আপাতত পুলিশের বিনানুমতিতে ফ্ল্যাটের বাইরে যাবে না।

যাব না স্যার—

ভিতরে যাও, তোমার সাহেবকে চা দাও, চা তো তিনি এখনো খাননি?

না।

ঠিক আছে ভিতরে যাও, আমি আবার বিকালে আসব, তোমার সাহেবকে মানা করেছি বেরুতে, বেরুতে দিও না—বুঝেছ?

আজ্ঞে—

পরের দিন বিকাল। বিকাশের বদলি অমলেন্দু রায় তখন ডিউটিতে আছে। অমলেন্দু বাইরের ঘরেই ছিল।

অমলেন্দু স্বর্ণরেণুবাবুর খবর কি?

ঘরের মধ্যেই রয়েছেন, কোন সাড়া শব্দ নেই।

খাওয়া দাওয়া করেছেন?

না, এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাননি, কেবল একনাগারে স্মোক করে চলেছেন ভদ্রলোক।

boiRboi.net

ঠিক আছে, তোমার রিলিফ রাত দশটায় আসবে, তারপর তোমার ছুটি।

সমীর লাহিড়ী এসে স্বর্ণরেণুর শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন, একটা চেয়ারে বসে স্বর্ণরেণু দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশব্দে।

মিঃ ঘোষাল—

আপনারা যদি ভেবে থাকেন রত্নাকে আমিই গুলি করে হত্যা করেছি তো আমাকে arrest করছেন না কেন?

আমি তো সে কথা বলিনি—

তবে এমন করে নজরবন্দী করে রেখেছেন কেন!

কেউ তো আপনাকে কোন রকম বিরক্ত করছে না মিঃ ঘোষাল।

But this is torture? যদি মনে করেন আমিই হত্যাকারী—

উত্তেজিত হবেন না, বসুন মিঃ ঘোষাল, আপনার সঙ্গে আলোচনা আছে—

I am tired extremely tired—অত্যন্ত ক্লান্ত আমি।

ঠিক আছে, আমি তাহলে আজ যাচ্ছি—কাল সকালে না হয়—

না না, যা বলতে চান আজই বলুন—বলুন, কি জিজ্ঞাসা করতে চান।

রত্নাদেবীর সঙ্গে আপনার কত দিন হল বিয়ে হয়েছিল?

সাত বছর আগে। কাল ছিল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী—

আপনি তা সত্বেও ক্লাবে গিয়েছিলেন—

উপায় ছিল না।

উপায় ছিল না কেন?

আমি বার বার বলেছিলাম আজকের দিনটা আমাদের একান্ত নিজস্ব থাকবে—কেউ থাকবে না, কেবল রত্না আর আমি, কিন্তু সুচিৎ এলো—

সুচিৎ কে?

আমার বন্ধু—সুচিৎ চৌধুরী, আর্মিতে অফিসার—মেজর—সে এসে কি বলল জানেন মিঃ লাহিড়ী—সারাটা রাত সে আমাদের সঙ্গে কাটাবে—

সে কি জানত না কাল আপনাদের বিবাহবার্ষিকী ছিল?

কেন জানবে না, জানত। ভাল ভাবই জানত।

আপনার স্ত্রী রত্নাদেবী?

সেও সুচিতের কথা শুনে বললে, খুব ভাল হবে, বেশ আনন্দ করা যাবে। আমার সহ্য হল না, ক্লাবে চলে গেলাম।

ক্লাব থেকে কখন ফেরেন?

খুব বেশী ড্রিংক করেছিলাম—ঠিক মনে নেই—তবে জ্ঞান হবার পর দেখি হাতঘড়িটা হাতেই ভেঙে বন্ধ হয়ে আছে—ঠিক একটা বেজে দশ মিনিট।

boikhoi.net

যদি তাই হয় তো আপনি ঠিক রাত একটা দশ মিনিটে ফিরেছেন ফ্ল্যাটে—

মনে হয় তাই—

আচ্ছা আপনি যে বলছিলেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়ে আপনি জ্ঞান হারান। আঘাতটা কোথায় লেগেছিল ?

মাথার পিছনে।

কেটে গিয়েছে ?

না।

ফুলে আছে ?

না।

যন্ত্রণা—

হ্যাঁ, যন্ত্রণা এখনো আছে! বলে স্বর্ণরেণু মাথার পিছনে হাত বুলাতে থাকে। আপনার ঠিক মনে আছে তো মিঃ ঘোষাল—পিছন থেকে কেউ অতর্কিতে আপনার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করেছিল—

মনে থাকবে না কেন ?

না, বলছিলাম কি ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা স্বপ্নও তো হতে পারে।

মানে—কি বলতে চান আপনি—সব কিছু আমার একটা স্বপ্ন !

ঠিক আছে, ও কথায় আমরা পরে আবার আসব। এখন আপনার কিছু পারসোনাল মানে ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দিন মিঃ ঘোষাল। মেজর চৌধুরী আপনার বন্ধু—আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

সুচিৎ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—তার আবার কি প্রয়োজন হল আপনার সঙ্গে দেখা করবার ?

আপনার দুর্ঘটনার কথাটা আজকের কাগজে পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মেজর চৌধুরী—আপনার সম্পর্কে তিনি—

কি বলেছে সুচিৎ ?

আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি আদৌ বনিবনা ছিল না। এবং যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে সেদিন বিকেলের দিকে নাকি আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল।

সুচিৎ বলেছে—

তাই তো বলছিলেন—কথাটা কি সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি।

কি ব্যাপারে তর্কাতর্কি হয়েছিল আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ?

boiRboi.net

প্রশ্নটা একান্ত ব্যক্তিগত—ক্ষমা করবেন আমাকে মিঃ লাহিড়ী, আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না।

বেশ। তা আপনাদের মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরে যে মনোমালিন্য চলছিল এ কথাটা তো সত্যি।

সত্যি।

মনোমালিন্যের কারণটা কি ?

হঠাৎ বলে ওঠে স্বর্ণরেণু, ঐ সুচিৎ—সুচিতের জন্যই—

উনি বললেন না আপনার অনেক দিনের বন্ধু ?

বন্ধুই বটে। লোকটা শুধু ইতরই নয়—নোংরা টাইপের।

মনে হচ্ছে আপনার তার ওপর খুব রাগ—

রাগ ? সুযোগ পেলাম না, নচেৎ দুজনকেই আমার একসঙ্গে গুলি করে শেষ করে দেবার ইচ্ছা ছিল।

সেদিনও আপনি ঐ ধরণের একটা কথা বলেছিলেন—তাই না ?

হ্যাঁ—বলেছিলাম। ইনেসপেক্টার আপনি জানেন না, আমার পারিবারিক জীবনটা ও একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে—

আচ্ছা মিঃ ঘোষাল, এ কথা কি সত্যি, আপনারা পরস্পরকে ভালবেসেই একদিন বিবাহ করেছিলেন ?

হ্যাঁ, শুধু তাই নয়—আমার মা'র অমতেই রত্নাকে আমি বিবাহ করেছিলাম।

আপনি সেদিন বলছিলেন পাঁচ বছর আপনাদের বিবাহ হয়েছে—

হ্যাঁ—

আর একটা কথা মিঃ ঘোষাল, বিবাহের আগে কি আপনাদের, মানে আপনার স্ত্রী রত্নাদেবীর সঙ্গে আপনার ঐ বন্ধু মেজর চৌধুরীর আলাপ ছিল ?

ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই সুচিতের সঙ্গে ওর আলাপ ছিল।

আলাপ ছিল তাহলে—

হ্যাঁ, ওরা তো সম্পর্কে ভাই বোন ছিল।

ভাই বোন !

হ্যাঁ, মাসতুতো ভাই বোন—স্বর্ণরেণু মুখটা বিকৃত করে।

সমীর লাহিড়ীর ব্যাপারটা কিন্তু দৃষ্টি এড়ায় না।

মিঃ লাহিড়ী, আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন ?

কি বলুন—

আমাকে এভাবে সর্বক্ষণ নজরবন্দী করে রেখেছেন কেন আপনারা ? সত্যিই

BoiRboi.net

যদি আমাকে আপনারা আমার স্ত্রীর হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করেন—well, tell me frankly—তাছাড়া আমি তো আপনাকে বলেছি, সে-রাত্রে দরজাটা চাবি দিয়ে খোলার পর কি ঘটেছে কিছুই আমার স্মরণ নেই, মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত—

না, কোন আঘাতই আপনি পাননি মাথায়—

পাইনি!

না। কারণ যে ধরণের আঘাতে মানুষ জ্ঞান হারাতে পারে সে ধরণের কোন আঘাত আপনি সে রাত্রে মাথায় পেলে অন্তত তার কোন চিহ্ন আপনার মাথায় বা ঘাড়ে থাকত—কাটেওনি, ফুলেও নেই—সে-রাত্রে আপনি অত্যধিক মাত্রায় ড্রিংক করেছিলেন, ব্যাপারটা তারও একটা হ্যাঙ্গ-ওভার হতে পারে।

ড্রিঙ্ক সে-রাত্রে আমি নতুন করিনি ইনেসপেক্টার। আজ সাত আট বৎসর ড্রিঙ্ক করছি—কখনও কেউ আমাকে ডাউন হতে দেখেনি। এক নাগাড়ে বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করেও পেগু থেকে রেঙ্গুন আমি যুদ্ধের চাকরির সময় ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম। আমি সে-রাত্রে যখন ক্লাব থেকে ফিরি তখন আমার জ্ঞান টনটনে ছিল। আর আঘাতের কথা যেটা বলছি সেটা ফ্যাক্টই—স্বপ্ন বা কল্পনা নয়। অবিশ্যি সে-রাত্রের সব কথা আমার মনে নেই।

মিঃ ঘোষাল, আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রী রত্নাদেবী অন্তঃসত্বা ছিলেন?

What! কি বললেন—She was pregnant!

হ্যাঁ।

ময়নাতদন্তে সেটা জানা গিয়েছে—মাস তিনেক—আপনি জানতেন না?

না। তাছাড়া আমার যখন ২৮।২৯ বৎসর বয়স—আমার একটা Car Accident হয়েছিল। সাত দিন unconscious হয়েছিলাম হাসপাতালে। বিয়ের ৩।৪ বৎসরেও যখন আমাদের কোন 'ইস্যু' হল না—ডাক্তারের পরামর্শ চাই, ডাক্তার তখন নানা ভাবে পরীক্ষা করে আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন আমি কোন দিনই সন্তানের পিতা হতে পারব না। মূলে ঐ সেই এ্যাক্সিডেন্ট।

আপনার স্ত্রী কথাটা জানতেন?

না। জানত না, তাকে আমি কোন দিনই কথাটা জানাইনি।

কেন?

ওর মনটা ভেঙে যেত। কারণ আমি জানতাম ও সন্তান চায়, মা হবার একটা তীব্র আকাঙ্খা ওর মধ্যে আছে। তাই আরও কখনো কথাটা ওকে বলতে পারিনি। কিন্তু একটু আগে আপনি যা বললেন তা যদি সত্যিই হয় তাহলে—তাহলে—

boiRboi.net

কি তাহলে ?

আমার অনুমানটা মিথ্যা নয়—গত বৎসর খানেক ধরে যে ভয়টা আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে—একটা গোপন ক্ষতের মত আমার বুকের মধ্যে রক্ত ঝরিয়েছে—

আপনি কি আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন ? হঠাৎ প্রশ্ন করলেন সমীর লাহিড়ী।

না না, আমি জানি রত্না আমাকে ভালবাসত—আর সে ভালবাসা যে কত গভীর ছিল—

তবে মনোমালিন্যের কারণ কি আপনাদের মধ্যে ?

বলতে পারব না। জিজ্ঞাসা করবেন না। শুনুন সত্যিই যদি আপনারা আমাকে রত্নার হত্যাকারী বলে মনে করেন তো আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

মিঃ ঘোষাল—

এখন মনে হচ্ছে হয়তো আমিই—আমিই সে-রাত্রে রত্নাকে গুলি করে হত্যা করেছি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হয়তো এই, এই দুটো হাতেই তাকে—কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল স্বর্ণরেণু। চোখের সামনে নিজের দুটো হাত প্রসারিত করে বারবার দেখতে লাগল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি তো তাকে সত্যি সত্যিই কত দিন হত্যা করতে চেয়েছি—হঠাৎ কখনও ঘুম ভেঙে গেলে মধ্য রাত্রে পাশের খাটে ঘুমন্ত রত্নার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে এই তো সুযোগ, ওর গলাটা যদি দু'হাতের দশ আঙুলে টিপে ধরি—ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে—কেউ জানতে পারবে না—

স্বর্ণরেণুর গলার স্বরটা যেন কেমন বিকৃত হয়ে ওঠে, কাঁপতে থাকে ওর সারাটা দেহ—মিঃ লাহিড়ী, আমি—আমিই হত্যা করেছি আমার স্ত্রীকে।

মিঃ ঘোষাল, শুনছেন—

হ্যাঁ—সে-রাত্রে আমি ফিরে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুললাম পকেট থেকে চাবি বের করে—তারপর ঘরের আলো জ্বালালাম, পাশের ঘরে ঢুকলাম, হ্যাঁ, স্পষ্টই মনে পড়ছে—চাবি দিয়ে আলমারী খুলে পিস্তলটা বের করলাম, হঠাৎ সে সময় ওর ঘুম ভেঙে গেল—ঘুম ভেঙে উঠে বসে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, আমি গুলি করলাম। উঃ—দু'হাতে স্বর্ণরেণু মুখ ঢাকল।

boiRboi.net

॥ দুই ॥

সুচিৎ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন সমীর লাহিড়ী।

মানুষটি লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি, বলিষ্ঠ গড়ন—ইউরোপীয়ানদের মত টকটকে ফরসা রঙ। সুশ্রী—রীতিমত সুশ্রী দেখতে।

আমি তো আপনাকে বলেছিলামই মিঃ লাহিড়ী, আমার স্থির বিশ্বাস স্বর্ণরেণুই রত্নাকে গুলি করে হত্যা করেছে—

আপনি সেদিন বলেছিলেন ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক দিন ধরেই মন কষাকষি চলছিল। বলতে পারেন ওদের মন কষাকষির কারণটা কি?

তা ঠিক বলতে পারব না, তবে এটা জানি, রত্নার মনে এতটুকু সুখ ছিল না।

রত্নাদেবী সে কথা কখনো কি আপনার কাছে বলেছেন?

না, তা অবিশ্যি বলেনি, অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির মেয়ে ছিল রত্না—বুক ফেটে গেলেও কখনও কাউকে কিছু বলত না।

তাহলে আপনি জানলেন কি করে যে তার মনে কোন সুখ ছিল না।

তার কথাবার্তা থেকেই মনে হত—

কি ধরণের কথাবার্তার কথা আপনি বলছেন?

আমি রত্নার মুখে কিছু শুনিনি বটে, তবে স্বর্ণরেণু একদিন আমাকে বলেছিল সে ডিভোর্সের কথা ভাবছে—

ডিভোর্স!

হ্যাঁ, রত্নাকে সে মুক্তি দিতে চায়।

ডিভোর্সের কোন কারণ ছিল কি?

সে রকম কিছু বলেনি স্বর্ণরেণু, কেবল বলেছিল সে ডিভোর্সের কথা ভাবছে।

আচ্ছা মেজর চৌধুরী, আপনি কি জানেন, মৃত্যুর সময় রত্নাদেবী তিনমাস অন্তঃসত্বা ছিলেন?

অন্তঃসত্বা! কথাটা বিস্ময় চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল মেজর চৌধুরী।

হ্যাঁ, তার পেটে বাচ্চা ছিল। আপনি তাহলে কথাটা জানতেন না?

না। স্বর্ণরেণু নিশ্চয়ই জানত?

না। স্বর্ণরেণুও জানত না।

আশ্চর্য! অথচ সে তার স্বামী—

boiRboi.net

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বর্ণরেণুকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন—স্বর্ণরেণু ঘোষাল সুস্থ নন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনি, তাই বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে

বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসাধীন রাখবার জন্য।

সেই পরামর্শ অনুসারে সরকারী হাসপাতালে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দাসগুপ্তর চিকিৎসাধীনে তাকে রাখা হয়েছিল একটা কেবিনে।

যদিও পুলিশ তাকে স্ত্রীর হত্যাকারী হিসাবে এ্যারেস্ট করে সর্বক্ষণের জন্য প্রহরাধীন রেখেছিল।

কেবিনের বাইরে সর্বদা দুজন সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছিল।

স্বর্ণরেণুর মধ্যে কিন্তু কোন ভাব বৈলক্ষণ্য নেই। সে কেবিনের মধ্যে সর্বদা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে। প্রত্যহ ডাক্তার দাসগুপ্ত এসে একবার করে দেখে যান।

মিঃ ঘোষাল, কেমন আছেন?

আমার বিচার শুরু হচ্ছে না কেন? স্বর্ণরেণু শুধায়।

কিসের বিচার? ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন।

আমি আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছি। একজন হত্যাকারীর বিচার।

সময় হলেই শুরু করা হবে বিচার।

কবে, কত দেরী আছে তার?

আপনি আগে সুস্থ স্বাভাবিক হোন।

আমি তো সুস্থ স্বাভাবিক আছি, বিশ্বাস করুন, আমি সব মনে করতে পারি সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। না মনে থাকলে আমি বললাম কি করে যে আমিই রত্নাকে গুলি করে খুন করেছি—

কিন্তু কেন—কেন নিজের স্ত্রীকে আপনি খুন করলেন?

খুন করা ছাড়া আর আমি কি করতে পারতাম বলুন ডাঃ দাসগুপ্ত?

আপনি তো আপনার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন, তবে হঠাৎ তাকে খুন করতে গেলেন কেন?

জানি না।

আপনার তো সব কথা স্পষ্ট মনে আছে, মনে করে দেখুন না কেন খুন করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে। খুনের কারণ না থাকলে কি কেউ খুন করে?

ছিল হয়তো একটা কারণ, কিন্তু মনে পড়ছে না।

কাল রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছিল?

হয়েছিল, তবে সেই disturbed sleep! সেই দুঃস্বপ্নটা—রত্নার রক্তাক্ত মৃতদেহটা আমার সামনে উবুড় হয়ে পড়েছিল, দেহটা উল্টে দিতেই—

কি?

দেখলাম রত্না একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সেই দুটো চোখ আমার যেন প্রশ্ন করছে—কেন, কেন তুমি আমাকে হত্যা করলে? পারি না ডাঃ দাসগুপ্ত, আমি পারি না তার প্রশ্নের জবাব দিতে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে দরজার দিকে তাকায় স্বর্ণরেণু।

কি দেখছেন?

কে যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বর্ণরেণুর কথাটা মিথ্যা নয়, দরজার পর্দা সরিয়ে একটি তরুণী কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল। তার পশ্চাতে ইনেসপেক্টার সমীর লাহিড়ী।

স্বর্ণরেণুদা—

তুমি রত্না, তুমি—তুমি কোথা থেকে এলে! তুমি কি তাহলে বেঁচে আছ! রত্না রত্না—

তরুণীর বয়স আঠাশ-উনত্রিশ হবে। রোগা পাতলা চেহারা। সুশ্রী দেখতে। তরুণী বললে, কি হল, চিনতে পারছ না আমাকে—আমি শ্রীলা।

শ্রীলা—

হ্যাঁ। কি—চিনতে পারছ না? শ্রীলা বললে।

সমীর লাহিড়ী বললেন, আপনার স্ত্রীর যমজ বোন শ্রীলা, চিনতে পারছেন না?

শ্রীলা—

হ্যাঁ—শ্রীলা। চিনতে পেরেছেন?

জানো শ্রীলা, আমি আমি—রত্নাকে খুন করেছি—

হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমি জানি তুমি রত্নাকে খুন করনি।

করেছি করেছি। দেখল না ওরা আমাকে ধরে এখানে বন্দী করে রেখেছে—আমার বিচার হবে। বিচারে ফাঁসী হবে—বিচারে হত্যাকারীর ফাঁসীই হয়—জানো না?

তুমি রত্নাকে হত্যা করনি।

করিনি! তবে ওরা যে বলছে—

বলুক না, যে যা খুশি বলুক।

কিন্তু আমার হাতে পিস্তল ছিল—

পিস্তল হাতে থাকলেই কি কেউ খুন করে নাকি?

জজ সাহেব বিশ্বাস করবে না। দেখে নিও, আমার ফাঁসীই হবে। আমি জানি আমার ফাঁসী হবে। কথাগুলো বললে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল স্বর্ণরেণু। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কেবিনের জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে রইল।

boiRboi.net

জানালা দিয়ে দেখা যায় গুলমোহরের গাছটা—অজস্র লাল ফুলে যেন লালে লাল হয়ে আছে। ডাঃ দাসগুপ্ত সকলকে ইশারা করলেন বাইরে চলে যেতে।

সকলে বাইরে চলে গেল।

স্বর্ণরেণু তখনো একদৃষ্টে সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে—

কনকনে ঠাণ্ডা শীতের রাত। বিরাট হাতপাতালটা একেবারে স্তব্ধ।

নীচে হসপিটাল কমপাউণ্ডটা দেখা যাচ্ছে। নির্জন—একেবারে খা-খা করছে। একটা এ্যাম্বুলেন্স মেইন গেট দিয়ে প্রবেশ করে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

বাথরুম থেকে বের হয়ে কেবিনের দরজা দিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল স্বর্ণরেণু। রাতের প্রহরী টুলটার ওপরে বসে বসে ঢুলছে।

পা টিপে টিপে সন্তর্পণে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে হেঁটে চলল স্বর্ণরেণু। পরণে একটা পায়জামা আর স্লিপিং কোট।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। সেখান থেকে হসপিটাল কমপাউণ্ডে।

দ্রুত পায়ে কমপাউণ্ড পার হয়ে এসে রাস্তায় পড়ল।

একটা প্রাইভেট কার ছুটে গেল সামনে দিয়ে।

হন হন করে হেঁটে যান স্বর্ণরেণু। কনকনে শীতের মধ্য রাত্রি।

হরিশ মুখার্জী রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে—গুরদোয়ারা—হরিশ পার্ক—মিত্র ইনস্টিটিউশন—বলরাম বোস ঘাট রোড—হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তা—তারপর পুবমুখো—হাজরা রোড—ডাইনে চলল—বাঁয়ে মনোহর পুকুর রোড—ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক—এগুচ্ছে এগুচ্ছে স্বর্ণরেণু। গড়িয়াহাট রোড—বাঁয়ে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বেল—বেলটা কোথায়—এই যে কলিং বেলটা—টিপতেই প্রথমটা ডিং ডং ডিং ডং আওয়াজ।

ডিং ডং বেলের শব্দে কিরীটীর ঘুম ভেঙে যায়।

এত রাত্রে কে আবার এলো!

ঠাকুর নাক ডাকছে—পল্টীও নাক ডাকছে—জংলীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

জংলীই এসে দরজাটা খুলে দেয়—কে?

আমি। কিরীটী বাবু আছেন?

এত রাত্রে দেখা হবে না।

হবে। নচেৎ কাল ওরা আমাকে ফাঁসী দেবে—

সিঁড়ির মাথায় কিরীটীর গলা শোনা গেল।

boiRboi.net

জংলী, ওকে ওপরে নিয়ে আয়—

জংলীর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কিরীটীর নির্দেশে বললে, আসুন।

আমাকে বাঁচান মিঃ রায়, একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। help me! please help me!

আপনি স্থির হয়ে বসুন, আপনি কাঁপছেন—

ওরা আমায় ফাঁসী দেবে।

ফাঁসী দেবে! কারা?

জজ হুকুম দিলেই আমাকে ফাঁসী দেবে। আমি জানি আমার ফাঁসী হবে।

কেন, আপনাকে ফাঁসী দেবে কেন?

আমি যে রত্নাকে হত্যা করেছি—গুলি করে হত্যা করেছি—

কে রত্না?

আমার স্ত্রী—

আপনি আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন?

হ্যাঁ, হত্যা করেছি। হত্যাকারীর বিচারে ফাঁসীই হয়। আইন তাই বলে।

একটু কফি খাবেন?

কফি?

হ্যাঁ—বসুন। আমি কফি দিতে বলি। কফি খেয়ে আগে একটু সুস্থ হোন তার পর আপনার কথা শুনব!

জানেন মিঃ রায়, আমি হাতপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি—

পালিয়ে এলেন কেন হাসপাতাল থেকে?

না পালিয়ে এলে ওরা ঠিক আমাকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দিত। আপনি জানেন না। ওরা ঠিক আমাকে ফাঁসী দিত।

বসুন, আগে একটু কফি খেয়ে নিন, তারপর আপনার সব কথা শুনব—কথাটা বলে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আরো আধঘণ্টা পরে—

ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে রাত দুটো ঘোষণা করল।

কিরীটী আর স্বর্ণরেণু মুখোমুখি বসে।

কিরীটী দেখছিল চেয়ে চেয়ে স্বর্ণরেণুকে, চোখে মুখে একটা ক্লান্ত হতাশ।

কিরীটী বলছিল, আপনি আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন বলছেন?

ঠিক হত্যা করেছি কিনা রত্নাকে জানি না মি রায়, তবে হত্যাই যদি না

boiRboi.net

বানানো অলীক কাহিনী বললেই তো হবে না। কিরীটী বললে, সেটা প্রমাণ করতে হবে।

ওরা ঠিক প্রমাণ করে দেবে। আপনি জানেন না, ওরা সব পারে।

আচ্ছা স্বর্ণরেণুবাবু, পুলিশকে ফোন করে আপনিই তো ডেকেছিলেন সে রাত্রে?

হ্যাঁ আমিই—আমি ছাড়া আর কে ফোন করবে। প্রথমে লোকাল থানায় ফোন করি—কানেকশান না পেয়ে লালবাজারে করি।

সে সময় বাড়িতে বুঝি আর কেউ ছিল না?

না।

চাকর-বাকর কেউ ছিল না?

ছিল। কিন্তু তাকে দেখিনি।

লোকটা সাধারণত কোথায় থাকত?

রান্নাঘরে—মানে কিচেনেই থাকত রাত্রে।

কতদিন কাজ করছে সে?

তা বছর চারেক তো হবেই, খুব বিশ্বাসী।

সে কি বলছে?

তার তো আর পাত্তাই নেই—

মানে?

আজ পর্যন্ত তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

হুঁ। তাহলে সে সময় আপনি একাই ছিলেন ফ্ল্যাটে?

হ্যাঁ। তারপর পুলিশ এলো, জেরার জেরায় আমাকে দিয়ে কনফেস করালো যে, আমিই আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছি।

আপনি কনফেস করলেন?

না করে কি করি বলুন।

আচ্ছা, চাকরটার বাড়ির ঠিকানা জানেন?

পুলিশ আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তার সন্ধানে মেদিনীপুরে লোক পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির লোক তার কোন সন্ধানই জানে না।

স্বর্ণরেণুবাবু, আমার একটা কথা শুনবেন?

কি কথা?

আপনি সটান হাসপাতালে চলে যান।

না না, ওরা আমাকে ফাঁসী দেবে।

boiRboi.net

না, দেবে না।

আপনি জানেন না, they are determind.

ঠিক আছে—চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দোব।

না।

আমি বলছি আপনার কোন ভয় নেই, পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে আমি কথা বলব।

বলবেন ?

হ্যাঁ বলব, আপনি বসুন আমি আসছি—

কিরীটী উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং মিনিট দশেক বাদে ঘরে ঢুকে দেখল স্বর্ণরেণু সোফাটার ওপর বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে তার। কিরীটীর একবার মনে হয়েছিল ভদ্রলোককে ডেকে জাগাবে আবার কি যেন ভেবে জাগাল না। সামনের সোফাটার পরে বসল।

সত্যি, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যেমন অদ্ভুত তেমনই বিচিত্র।

ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে পিস্তলের গুলি চালিয়ে নাকি হত্যা করেছেন বলছেন। বলছেন বটে তবে স্থিরনিশ্চিত নন। যদি সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে হত্যা করে থাকেন তাহলে যে গল্পটা বলছেন সবটাই আগাগোড়া বানানো।

বানানো হলেও সবটা কেমন শিথিল এলোমেলো।

যেন কেমন অসংলগ্ন বলে মনে হল। আর তা যদি না হয়—ঘটনাটা যদি সত্যি হয়—তো ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সত্যি সত্যিই হত্যা করেননি।

কিন্তু সর্বাগ্রে সমীর লাহিড়ীকে একটা ফোন করা একান্ত প্রয়োজন।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল।

লালবাজার থেকে বললে, সমীর লাহিড়ী তার কোয়ার্টারে—সেখানে ফোন আছে—নাম্বারটাও দিয়ে দিল।

কিরীটী আবার ফোন করল।

অন্য প্রান্ত থেকে ভারী পুরুষের গলা কানে এলো—ইনেসপেক্টার লাহিড়ী।

মিঃ লাহিড়ী আমি কিরীটী রায়।

মিঃ রায় এত রাত্রে! কি খবর ?

boi.net

আপনার কাছে! ব্যাপারটার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়।

কিরীটী সংক্ষেপে ঘটনাটা যা ঘটেছে বলে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, ইচ্ছা করলে আপনি আমার বাসায় চলে আসতে পারেন।

যাব বলছেন

হ্যাঁ আসুন, নিয়ে যান। তবে একটা কথা বলব ভাবছিলাম—

কি কথা বলুন না।

ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন না।

কিন্তু ভদ্রলোক যে মেণ্টালি অসুস্থ—

ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নজরবন্দী রাখুন সম্ভব হলে—

সে তো বড়কর্তার এবং কোর্টের পারমিশান ছাড়া সম্ভব নয় মিঃ রায়—

আগে নিয়ে যান, তারপর সব ব্যবস্থা করুন। তবে এটুকু আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি, উনি পালাবেন না। অন্তত আমার তাই ধারণা।

কিন্তু—

শুনুন মিঃ লাহিড়ী, হত্যারহস্যের সত্যিকারের মীমাংসা যদি করতে চান তবে ওকে হাসপাতালে রাখবেন না। ওর বাড়িতেই থাকতে দিন, আর নজরবন্দী না করে রাখলেই বোধ হয় ভাল হয়—

ওর সব কথা আপনি শুনেছেন?

মোটামুটি শুনেছি।

ভদ্রলোক কখনো বলছেন উনি হত্যা করেননি—আবার কখনো বলছেন উনি ওর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছেন। তবে ওর মাথায় আঘাত পাওয়াটা মনে হয় একটা কল্পনা বা ইচ্ছাকৃত বানানো মিথ্যা কাহিনী।

মিঃ লাহিড়ী কথাগুলো ওর কিছুটা অসংলগ্ন ঠিকই, কিরীটী বললে, তবে বানানো নাও হতে পারে।

ও কথা কেন বলছেন?

আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন কেন ওকথা আমি বলছি —যাক, আপনি কি আসছেন?

হ্যাঁ আসছি।

ইনেসপেক্টার লাহিড়ী কিরীটীর গৃহে এসে যখন পৌঁছালেন স্বর্ণরেণু ঘোষাল তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমাচ্ছেন দেখছি—কখন থেকে ঘুমাচ্ছেন?

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হল—দেখছেন কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন ভদ্রলোক?

boiRboi.net

কিরীটী বললে।

অথচ হসপাতালের রিপোর্ট গত কুড়ি দিন ভদ্রলোকে না দিনে না রাত্রে ঘুমিয়েছেন। আমি অবিশ্যি বিশ্বাস করিনি—সমীর লাহিড়ী বললেন।

কিরীটী সমীর লাহিড়ীর কথার কোন জবাব দেয় না।

সমীর লাহিড়ী আবার বললেন, আমার মনে সামান্য যে সন্দেহটুকু ছিল এখন আর তাও রইল না মিঃ রায়, স্বর্ণরেণু ঘোষালই তার স্ত্রী রত্না ঘোষালকে হত্যা করেছে। এখন বুঝতে পারছি, উনি ওর মানসিক ভারসাম্যও সেইজন্যই হারিয়েছেন—

অসম্ভব নয় কিছুই—কিন্তু যাক্ সে কথা, আপনি ওকে নিয়ে এখন কি করবেন?

আবার হাসপাতালেই নিয়ে যাব—ডাঃ দাসগুপ্তর ট্রিটমেণ্টে উনি বর্তমানে আছেন, আরো কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে আর কি।

হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো ভাল করবেন না মিঃ লাহিড়ী।

ঘুম ভাঙল স্বর্ণরেণুর আরো ঘণ্টা খানেক পরে।

ঘুম ভেঙে সামনে ইনেসপেক্টার লাহিড়ীকে দেখে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায় স্বর্ণরেণু ঘোষাল। লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে কিরীটীর দিকে তাকাল।

উনি আপনাকে নিতে এসেছেন মিঃ ঘোষাল—কিরীটী বললে।

স্বর্ণরেণু ঘোষাল উঠে দাঁড়াল, শান্ত গলায় বললে, চলুন।

ইনেসপেক্টার লাহিড়ী বললেন, চলুন, নীচে ভ্যান আছে—

স্বর্ণরেণুকে নিয়ে ইনেসপেক্টার লাহিড়ী চলে যাবার পর কিরীটী উঠে গিয়ে ফোন করল।—আই. জি. আছেন?

কথা বলছি—অন্য প্রান্ত থেকে সৌমেন সোম আই. জি-র গলা ভেসে এলো।

আমি কিরীটী রায়—

সুপ্রভাত। তা হঠাৎ এই শেষ রাত্রে কি মনে করে রায়মশাই?

মাসখানেক আগে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা মাল্টি-স্টোরিড বিলডিংয়ের তিনতলার ৪৬ নম্বর ফ্ল্যাটে যে একজন ভদ্রমহিলা মার্ডার হন, কেসটা—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তার স্বামীকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে সে ব্যাপারে। তবে তার মাথার কিছু গোলমাল হওয়ায় তাকে পুলিশ হাসপাতালে একটা কেবিনে সর্বক্ষণ প্রহরায় রাখা হয়েছে।

জানি। সেই ভদ্রলোক অনেক রাত্রে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন।

পালিয়ে এসেছিলেন!

হ্যাঁ, আমি ইনেসপেক্টার লাহিড়ীকে ফোন করায় তিনি একটু আগে এসে

boiboi.net

আসামীকে নিয়ে গিয়েছেন।

মনে হচ্ছে রায়মশাই, আপনি কেসটা সম্পর্কে interested.

ঘটনাচক্রে সেই রকমই দাঁড়িয়েছে আমি—একটা অনুরোধ আপনাকে করব ভাবছিলাম।

নিশ্চয়ই। বলুন।

ওকে হাসপাতালে না রেখে ওর বাড়িতেই বা অন্য কোন বাড়িতে সতর্ক প্রহরায় কি রাখা যায় না?

বিচারাধীন আসামী তা হোক কোর্টের একটা পায়মিশান করিয়ে হয়তো রাখা যেতে পারে কিন্তু কেন বলুন তো?

আমার মনে হয় মানে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে হল ওর স্ত্রীকে হয়তো উনি হত্যা করেননি—

আপনার তাই ধারণা?

মানে অনুমান—

কিন্তু ভদ্রলোক নিজের মুখেই তো এক প্রকার স্বীকার করেছেন যে তিনিই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু সে ব্যাপারেও ভদ্রলোকের মনে একটা সন্দেহ আছে—

আমার কিন্তু মনে হয় উনি যা বলেছেন সেটার সবটুকু বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কেন?

বিশ্বাসযোগ্য এই জন্য নয় যে, উনি যা বলেছেন তা যদি সত্যিই হত তাহলে ওর মাথায় বা ঘাড়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নিশ্চয়ই থাকত, এবং ডাক্তারের রিপোর্টেও সে রকম কোন কিছুর ফাইণ্ডিংস নেই। ওকে পরে ডাক্তারকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করানো হয়েছিল—

কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যে উনি যা বলছেন সেটা পুরোপুরিই ওর মনগড়া একটা কাহিনী? আমার কিন্তু তা মনে হয় না মিঃ সোম, আমার বরং মনে হয় সমস্ত কিছুর ভিতরে কোথায় যেন একটা রহস্য জট পাকিয়ে আছে। তাছাড়া উনি যে ওর স্ত্রীকে হত্যা করবেন তার একটা কারণ—মানে motive তো থাকা দরকার।

মোটিভ তো ছিলই, আপনি বরং একবার আসুন সকালের দিকে সবকিছু আলোচনা করা যাবে।

ঠিক আছে, যাব।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

boiRboi.net

আই. জি. মিঃ সোমের বাড়িতে বসেই আলোচনা হচ্ছিল।

কিরীটী আর মিঃ সোম।

মোটিভের কথা যেন তখন কি বলছিলেন মিঃ সোম?

স্বর্ণরেণু ঘোষাল তার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন

সন্দেহ করতেন!

হ্যাঁ—রত্নাদেবীর মাসতুতো ভাই মেজর সুচিৎ দাশকে নিয়ে—এবং তা নিয়ে ওদের প্রচণ্ড মন কষাকষি একটা চলছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। যেদিন দুর্ঘটনাটা রাত্রে ঘটে সেই দিন বিকেলের দিকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি ও রাগারাগি হয়।

তারপর? কিরীটি প্রশ্ন করল।

সোম বললেন, সেদিন নাকি স্বর্ণরেণু ঘোষাল বলেছিলেন তোমার ওই ভাই যদি এখানে আসা না বন্ধ করে তো আমি দুজনকেই গুলি করে মারব—

কে বলেছে কথাটা? কার কাছে শুনলেন?

মেজর দাশই বলছিলেন।

সেদিন শুনেছি ওদের বিবাহ বার্ষিকী ছিল?

হ্যাঁ—

মিঃ ঘোষালের ইচ্ছা ছিল শুনেছি ওরা দিনটা একত্রে কাটাবেন এমন সময় দুপুরেই মেজর দাশ এসে হাজির হন এবং বলেন সেদিনটা—অনেক রাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই থাকবেন। কথাটা শুনে চটে যান মিঃ ঘোষাল আর ক্লাবে বের হয়ে যান—

হ্যাঁ, একটা রাগারাগি চটাচটির পর মিঃ ঘোষাল বাড়ি থেকে বের হয়ে যান আলমারি থেকে পিস্তলটা নিয়ে—

কিন্তু মিঃ ঘোষাল বলেন, পিস্তল তিনি সঙ্গে নেননি।

কথাটা মিথ্যা, মেজর দাশ স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাকে পিস্তলটা আলমারি থেকে বের করে পকেটে ঢোকাতে। In fact সেই সময়ই মিঃ ঘোষাল মনে মনে স্থির করেন ওদের গুলি করে মারবেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে ক্লাবে যান—সেখানে ওয়েটার বলেছে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ড্রিংক করেছেন মিঃ ঘোষাল, তারপর বের হয়ে যান—

ক্লাবে—কোন্ ক্লাবে?

স্যাটারডে নাইট ক্লাব। বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্লাব।

boiRboi.net

সেখান থেকে বের হয়ে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে গাড়িতে কতক্ষণ লাগতে পারে? বিশেষ করে ঐ সময়ে রাস্তা একপ্রকার ফাঁকাই থাকে—কিরীটীর প্রশ্ন।

কত আর সময় লাগবে—দশ পনেরো মিনিট—তারপর ফ্ল্যাটে পৌঁছেছেন—অটোমেটিক লিফটে—

ধরুন ম্যাকসিমাম মিনিট কুড়ি—

তাই হবে—

কিন্তু ওর হাতের ঘড়িটা ভেঙে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিক রাত একটা বেজে দশ মিনিটে—

হ্যাঁ—

তার মানে চল্লিশ মিনিট সময়—কুড়ি পঁচিশ মিনিটে যদি তিনি ফ্ল্যাটে পৌঁছে থাকেন—আর পনেরো মিনিটের হিসাবটা কি ভাবে করবেন মিঃ সোম। তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে মিঃ ঘোষালের হাতঘড়িটা হাতেই ভাঙা অবস্থায় ছিল এবং ঠিক একটা বেজে দশ মিনিটে বন্ধ হয়ে ছিল—সময়ের হিসাবটা যদি ইগনোরও করি হাতঘড়িটার ভাঙার ব্যাপারটা তো ইগনোর করা যাবে না। ঘড়িটা ভাঙল কি করে? নিশ্চয়ই—

অসতর্কে কোন এক সময় যখন মিঃ ঘোষাল গুলি করেন তার স্ত্রীকে—হাত থেকে খুলে পড়ে গিয়ে ভাঙতে পারে—সোম বললেন।

কিরীটী বললে, তা পারে, তবে এ ক্ষেত্রে বেশী 'প্রবাবিলিটি' পিছন থেকে অতর্কিতে আঘাত খেয়ে পড়ে গিয়ে ঘড়িটা ভাঙা।

কিরীটীর যুক্তিকে সোম অস্বীকার করতে পারেন না।

কিরীটী আবার বললে, সর্বশেষে যে কথাটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—সেটা হচ্ছে মিঃ ঘোষালের গুছিয়ে চিন্তাশক্তির সামান্য হলেও একটা বিপর্যয় ঘটেছে—

ডাক্তারী শাস্ত্রে তার কি ব্যাখ্যা দেবে জানি না—কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা অসংলগ্নতা—

আপনার কি মনে হয় মিঃ রায়, স্বর্ণরেণু ঘোষাল নির্দোষ—

স্বর্ণরেণু ঘোষালের যে তার স্ত্রীর হত্যার ব্যাপারে একেবারে কোন দায়িত্ব নেই তা আমি নিশ্চয়ই বলব না। ওর কথাটা একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও চলবে না তাই। একপক্ষে ওকে নজরবন্দী রেখে মনে হয় ভালই হয়েছে।

* * *

হাসপাতালের সেই কেবিনেই রাখা হল আবার স্বর্ণরেণুকে।

ইনেসপেক্টার লাহিড়ী নতুন গার্ডের ব্যবস্থা করলেন এবং সর্বক্ষণ কড়া নজর

boiRboi.net

রাখবার জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন।

স্বর্ণরেণু একেবারে চুপ চাপ। মুখে কোন কথাই নেই।

সন্ধ্যার দিকে ডাঃ দাশগুপ্ত এলেন।

কেমন আছেন মিঃ ঘোষাল? ডাঃ দাশগুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

ভাল।

মাথার যন্ত্রণাটা নেই তো!

না। একটা কথা বলব ডাঃ দাশগুপ্ত—

বলুন না কি বলবেন।

আমি তো এতটুকু অসুস্থ নই, তবে এত ঘটা করে হাসপাতালে রেখে আমার চিকিৎসার এ প্রহসন করছেন কেন?

কে বলেছে আপনি অসুস্থ—

তবে হাসপাতালে এভাবে কেন আমাকে রেখেছেন আপনারা? বিচার যা করবার করে ফেলুন—যা হবার হয়ে যাক। এভাবে এই নজরবন্দী জীবন আমার অসহ্য লাগছে, আমারও তো সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। প্লিজ যা করবার করে ফেলতে বলুন আপনাদের ইনেসপেক্টারকে।

শ্রীলা এসে কেবিনে ঢুকল ঐ সময়।

এই যে মিস সান্যাল, আপনি এসেছেন, গল্প করুন আপনার ভগ্নিপতির সঙ্গে—চলি, গুড নাইট। ডাঃ দাশগুপ্ত কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

তুমি কাল হাসপাতাল থেকে পালিয়েছিলে?

হ্যাঁ, পালিয়েছিলাম। তা তুমি কথাটা জানলে কি করে শ্রীলা?

ইনেসপেক্টার লাহিড়ীর মুখে শুনলাম। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীলা—তুমি বেনারস থেকে কবে এলে?

গতকালই তো এসেছি। তোমার বাসায় গিয়ে শুনলাম সব কথা সুধাকরের মুখে। সে-ই বললে ইনেসপেক্টার লাহিড়ী নাকি তাকে বলে গিয়েছিলেন তোমার খোঁজে তোমার ফ্ল্যাটে কেউ এলে লালবাজারে তার সঙ্গে কনটাক্ট করতে—আমি তখনই লালবাজার ছুটে গেলাম—নিজের পরিচয় দিতে, তুমি অসুস্থ হাসপাতালে আছ—বলতেই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি।

তা তুমি হঠাৎ এ সময় বেনারস থেকে এসেছ যে!

রত্নাই তো আমাকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিল শ্রীলা স্বর্ণরেণুর প্রশ্নের জবাবে বললে।

তোমাকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিল রত্না! কই, আমি তো কিছু জানি না!

boiRboi.net

কেন, তোমাকে বলেনি ?

না।

কিন্তু এসেই বা কি হল, রত্নাকে তো বাঁচাতে পারলাম না। জানো স্বর্ণরেণু রত্নার কেন যেন মনে হয়েছিল তুমি তাকে খুন করবে।

আমি রত্নাকে খুন করব সে কথা সে তোমাকে চিঠিতে লিখেছিল ?

না হলে আমি জানব কি করে—

হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল স্বর্ণরেণু, একেবারে চুপচাপ। অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে স্বর্ণরেণু—

কি ভাবছ ?

তুমি কি বিশ্বাস কর সত্যিই তোমার বোন রত্নাকে আমি হত্যা করেছি ?

না।

কর না! সত্যি বলছ!

সে তো কালই তোমায় বলেছি—আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু জানো শ্রীলা, প্রায়ই আমি মনে মনে সংকল্প করতাম রত্নাকে আমি হত্যা করব, গলা টিপে শ্বাস রোধ করে ঘুমের মধ্যে—না হয়—কি, চেয়ে আছ কেন আমার মুখের দিকে—বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা ?

রত্নাকে তুমি হত্যা করতে চাইতে!

হ্যাঁ। She lost my faith—আমার বিশ্বাস হারিয়েছিল!

বিশ্বাস হারিয়ে ছিল! তুমি কি রত্নাকে চিনতে না, কি গভীর ভাবে সে তোমাকে ভালবাসত বুঝতে পারতে না ?

পারতাম, পারতাম। তবু কি জানো যেখানে যত বেশি নিশ্চয়তা, সেখানেই তত বেশি সংশয়। সেই সংশয়টাই সর্বক্ষণ আমাকে পীড়ন করত। রত্নার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে হত সব আমার মিথ্যা কল্পনা—মিথ্যা সংশয়, সত্যিই রত্না আমায় ভালবাসে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখনই তার মুখের দিকে তাকাতাম, মনে হত তার সব কিছু মিথ্যা ভান মাত্র—

স্বর্ণরেণু, একদিন তো রত্নাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে, বিয়ের আগে তিন বছর তোমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছ, পরস্পর পরস্পরকে জানার প্রচুর সুযোগ পেয়েছ তবু কেন সংশয় জাগল তোমার মনের মধ্যে ?

জানি না, জানি না। একটিবার যদি তার দেখা পেতাম, কেবল তাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতাম—রত্না, একমাত্র তুমিই কেবল বলতে পারো কে তোমাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তারও আর উপায় নেই, কোথায় আজ আর তাকে

boiRboi.net

পাব—সে তো মারা গেছে—

আচ্ছা স্বর্ণরেণু, সে রাত্রের কথা কি তোমার কিছুই মনে নেই?

না।

মনে করতে পারো না রাত সাড়ে বারোটায় ক্লাব থেকে বের হয়ে তুমি তোমার গাড়ি চালিয়ে সোজা কি তোমার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এসেছিল?

হ্যাঁ।

ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে তো তোমার পনেরো বিশ মিনিটের বেশি লাগতে পারে না—তবে তোমার হাতের ঘড়িটা একটা দশ বেজে বন্ধ হয়ে গেল কেন? কাঁটাটা ঘড়ির ভাঙা—মনে হয় হঠাৎ পড়ে গিয়ে তোমার ঘড়ির কাঁচটা ভেঙে যায় ও সেই সঙ্গেই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হয়তো—

তাই হবে।

অবিশ্যি তুমি যদি সত্যি সত্যিই পড়ে যাওয়ায় ঘড়িটা ভেঙে থাকে। ঘড়ির কাঁচটা তোমার নিশ্চয়ই ভাঙা ছিল না—

না।

ঘড়িটা চলছিল ঠিক ঠিক—

হ্যাঁ।

তোমার হাতের ঘড়ির কাঁচটা ভেঙে গিয়েছে—ঘড়িটা থেমে গিয়েছে—জানতে পারলে কখন?

মনে হয় লালবাজারে যখন ফোন করি তখন হাতের ঘড়িতে সময় দেখতে গিয়ে প্রথমে আমার নজর পড়েছিল।

শ্রীলা যে পর পর প্রশ্ন করে চলেছে এবং উত্তর দিয়ে যাচ্ছে স্বর্ণরেণু—তার প্রশ্নের সবকটিই সে করছিল কিরীটীর পূর্ব নির্দেশ মত।

দুপুরে শ্রীলা কিরীটীর সঙ্গে দেখা করেছিল।

অনেক কথা হয় তাদের মধ্যে, এবং কিরীটীই তাকে সন্ধ্যায় স্বর্ণরেণুর সঙ্গে দেখা করতে বলে ও প্রশ্নগুলো করতে বলে।

কিরীটী ইচ্ছা করেই স্বর্ণরেণুর সঙ্গে দেখা করেনি। তাকে পুলিশের হাতে আবার তুলে দেবার ব্যাপারে হয়তো সে তার ওপরে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তার কোন প্রশ্নের জবাব না-ও দিতে পারে। তাই।

আচ্ছা স্বর্ণরেণু, তুমি ইদানীং কেন রত্নাকে বিশ্বাস করতে পারছিলে না সত্যি বল তো—সুচিতের সঙ্গে রত্না মিশত সেটাই কি তোমার অবিশ্বাসের কারণ? সুচিতের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা একবারও ভাবনি কেন? রত্না আর সুচিৎ

boiRboi.net

—ওরা তো ভাই বোন।

ভাই বোনের আলাপ আলোচনা ও মেলামেশার মধ্যে কি একটা অলিখিত সীমারেখা নেই?

নিশ্চয়ই আছে।

যদি কেউ সেটা লঙ্ঘন করে?

তুমি তো সুচিৎকে জানতে, সে চিরদিনই একটু স্ফূর্তিবাজ সহজ সরল টাইপের, তাছাড়া মুখটা ওর বরাবরই কিছুটা আলগা।

শ্রীলা, তুমি ঠিক বোঝালেও বুঝবে না।

কেন বুঝব না, আমি বুঝতে পারছি ঐ সুচিৎকে ঘিরেই তোমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধেছিল—

আমার অবস্থা হলে—

তুমি আমাকে একবার জানালে না কেন?

স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার তোমাকে জানিয়ে কি হবে, তাই জানাইনি, আর এখন ও সব কথা ভেবেই বা কি হবে। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে—

কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার স্বীকৃতিই তোমাকে চরম দণ্ডের দিকে ঠেলে দেবে, আদালতের বিচারে—

হত্যা করেছি যখন ফাঁসি তো হবেই।

তাই যদি তোমার ধারণা তো কিরীটীবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিলে কেন?

ভেবেছিলাম উনি হয়তো ঠিক বলে দিতে পারবেন সত্যি সত্যিই আমি রত্নাকে গুলি করে হত্যা করেছি কিনা। উনি যে আমার সঙ্গে অমন একটা ব্যবহার করবেন ভাবতেই পারিনি।

ওকে তুমি ভুল বুঝো না স্বর্ণরেণু, আমরা সকলে যেখানে যা ভুল করেছি, সেই ভুলের জট যদি কেউ খুলতে পারেন তো উনিই পারবেন।

ভুলের জট?

হ্যাঁ, সকলের ভুলের জন্যই একটা জট পাকিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তুমি, তুমি এর মধ্যে আসছ কি করে শ্রীলা?

আমিও এসেছি। যাক সে কথা, শোন, কিরীটী রায়ের সঙ্গে আমি দেখা করে ছিলাম। তিনি বার বার করে বলে দিয়েছেন তুমি যেন আর এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কোরো না।

না, আর করব না।

হ্যাঁ। কোরো না, আমি আজ আসি—

boiRboi.net

এসো—

শ্রীলা কেবিন থেকে বের হয়ে গেল।

॥ চার ॥

শ্রীলা বলছিল, রত্নার হত্যার পিছনে অনেক জটিলতা আছে অনেক জট পাকিয়ে আছে, আমার সব কথা না শুনলে মিঃ রায় আপনি সত্যের আলো হয়তো দেখতে পাবেন না—

কিরীটী বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসে ছিল কিরীটী আর শ্রীলা।

কিরীটী কোন জবাব দেয় না শ্রীলার কথায়, ওর মুখের দিকে কেবল নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে।

উনিশশো চল্লিশ সালে বোধ হয়—সিংগাপুরের পতন হয়েছে, বর্মাও জাপানীদের হাতে প্রায় চলে গিয়েছে। বর্মা ছেড়ে যেখানে যত বাঙালী ছিল সবাই বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় বিজনেস-চাকরি ফেলে সব পালাতে শুরু করেছে।

রেঙ্গুনের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মন্মথ সান্যালও অন্যান্যদের সঙ্গে তার মার্চেন্ট স্ট্রীটের বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দামী দামী সব আসবাব-পত্র জামা-কাপড় গাড়ি সব কিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সঙ্গে তার স্ত্রী মৃন্ময়ী ও চার বছর বয়স্ক দুই যমজ কন্যা রত্না ও শ্রীলা। জাহাজ বা হাওয়াই জাহাজ কোনটাতেই স্থান করতে পারলেন না মন্মথ।

অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে হাঁটাপথেই চলা শুরু করলেন। দীর্ঘ দুই মাসের সে এক চরম দুঃখ ও যন্ত্রণার কাহিনী।

অবশেষে একদিন যখন ইম্ফল হয়ে আসামে এসে পৌঁছালেন—তিনি নিজে অসুস্থ ও কন্যা দুটি অর্ধমৃত। স্ত্রী মৃন্ময়ীর পথেই মৃত্যুই হয়েছিল।

কলকাতায় বসবাস করবার জন্য অনেকেই বলেছিল কিন্তু রইলেন না বাংলায়, চলে গেলেন এলাহাবাদ কিছু দিন পরে সেই এলাহাবাদ হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস্ শুরু করলেন।

কিন্তু দেহ ও মন দুটোই ভেঙে গিয়েছিল মন্মথর, দীর্ঘ পথশ্রমে ও স্ত্রীর মৃত্যুতে। প্রাক্‌টিসে ভাল করে মন বসাতে পারলেন না। অর্থের অভাব ছিল না, কারণ তার বর্মায় উপার্জনের একটা মোটা অংশ কলকাতার একটা ব্যাঙ্কে জমা ছিল।

মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

boiRboi.net

মেয়েরা যখন কলেজে পড়ত মন্মথ তখন প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়িতেই বসে বই পড়ে সময় কাটে তার। পাবনায় থাকত সম্পর্কে ভায়রাভাই সচ্ছিদানন্দ দাশ—তার স্ত্রী ফুল্লরা সম্পর্কে বোন ছিল মন্মথর স্ত্রী মৃন্ময়ীই এর পর্যন্ত বলে শ্রীলা থামল।

কিরীটি বলল, থামলেন কেন বলুন।

হ্যাঁ বলছি। সচ্চিদানন্দ দাশের অনেক আগেই স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল, তার একমাত্র পুত্র সুচিৎ তখন ঢেরাদুনে মিলিটারি হাসপাতালে পোস্টেড সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডাক্তার। পাশ করে সে আর্মির চাকরিতে ঢুকেছিল বছর দেড়েক আগে মাত্র।

কিরীটী একটু যেন সজাগ হয়ে ওঠে কাহিনীর মধ্যে সুচিৎ দাশের প্রবেশে। কিরীটী আই. জি. মিঃ সোমকে বলেছিল, ঐ সুচিৎ দাশ ভদ্রলোকটির ওপরে একটু নজর রাখবার ব্যবস্থা যদি করেন তো খুব ভাল হয়।

সুচিৎ দাশ তো আর্মীর লোক।

হ্যাঁ, মেজর দাশ এখন ইস্টার্ণ কমাণ্ডে পোস্টেড তাছাড়া ভদ্রলোক একজন ডাক্তার, কমাণ্ড হসপিটালে আছেন—

সেটা একটা খুব অসুবিধা হবে না, ওখানকার অফিসার কমাণ্ডিংকে বলে দিলেই হবে, কর্ণেল চৌধুরীর সঙ্গে আমার কিন্তু জানাশোনাও আছে।

শ্রীলা আবার বলতে শুরু করে—

একবার দিন পনেরোর ছুটিতে ক্যাপ্টেন সুচিৎ দাশ এলাহাবাদে বেড়াতে এলেন সঙ্গে তার বন্ধু স্বর্ণরেণু ঘোষাল। সেও এক সময় আর্মিতে যুদ্ধের সময় ইমারজেন্সী কমিশনে ছিল, ওদের দুজনার আগে থাকতেই জানা শোনা ও বন্ধুত্ব ছিল। স্বর্ণরেণু ঐ সময় আর্মির চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছোটখাটো একটা কারখানা খুলছে হাওড়ার রামরাজাতলায়—বেশ ভালই আয় হচ্ছিল তখন স্বর্ণরেণুর কারখানা থেকে।

সুচিৎ আমাদের থেকে বছর সাতেকের বড়। এবং সে মধ্যে মধ্যে এলাহাবাদে আসত—তার সঙ্গে আমাদের দুজনের আলাপ ছিল।

তারপর ?

স্বর্ণরেণু ঐ কয়দিনেই রত্নার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

আর আপনি—কিরীটী প্রশ্ন করল, স্বর্ণরেণু আপনার মনটাকে কোন রকম স্পর্শ করেননি ?

গোপন করব না, মিথ্যাও বলব না মিঃ রায়, আমারও স্বর্ণরেণুকে ভাল লেগে-

pathagar.net

ছিল কিন্তু এক রাত্রে রত্না বললে, স্বর্ণরেণু তাকে বিবাহ করতে চায় এবং সেও চায় স্বর্ণরেণুকে বিবাহ করতে—সে স্বর্ণরেণুকে ভালবেসেছে।

আপনি কথাটা শুনে কি বললেন?

কথাটা শুনে প্রথমটায় বুকটার মধ্যে হঠাৎ যেন ধ্বক করে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম নিজেকে, আমরা কেবল একই মা'র পেটে জন্মাইনি, যমজ বোন আমরা, কেউ কারও সুখের পথে কেন কাঁটা দেব। বললাম, খুব খুশি হয়েছি—

খুশি হয়েছেন বললেন?

নিশ্চয় আমিই বাবাকে কথাটা বললাম—বাবা রাজী হয়ে গেলেন। দু'মাস বাদে ওদের বিয়ে হয়ে গেল তারই একমাস পরে হঠাৎ বাবা হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন। আমি তখন প্রথম লক্ষ্ণৌতে একটা চাকরি নিয়ে যাই তার বছর তিনেক পরে বেনারসে অন্য একটা ভাল চাকরি পেয়ে সেখানেই চলে যাই। আমি রত্নার কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিলাম তাই বেনারসেরও চাকরিটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌর চাকরিটা ছেড়ে বেনারসে চলে গেলাম, আর—

বলুন, থামলেন কেন?

কথাটা রত্নাকে জানতেও দিলাম না।

কেন?

আমি রত্না ও স্বর্ণরেণুর জীবন থেকে নিজেকে একেবারে মুছে দিতে চেয়েছিলাম। চিঠিপত্রও লেখা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

একটা সত্যি কথা বলুন তো মিস সান্যাল।

বলুন।

আপনি সত্যিই স্বর্ণরেণুকে ভুলতে পেরেছিলেন?

নিশ্চয়—নিশ্চয়ই ভুলতে পেরেছিলাম।

বোধ হয় না মিস সান্যাল।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

কিরীটী মৃদু হাসল। বললে, সেদিন তো নয়ই আর আজও যে আপনি স্বর্ণরেণুকে ভুলতে পারেননি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

মিঃ রায়—

হ্যাঁ, মিস সান্যাল, তা যদি পারতেন তো এভাবে বোধ করি রত্নাদেবীকে প্রাণ দিতে হত না।

কি? কি বলতে চান আপনি মিঃ রায়?

LoiRBook.net

ওই ভালবাসা বস্তুটা এমনই একটা জিনিস যে সত্যিকারের যদি কখনো সে আসে তো তাকে অস্বীকার করা বোধ করি সহজে যায় না।

না না, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আজ আমার মনে আর এতটুকু দুর্বলতাও নেই স্বর্ণরেণুকে ঘিরে।

যাক সে কথা—আপনার কাহিনী আপনি শেষ করুন। আচ্ছা আপনি একটু আগে বলছিলেন, স্বর্ণরেণু আর রত্নাদেবীর সঙ্গে আপনি আর কোন সম্পর্ক রাখেননি—কখনও কোন পত্রও দেননি। কিন্তু তারা—স্বর্ণরেণু আর রত্না—তারাও কি কোন সংবাদ আপনার আর রাখেননি?

তা বলতে পারব না।

কিরীটী আবার মৃদু হাসল, বললে, তারা বোধ করি রাখতেন।

রাখত আপনি কেন বলেছেন—তেমন কোন কথা কি স্বর্ণরেণু আপনাকে কখনও বলেছে?

একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মিস সান্যাল, আপনি স্বর্ণরেণুকে গতকাল হাসপাতালে বলেছিলেন রত্নাই আপনাকে চিঠি দিয়েছিল আপনাকে কলকাতায় আসবার জন্য—

হ্যাঁ বলেছিলাম—

সেটা কি মিথ্যা বলেছিলেন তাহলে তাকে?

হ্যাঁ, মিথ্যাই বলেছিলাম।

কেন?

স্বর্ণরেণুর মনে সাহস আনবার জন্য—

তাই বুঝি—তাহলে স্বর্ণরেণু যখন বললেন, তুমি বেনারস থেকে কবে এলে—

হঠাৎ যেন শ্রীলা কেমন বোবা হয়ে গেল, তার মুখে আর কোন কথা নেই।

মিস সান্যাল, মিথ্যা জিনিসটা এমনই একটা ব্যাপার যে একটা মিথ্যাকে ঢাকতে আমাদের দশটা মিথ্যার আমদানি করতে হয়। আপনার বেনারসে অবস্থানের কথা তারা তো জানতই আর আপনিও তাদের সমস্ত খবরাখবর রাখতেন।

শ্রীলা পূর্ববৎ নীরব।

এবারে সত্যিই বলুন তো মিস সান্যাল, সত্যিই কি রত্না আপনাকে বেনারসে কোন পত্র দিয়েছিলেন আপনাকে আসবার জন্য কলকাতায়।

হ্যাঁ দিয়েছিল চিঠি।

চিঠিটা আছে আপনার কাছে?

না।

boiRboi.net

ফেলে দিয়েছেন না ছিঁড়ে ফেলেছেন?

ছিঁড়ে ফেলেছি।

কেন ছিঁড়ে ফেললেন?

তার মধ্যে স্বর্ণরেণু সম্পর্কে অনেক কথা ছিল—

মিস সান্যাল—

তাকাল শ্রীলা কিরীটীর মুখের দিকে।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রত্না আপনাকে কোন চিঠিই দেননি। সবটাই আপনার একটা কল্পিত কাহিনী।

না না, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়।

বিশ্বাসের কোন বস্তুকে জোর করে বিশ্বাস করাতে হয় না কাউকে—তার নিজস্ব ধর্মেই সে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। যাক, এবারে সত্যি করে বলুন তো আপনি সত্যি সত্যি কলকাতায় কবে এসেছেন?

দুর্ঘটনার দু'দিন পরেই—

ঠিক দু'দিন পরেই?

হ্যাঁ।

তা হঠাৎ কলকাতায় এলেন কেন?

রত্নার জন্য মনটা অস্থির হয়েছিল।

সত্যি কি তাই?

তাই।

কখন এসেছিলেন স্বর্ণরেণুর ফ্ল্যাটে।

বেলা তখন এগারোটা হবে।

কোন ট্রেনে এলেন বেনারস থেকে?

পাঞ্জাব মেলে।

পাঞ্জাব মেল তো ভোর সোয়া সাতটায় হাওড়ায় পৌঁছায়—আপনার স্বর্ণরেণুর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে অত দেরী হল কেন?

ট্যাক্সি পেতে দেরী হয়েছিল।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না, মৃদু হাসল। তারপর বললে, ঠিক আছে মিস সান্যাল, এবারে আপনি আসুন—আপনি তো স্বর্ণরেণুর ফ্ল্যাটেই আছেন—ফোনও আছে ফ্ল্যাটে—প্রয়োজন হলে আপনাকে আমি ফোন করব।

চলি—শ্রীলা উঠে দাঁড়াল।

আসুন—

boiRboi.net

শ্রীলা বের হয়ে গেল। কিরীটী ফোনের দিকে হাত বাড়াল।

ইনেসপেক্টর লাহিড়ী?

কথা বলছি। কে?

আমি কিরীটী রায়।

বলুন, কি ব্যাপার?

স্বর্ণরেণু ঘোষালের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রেখেছেন তো?

হ্যাঁ।

কে যায়, কে আসে—সব কিছুর ওপর নজর রাখতে বলেছেন তো?

তাই বলা আছে ভবেশ সামন্তকে। আর একটা কথা, ভবেশ সামন্তকে শ্রীলার পরে নজর রাখতে বলবেন।

শ্রীলার পরে! কেন বলুন তো? রত্নার হত্যার ব্যাপারে কি—

ভুলে যাবেন না, দুর্ঘটনার ঠিক দু'দিন পরেই শ্রীলা ঐ ফ্ল্যাটে এসেছে—

সে তো চিঠি পেয়ে—

না, কোন চিঠিই সে পায়নি—রত্না কোন চিঠিই লেখেননি।

কি বলছেন।

যা ঘটেছে তাই বলছি—আর হ্যাঁ, মেজর সুচিৎ দাশের পর নজর রেখেছেন তো?

রেখেছি। ভাল কথা—একটা কথা আপনাকে জানানো হয়নি—

কি বলুন তো?

স্বর্ণরেণু ঘোষালের ব্যবহার এখন কোয়াইট নর্ম্যাল, ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন Now we can proceed.

খুব ভাল কথা।

॥ পাঁচ ॥

সেই রাত্রেই হঠাৎ সুচিৎ দাশ এলো কিরীটীর গৃহে।

মেজর দাশ—আসুন, আসুন। আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম—তা বলুন কি সংবাদ?

আমি জানতে এসেছি আমার প্রতি নজর রাখা হয়েছে কেন?

কে বললে?

আমি জানি আর সেটার পিছনে নিশ্চয় আপনারই নির্দেশ আছে। বলুন, আপনি কি আমাকে রত্নার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করেন?

boiRboi.net

সত্যি কথা বলতে কি মেজর, আপনাকে সন্দেহের তালিকা থেকে একেবারে আমরা বাদ দিতে পারছি না।

What nonsence? তা কেন বলুন তো?

তা আপনি যদি সত্যি সত্যিই একেবারে নির্দোষ হন তো, সেক্ষেত্রে আপনার বিরক্তরই বা কি কারণ থাকতে পারে?

মানে!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, আপনি তো জানেন আপনি কিছুর মধ্যেই নেই—সেক্ষেত্রে পুলিশ সন্দেহ করলেই বা আপনার কি এলো গেল মেজর দাশ?

নিশ্চয়ই এসে যায়। আমি একজন গেজেটেড মিলিটারী অফিসার, আমার একটা পোজিশন, প্রেসটিজ আছে—একটা লোক দিবারাত্র ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে চলবে—আমার পক্ষে সেটা সহ্য করা কঠিন। তাছাড়া পুলিশ যে সর্বক্ষণ আমার 'পরে নজর রেখেছে নিশ্চয়ই তার কোন কারণ আছে। আমি সেটাই জানতে চাই—কি কারণ—

আপনি উত্তেজিত হবেন না মেজর দাশ, এমনও তো হতে পারে, আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা করছে পুলিশ, তাই সর্বদা—

বিপদ! আমার আবার কি বিপদ হতে পারে মিঃ রায়, আমি জানতে চাই। তাহলে সত্যি সত্যিই কি পুলিশ রত্নার হত্যার ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করছে?

আপনি স্থির হয়ে বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, আগে সে কথাগুলো শেষ করে নিই। আপনি আজ হঠাৎ না এলে হয়তো আমিই আপনার কাছে যেতাম।

আমার সঙ্গে কি কথা আছে আপনার?

আপনি পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় রত্নার হত্যার ব্যাপারে আপনি তার স্বামী স্বর্ণরেণু ঘোষালকেই সন্দেহ করেন।

হ্যাঁ করি। আমার স্থির বিশ্বাস স্বর্ণরেণুই সে রাত্রে হত্যা করেছে রত্নাকে। তারপর নিজেকে বাঁচানোর জন্য এক মন-গড়া কাহিনীর অবতারণা করেছে—যাতে করে পুলিশের মনে হয় ও ফ্ল্যাটে ফিরবার অনেক আগেই রত্নাকে অন্য কেউ হত্যা করেছিল—তারপর ব্যাপারটা ওর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছে—ও নির্দোষ। কিন্তু পুলিশ তো আর অত বোকা নয়, সেই আজগুবী কথা বিশ্বাস করবে—

স্বর্ণরেণুবাবু যদি সত্যি সত্যিই তার স্ত্রীকে হত্যা করে থাকেন—

যদি নয়, সেই করেছে—take it from me. স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তাকে সে হত্যা করেছে। আর স্বর্ণরেণুটা এমন একটা নীরেট গর্দভ যে সন্দেহটা

কৌশলে আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে।

তা আপনাকে স্বর্ণরেণু সন্দেহই বা করতে গেলেন কেন?

বললাম তো নীরেট গর্দভ একটা—না হলে—

আচ্ছা মেজর দাশ, আপনি কি জানতেন, ডাক্তার স্বর্ণরেণুকে তার এক্সিডেন্টের পরে বলেছিল তিনি কোনদিনই সন্তানের পিতা হতে পারবেন না?

না—আমি জানতাম না।

হুঁ। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের কি findings জানেন? রত্না চার মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

What?

হ্যাঁ, আর that was a big surprise to স্বর্ণরেণু ঘোষাল। যাক্, আপনিও তাহলে কথাটা জানতেন না?

না।

আর একটা কথাও আপনার জানা দরকার মেজর দাশ—

কি বলুন তো?

ডাক্তারের মতে রত্নার মৃত্যু হয়েছিল সে রাত্রে এগারোটা থেকে এগারোটা পনেরোর মধ্যে কোন এক সময়—

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অথচ রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে রাত্রে ক্লাবে ছিলেন স্বর্ণরেণু, তারপর ক্লাব থেকে বের হন—

তার মধ্যে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে—ক্লাব থেকে সকলের অসাক্ষাতে অনায়াসেই কোন এক সময় বের হয়ে স্বর্ণরেণু ফ্ল্যাটে এসে তার স্ত্রীকে হত্যা করে আবার তো ক্লাবে ফিরে যেতে পারে—বিশেষ করে চাকরটা যখন সেদিন ঐ সময় ফ্ল্যাটে ছিল না। আর আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম আলমারি থেকে পিস্তলটা পকেটে নিতে স্বর্ণরেণুকে।

তা অবিশ্যি পারেন—তবুও একটা 'তবে' থেকে যাচ্ছে মেজর দাশ।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, স্বর্ণরেণু নিজেই লালবাজারে ফোন করেছিলেন।

সেও হয়তো নিজেকে সন্দেহের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। মেজর দাশ বললেন।

কিন্তু ঐ হাতঘড়িটা—সেটা ভাঙা ও রাত একটা দশ বেজে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়িটা তাহলে আপনার মতে নিজের বানানো কাহিনীকে সত্য প্রমাণ করবার জন্য স্বর্ণরেণু নিজেই ভেঙেছিলেন---

boiboi.net

আমার তো তাই মনে হয় মিঃ রায়।

আচ্ছা মেজর দাশ, আপনার ও রত্নার মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি ধরণের ছিল?

আপনার প্রশ্নটা অত্যন্ত নোংরা মিঃ রায়—বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

কিরীটী মৃদু হাসল।

ঠিক আছে ও প্রশ্ন থাক। অন্য একটা প্রশ্নে আসা যাক। আপনি কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে আসার আগে কোথায় পোস্টেড ছিলেন?

কানপুরে।

সে সময় আপনি কি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্ণৌ যেতেন?

তা মধ্যে মধ্যে গিয়েছি, কারণ আমাদের হেড কোয়াটার তখন লক্ষ্ণৌতে ছিল।

সে সময় শ্রীলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

হয়েছে—

তারপর তিনি যখন বেনারসে গেলেন, সেখানে?

না। বেনারসে আমি কখনো যাইনি।

অত কাছাকাছি থেকেও বেনারসে আপনি কখনো যাননি মেজর দাশ! প্রশ্নটা করে কিরীটী তাকাল মেজর দাশের দিকে।

প্রয়োজন হয়নি তাই যাইনি।

তাহলে শ্রীলার সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিন দেখাসাক্ষাৎ ছিল না।

হ্যাঁ। সেই যে রত্নার বিয়ের সময় শ্রীলাকে দেখেছিলাম তারপর লক্ষ্ণৌতে দু-একবার ছাড়া আর তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি আমার।

তা সেটা কত বছর আগে হবে?

তিন চার বছর তো হবেই।

আর একটা প্রশ্নের জবাব দেন যদি—

কি বলুন।

রত্নার আর শ্রীলা যমজ বোন ছিল, ওদের মধ্যে কে আগে জন্মেছিল?

শুনেছি রত্না, মিনিট দশেক আগে বোধ হয়—

ওদের দুজনকে চিনতে আপনার কোন অসুবিধা হয়নি? কে ওদের মধ্যে রত্না আর কে শ্রীলা, আপনি—

না, ওদের চিনতে কখনো আমার কোন অসুবিধাই হয়নি।

দু'বোনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু তফাৎ কি ছিল, যাতে করে এক থেকে অন্যকে সনাক্ত করা যেত?

দুজনের চেহারা হুবহু এক, তাহলেও দুজনের চেহারার মধ্যে সনাক্তকরণের

boiRboi.net

একটা ছোট্ট চিহ্ন ছিল—রত্নার ঘাড়ে অর্থাৎ বাঁদিককার গলায় একটা লাল জড়ুল ছিল। শ্রীলার ঐ চিহ্নটা ছিল না।

আচ্ছা, দুজনের habits-এর মধ্যে কোন তারতম্য ছিল কি?

ছিল। রত্না চিরদিনই একটু চাপা প্রকৃতির ছিল, খুব দুঃখেও সহসা বিচলিত হত না। শ্রীলার স্বভাবটা ছিল ঠিক বিপরীত, খোলাখুলি এবং অভিমানটা ছিল একটু বেশী—চট করে সামান্য কারণে চোখে জল এসে যেত। সহজেই যেমন খুশি হয়ে উঠত তেমনি সহজেই অভিমানে মন ভার করত।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মেজর দাশ। কিরীটী বলল।

কিন্তু ঐ সব কথাগুলো আপনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কেন মিঃ রায়?

যমজ বোনেদের চিনতে আমার কিছুটা সুবিধা হবে বলে।

কিন্তু যমজের একজন তো মরে গিয়েছে—

একজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো অন্য জনের কথা শেষ হয়ে যায়নি মেজর দাশ।

আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়—

রত্নার একটি যমজ বোন ছিল শ্রীলা, কথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমার একটা কথা কি মনে হয়েছিল জানেন মেজর দাশ?

কি?

সত্যি সত্যি রত্নাদেবীই মারা গিয়েছেন তো?

তার মানে?

রত্নাদেবী মারা না গিয়ে শ্রীলাদেবীও তো মারা যেতে পারেন—

কি পাগলের মত আবোল তাবোল বকছেন!

কিরীটী মৃদু হাসল, বলল, কথাটা যে আমি একেবারে মিথ্যা বলিনি একটু চিন্তা করলেই হয়তো আপনি বুঝবেন মেজর দাশ।

ঠিক আছে, আমি তাহলে আজ উঠি! মেজর দাশ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

আসুন—

দিন চারেক পরে এক রাত্রে—শ্রীলার চোখে ঘুম ছিল না।

সেঘরে একটা সোফার পরে বসে রত্নার হত্যা ব্যাপারটাই ভাবছিল।

ডাঃ দাশগুপ্ত মত দিয়েছেন এবারে রত্না হত্যা মামলাটা শুরু হতে পারে—স্বর্ণরেণু সম্পূর্ণ সুস্থ।

সে ভাবছিল কোথা থেকে কি হঠাৎ হয়ে গেল—

সত্যিই কি স্বর্ণরেণু রত্নাকে হত্যা করেছে?

boiRboi.net

এতদিন স্বর্ণরেণু বলে এসেছে হয়তো সেই রত্নাকে হত্যা করেছে সে রাত্রে—কিন্তু গতকাল নাকি ইনেসপেক্টর সমীর লাহিড়ীর কাছে বলেছে, সে রত্নাকে হত্যা করেনি। মাথায় অতর্কিতে আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর জ্ঞান হতে দেখে তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা পিস্তল ও সামনে পড়ে আছে পৃষ্ঠদেশে গুলিবিদ্ধ রত্নার রক্তাক্ত দেহ। প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল—সম্বিৎ ফিরে আসতেই প্রথমে সে লোকাল থানায় ফোন করার চেষ্টা করে এবং কানেকশান না পেয়ে লালবাজারে ফোন করে সব কিছু জানায়। ঐ আকস্মিক ঘটনায় সে এতটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে কি বলেছে না বলেছে পুলিশের কাছে সে সময় তার ঠিক স্মরণ নেই। এবং পুলিশ যেন সেটাকেই একমাত্র সত্য বলে না ধরে নেয়।

সংবাদটা তাকে আজ সন্ধ্যার দিকে কিরীটীই ফোন করে জানায়।

কিরীটী তাকে আরো বলেছেন, কাল যদি সময় করে শ্রীলা তার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে পারে তো খুব ভাল হয়। ঘরের কোণে ফোনটা বেজে উঠল।

এত রাত্রে আবার কে ফোন করে! শ্রীলা উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নম্বরটা বলে গেল।

কে? শ্রীলা! আমি সুচিৎ, সুচিৎ কথা বলছি—

এত রাত্রে?

শোন, তুমি শুনেছ কিনা জানি না, স্বর্ণরেণু সুস্থ হয়ে যে জবানবন্দী পুলিশের কাছে দিয়েছে, তাতে সে বলেছে সে নাকি রত্নাকে খুন করেনি—

শুনেছি—

শুনেছ!

হ্যাঁ—

তাহলে কে খুন করতে পারে রত্নাকে?

আমি কি করে জানব—

না না, তাই বলছি—তুমি তো সে সময় কলকাতাতেই ছিলে না—

না, ছিলাম না।

আমি জানতে চাইছিলাম তোমার কাউকে সন্দেহ হয় কি না?

আমার সন্দেহে কি এসে যায়। পুলিশ যাকে সন্দেহ করবে—বিচারে বিচারক যাকে হত্যাকারী বলে মনে করবে সে-ই হত্যাকারী।

কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না শ্রীলার। সে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

boiRboi.net

আরো দু'দিন পরে ওর মামলা শুরু হল আদালতে।

কিরীটীর পরামর্শে শ্রীলা ক্রিমিন্যাল সাইডের দু'দে এ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ীকে নিযুক্ত করেছে।

সোমনাথ ভাদুড়ী তার হাতের মোটা লাল-নীল পেনসিলটা আঙুলের মাথায় ঘুরাতে ঘুরাতে পাশের ফ্ল্যাটের রামকিংকর বাবুকে জেরা করছিলেন।

রামকিংকর বাবু, আপনি ঠিক পাশের ডানদিকের ফ্ল্যাটেই থাকেন—অর্থাৎ স্বর্ণরেণু বাবুর পাশের ফ্ল্যাট—

হ্যাঁ—

আপনি পুলিশের কাছে বলেছেন, স্বর্ণরেণু বাবু ও তার স্ত্রী রত্না দেবীর সঙ্গে আপনার ও আপনার স্ত্রীর বেশ আলাপ ছিল—মানে এক কথায় বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল বলতে পারেন।

তা ছিল। ওরা প্রায়ই আমাদের ফ্ল্যাটে আসতেন আমরাও ওদের ফ্ল্যাটে যেতাম।

ঠিক।

দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি বলেছেন—আপনাদের ফ্ল্যাটে আপনি একা ছিলেন আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভবানীপুরে দাদার বাড়িতে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

অনেক দিন ধরে আপনি নিমোনিয়াতে ভুগছেন—

হ্যাঁ—

সে রাত্রেও আপনার ঘুম হচ্ছিল না।

ঠিক।

কখন—ক'টা নাগাদ আপনি বিছানায় শুয়েছিলেন সে রাত্রে—আপনার মনে আছে কি?

তা বোধ হয় রাত আড়াইটে হবে।

পাশের ফ্ল্যাটে কোন চিৎকার বা গুলির শব্দ কিছু শুনতে পেয়েছিলেন কি?

পেয়েছিলাম একটি গুলির শব্দ।

রাত তখন ক'টা হবে? আন্দাজ—মানে তখন কত রাত্রি হবে?

মনে হয় রাত একটার পর—কারণ তারই কিছুক্ষণ পরে ঘড়িতে একটার সংকেত-ধ্বনি শোনা যায়—আমার ঘরে মনে আছে।

অত রাত্রে পাশের ফ্ল্যাটে গুলির আওয়াজ পেলেন—ব্যাপারটা কি অনুসন্ধান করেননি?

boiRboi.net

না।

কেন?

ভেবেছিলাম দিন সাতেক আগে তিনতলার ফ্ল্যাটে ডাকাতি হয়েছিল রাত বারোটা সাড়ে বারোটায়—তারা বন্দুক ছুড়েছিল—তাই ভাবলাম আবার বুঝি কোন ডাকাত পড়েছে—ভয়ে আমি আর ঘর থেকে বের হয়নি। পরের দিন একটু বেলাতে ঘুম ভাঙতেই তো জানতে পারলাম ব্যাপারটা—রত্না দেবী খুন হয়েছেন।

আচ্ছা রামকিংকর বাবু, ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেমন সদ্ভাব ছিল বলতে পারেন?

আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি খুব ভালবাসা ছিল ওদের পরস্পরের মধ্যে। তবে মধ্যে মধ্যে যে খিটিমিটি হত না তা নয়—

কি নিয়ে খিটিমিটি বাধত জানতে পেরেছিলেন কিছু?

ইদানীং নাকি প্রায়ই সন্ধ্যায় রত্নাদেবী বের হয়ে যেতেন—ফিরতেন সেই রাত দশটা এগারোটায়। ঐ নিয়েই খিটিমিটি বাঁধত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে।

দুর্ঘটনার রাত্রেও রত্নাদেবী বের হয়েছিলেন কিনা জানেন কিছু?

না।

ঠিক আছে—

এবারে বাঁ পাশের ফ্ল্যাটের বিমলাদেবীকে সাক্ষীর জন্য কাঠগড়ায় ডাকা হল।

বিমলাদেবী, আপনি কি করেন?

অধ্যাপনা করি একটা কলেজে।

আপনার পাশের ফ্ল্যাটের রত্নাদেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

ছিল। কিন্তু সে রাত্রের কথা আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না। কারণ আমি আর আমার স্বামী ছেলেকে নিয়ে সেদিন সকালেই আমাদের এক আত্মীয় বাড়ি শ্রীরামপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম—ফিরেছিলাম তার পরের দিন বিকেলে ফিরে এসে সব শুনি।

কি শুনলেন?

স্বর্ণরেণু বাবু তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

কথাটা শুনে আপনার কি মনে হয়েছিল!

ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তো প্রায়ই ঝগড়া খিটিমিটি বাধত—ভেবেছিলাম সে-রকমই কিছু হয়েছিল এবং স্বর্ণরেণু বাবু যা রগচটা লোক—হয়তো রেগেমেগে শেষ পর্যন্ত গুলিও চালিয়েছেন।

boiRboi.net

আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন বিমলা দেবী স্বর্ণরেণু বাবু তার স্ত্রীকে গুলি করতে পারেন?

ওর পক্ষে অসম্ভব নয় কিছু—

পরের দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাক পড়ল ভৃত্য সুধাকরের।

তোমার নাম?

আজ্ঞে সুধাকর পাড়ুই—

দেশ কোথায়?

আজ্ঞে মেদিনীপুর—পানীপারুল গ্রামে।

কত দিন বাবুর ওখানে কাজ করছ?

তা আজ্ঞে বছর তিনেক তো হবেই—

তোমার বাবু আর মা'র মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি হত—তাই না সুধাকর?

আজ্ঞে, ইদানীং মাস তিন চারই দেখছিলাম, বাবুতে আর মায়েতে ঝগড়া খিটিমিটি প্রায়ই হত—

আগে?

আজ্ঞে না, কখনো দেখিনি।

কি নিয়ে ঝগড়া হত?

আজ্ঞে, মায়ের বাইরে যাওয়া নিয়ে। ইদানীং মা প্রায়ই সন্ধ্যার পর বের হয়ে যেতেন, ফিরতেন সেই রাত সাড়ে নটা দশটায়—তাই নিয়েই ঝগড়া-ঝাটি—

কিরীটী বসে ছিল আদালতের মধ্যেই—চিরকুটে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে সোমনাথ ভাদুড়ী হাতে দিল, সোমনাথ কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা পকেটে রেখে দিলেন।

সুধাকর, যে রাত্রে ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটে তুমি কোথায় ছিলে?

আজ্ঞে বাড়িতেই ছিলাম, বাবু বের হয়ে যাবার পর মা আর সুচিৎবাবুও বের হয়ে গেলেন, আমিও তখন সদরে চাবি দিয়ে নীচে যাই—

নীচে মানে?

আজ্ঞে দারোয়ানের ঘরে। সেখানে আমার দেশের এক লোক এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে। কারণ জানতাম মা রাত দশটার আগে ফিরবেন না আর বাবুও রাত সাড়ে এগারোটার আগে নয়ই—

তার মানে মা আর বাবু বের হয়ে গেলে তুমিও বের হয়ে পড়তে?

মানে, আজ্ঞে—

বুঝেছি। তা তোমার মা আর বাবু ব্যাপারটা কখনো টের পাননি?

boiRboi.net

না। ওরা আসবার আগেই আমি ফিরে আসতাম।

বুদ্ধিমান দেখছি তুমি, তা সে রাত্রে কখন ফিরেছিলে?

আজ্ঞে সে-রাত্রে আমি ফিরিইনি।

ফেরোনি!

না।—

সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, তুমি সত্য কথা বলছ না।

আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন, আমি সে রাতে ফিরিইনি।

ফিরেছ, আর তুমি এও জানো যে সে রাত্রে ফ্ল্যাটের মধ্যে কি ঘটেছিল। সামনাসামনি না হলেও আড়ালে থেকে নিশ্চয়ই তুমি সব শুনেছ, দেখেছ। বল সত্যি কথা বল আদালতের সামনে। মনে রেখো, তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছ সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। ভুলো না, তুমি বলেছ প্রায় সন্ধ্যাতেই তোমার মা বের হয়ে যেতেন, ফিরতেন রাত্রে—নিশ্চয়ই ফ্ল্যাট খালি রেখে তোমার মা আর বাবু বের হয়ে যেতেন না।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ চট্টরাজ বললেন, Objection my Lord।

Objection Sustained. অন্য প্রশ্ন করুন মিঃ ভাদুড়ী। বিচারক বললেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী মৃদু হাসলেন তারপর আবার প্রশ্ন শুরু করলেন—

সুধাকর, তুমি বলেছিলে ইদানীং মাস তিন চার ধরে তোমার মা আর বাবুর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি হত, সে কি কেবল তোমার মা'র ঐ রোজ সন্ধ্যায় বাইরে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে না অন্য কোন কারণে ঝগড়া হত তাদের মধ্যে?

আজ্ঞে ঐ বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিয়েই আমার মনে হয়—

আচ্ছা, মেজর সাহেব তোমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আসতেন, তাই না?

আজ্ঞে না, প্রায়ই নয়, তবে মধ্যে মধ্যে আসতেন সাহেব।

মেজর সাহেবের সঙ্গে তোমার মা কখনো বের হয়েছেন বাইরে?

না।

তোমার মা ফ্ল্যাটে না থাকলে মেজর সাহেব কখনো এসেছেন?

না।

তোমার মা প্রায়ই সন্ধ্যায় বের হয়ে কোথায় যেতেন তুমি জানো কিছু?

না। আমি কেমন করে জানব বলুন মা কোথায় যেতেন।

মধ্যে মধ্যে তুমি মা'র চিঠি নিয়ে মেজর সাহেবের নিউ আলিপুরের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে তোমার জবানবন্দীতে পুলিশের কাছে বলেছ।

হ্যাঁ, বলেছি—চিঠি নিয়ে যেতাম।

pathagar.net

তোমার বাবু সে কথা জানতেন?

না।

That's all।

সওয়াল করছিলেন কিরীটীরই পূর্ব পরামর্শ মত সোমনাথ ভাদুড়ী আলীকে। আলী হল মেজর সুচিৎ দাশের কুক-কাম-সারভেণ্ট, কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

আলীর বয়স বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে, বেশ ফিটফাট বাবু গোছের পোষাক-আশাক। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, পরনে লংস ও বুশ শার্ট।

তোমার নাম আলী?

আজ্ঞে রহমৎ আলী।

কতদিন মেজর সাহেবের কাছে চাকরি করছ আলী? সোমনাথ ভাদুড়ী প্রশ্ন করেন।

মেজর সাহেব এখানে আসবার পর থেকেই, নয় মাস হল—

মেজর সাহেবের ফ্ল্যাটে অনেকেই তো আসত, তাই না? স্ত্রীলোক, পুরুষ। এবং প্রায়ই পার্টি হত জেনেছি আমরা।

আজ্ঞে, তা হত।

মিসেস ঘোষাল যেতেন না—যিনি খুন হয়েছেন?

যেতেন বৈকি।

শেষ কবে গিয়েছিলেন?

যে রাত্রে উনি খুন হন, সেদিন সন্ধ্যাতেও তো গিয়েছিলেন।

কখন গিয়েছিলেন?

তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজেনি—

কতক্ষণ ছিলেন?

রাত বোধ হয় সাড়ে দশটা পর্যন্ত, তারপর চলে যান।

রাত সাড়ে দশটায় তিনি কি একা বের হয়ে যান?

না। সঙ্গে সাহেবও ছিলেন।

তোমার সাহেব তো খুব ড্রিংক করতেন—তুমি পুলিশের কাছে বলেছ।

হ্যাঁ, বলেছি—

ঘোষাল মেমসাহেব ড্রিংক করতেন না—যখন উনি সেখানে যেতেন?

করতেন। সাহেবের সঙ্গে ড্রিংক করতে তাকে দেখেছি।

দিন দুই পরে এক সন্ধ্যায় সোমনাথ ভাদুড়ীর গৃহে।

boiRboi.net

কিরীটী আর সোমনাথ ভাদুড়ী মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। রহমৎ আলীর আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ গতকাল থেকে সে নিরুদ্দেশ। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোন পাত্তা সংগ্রহ করতে পারেনি এখন পর্যন্ত। সুচিৎ দাশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, সেদিন আদালতে সাক্ষী দেবার পর রহমত আলী ফিরে যায়নি তার ফ্ল্যাটে।—

কিরীটী বলছিল, মেজর দাশ সম্ভবত মিথ্যা বলছেন।

আপনার তাই মনে হয় রায়মশাই?

হ্যাঁ। আমার কি ধারণা জানেন ভাদুড়ী মশাই, কিরীটী বলতে লাগল, আলী যে আদালতে ঐ রকম অকপটে সব সত্য কথা বলে বসবে আপনার জবাবে, ঠিক ধারণা করতে পারেননি আমাদের মেজর সাহেব—অবিশ্যি পুলিশ পূর্বাহ্ণে আলীকে ভয় দেখিয়ে নানা ভাবে জেরা না করলে হয়তো কোন কথাই বলত না, কোন কিছুই স্বীকার যেত না।

এখন দেখছি আপনার পরামর্শ মত সেদিন আলীকে থানায় ডাকিয়ে থানা ইনচার্জ মিঃ সরখেল পূর্বাহ্ণে তার একটি জবানবন্দী নিয়ে রেখে ঠিকই করেছিলেন —আমাদের মেজর সাহেব ধারণাও করতে পারেননি, আলীকে ঐভাবে পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। জানলে যেতে দিতেন না—ভাগ্যে দিন কয়েকের জন্য মেজর সাহেব সরকারী কাজে দিল্লী গিয়েছিলেন।

ওই রকম একটা হতে পারে, মানে আলীকে মেজর সাহেব সাবধান করে দিতে পারেন বা অন্যত্র কোথাও সরিয়ে দিতে পারেন অনুমান করেই আই. জি. কে আমি পরামর্শটা দিয়েছিলাম—মেজর সাহেব কলকাতার বাইরে গিয়েছেন জানতে পেরে—

আপনার নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিল রায়মশাই আলীর একটা জবানবন্দী নেওয়ার—

ছিল বৈকি, আর উদ্দেশ্য একটাই ছিল—

কি বলুন তো?

মেজর সাহেব যতই মুখে অস্বীকার করুন, আমি অনুমান করেছিলাম মিসেস ঘোষালের সঙ্গে মেজর সুচিৎ দাশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মেলামেশা আছে। এবং যে ব্যাপারটা স্বর্ণেন্দু ঘোষাল অর্থাৎ রত্না ঘোষালের স্বামী হয়তো খুব ভাল চোখে নেননি। তাছাড়া একটা কথা তো আপনিও স্বীকার করবেন ভাদুড়ী মশাই যে, যে কোন স্বামীই তার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করুক, তা সে আত্মীয় হলেও, ঠিক সহজ ভাবে সব সময় নিতে পারে না। দেখুন একটা কথা —মানে কথাটা আপনাকে আমি কাল থেকেই বলব বলব ভাবছিলাম।

কি কথা বলুন তো? মিসেস ঘোষাল অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন সেই কথাটাই কি?

না।

তবে?

ওই শ্রীলা দেবী অর্থাৎ রত্নার যমজ বোনের কথা, আমার মনে হচ্ছে বর্তমান হত্যা মামলার সমস্ত রহস্যের আসল জটটা ঐ দুই যমজ বোনের মধ্যেই—

কি বলতে চান?

একই রকম দেখতে দুটি নারী—

তা সে তো অন্যত্র ছিল আমরা জানি। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

ছিল, তবে দুর্ঘটনার পর পরই তার আবির্ভাব ঘটেছে—ঘটনাস্থলে তার সেই আবির্ভাব বা আসার ব্যাপারটা—

কি—? সোমনাথ প্রশ্ন করলেন।

একটা দৈবাৎ ঘটনা বা কাকতালীয় না—প্ল্যানমাফিক সব কিছু পর পর ঘটেছে—

পূর্ব প্ল্যানমত—মানে সব কিছু পূর্ব-পরিকল্পিত—আপনার ধারণা রায়মশাই?

সে সম্ভাবনাটা কি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি?

কি জানি—সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, তবে কথাটা একবারও কিন্তু আমার মনে হয়নি।

একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন ভাদুড়ীমশাই, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আমি আরও একটু বিশদ ভাবে বলছি। রত্না আর শ্রীলা দুই যমজ বোন—একই সঙ্গে একই ভাবে মানুষ হয়েছে—তারপর যৌবনের সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব ঘটল একটি পুরুষের—যে পুরুষটি যে কোন তরুণীর মন আকর্ষণ করতে পারত—সেক্ষেত্রে এমনও তো হতে পারে দু' বোনই সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল সেদিন স্বর্ণরেণুর প্রতি—

কিন্তু—

জানি আপনি কি বলতে চাইছেন, স্বর্ণরেণু একজনের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং তার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল—স্বর্ণরেণুরও তো ভুল হতে পারে—

ভুল! কি ভুল?

অভিন্ন দেখতে দুই যমজ বোন, সেক্ষেত্রে যত দিন তাদের মধ্যে প্রেমের দেওয়া নেওয়া চলছিল, সে সময় কখনো কখনো ভ্রমবশত স্বর্ণরেণু হয়তো রত্নার বদলে শ্রীলাকে প্রেম নিবেদন করেছে, আর সেটা যদি সম্ভব বলে আমরা ধরে নিই, সেক্ষেত্রে শ্রীলার যদি স্বর্ণরেণুর প্রতি কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন আকর্ষণ জন্মে থাকে—যেটা সে সে-সময় চেপে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলেও মনের মধ্যে যেটা তার থেকে

boiRboi.net

গিয়েছিল পরবর্তী কালেও—এবং সে সংবাদ রত্না বা স্বর্ণরেণু কেউই জানতে পারেনি—

নিঃসন্দেহে জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার—

তাই বলছিলান সমগ্র ব্যাপারটাই রীতিমত জটিল, একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য সব কিছুকে আড়াল করে রেখেছে। শুনুন ভাদুড়ীমশাই, ব্যাপারটা আমার মনে হয়েছে বলেই আই. জি. মিঃ সোমকে আমি শ্রীলা সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করতে বলেছি। উনি যেন এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও বেনারস—যেখানে যেখানে শ্রীলা ছিল—details-য়ে সব কিছু জানতে চেষ্টা করেন—

একটা কথা বলছিলাম রায়মশাই—

বলুন—কিরীটী তাকাল সোমনাথ ভাদুড়ির মুখের দিকে।

রত্নাদেবীকে কে হত্যা করেছে বলে আপনার মনে হয়—মেজর সুচিৎ না ওর স্বামী স্বর্ণরেণুবাবুই—

অনেক জট পাকিয়ে আছে ভাদুড়ীমশাই, জট কিছুটা অন্তত না খুললে বলা কঠিন—বিশেষ করে ঐ যমজ বোনের জট—

সোমনাথ ভাদুড়ী বুঝলেন কিরীটী রায় তার মুখ খুলতে এখুনি রাজী নয়, তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, রহমৎ আলীকে আমার মনে হচ্ছে ঐ মেজর সাহেবই কোথাও লোপাট করেছেন—

আশ্চর্য কিছু নয়, তবে তাকে এখন না পাওয়া গেলেও কোন ক্ষতি নেই—

কি বলছেন আপনি রায়মশাই!

রহমৎ আলীর কাছ থেকে আমাদের যতটুকু জানার প্রয়োজন ছিল আমরা তা জেনে নিয়েছি—

কিন্তু ও বেটা একজন important witness—ওকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

তা অবিশ্যি পারি না।

সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখান থেকে বের হয়ে কিরীটী সোজা লাউডন ষ্ট্রীটে আই. জি. সোমের ডেরায় যখন গেল রাত তখন প্রায় নয়টা।

কিরীটী আগে থাকতেই ফোনে বলেছিল সোমকে যে সে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবে।

সোম বলেছিলেন রাত নয়টা নাগাদ যেতে।

সোম নীচের তলায় তার অফিস ঘরেই ছিলেন, ইনেসপেক্টার লাহিড়ীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন।

boiRboi.net

কোথায় কোন্ বাড়িতে থাকতেন?

জঙ্গম বাড়ি ১৯০।

ওটা তো যত দূর জানি জঙ্গমের রাজার বাড়ি—

বাড়িটা আপনি জানেন?

হ্যাঁ, গিয়েছি কয়েকবার বাড়িটায়—লীলাদি নামে এক ভদ্রমহিলা বাড়িটা কিনেছিলেন ভদ্রমহিলা আমার দিদির মতই ছিলেন। তা এখন সে বাড়িতে কে আছে অবিশ্যি জানি না, কারণ শুনেছি বাড়িটা ভাড়ায় আছে—লীলাদির মৃত্যুর পর থেকে—এখন বুঝতে পারছি শ্রীলা ঐ বাড়িতেই ভাড়াটে ছিলেন। আর কোন সংবাদ পাননি—

না। এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌর রিপোর্ট এখনো আসেনি। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনি বলেছিলেন মিঃ রায়, স্বর্ণরেণুর সঙ্গে কেউ হাজতে দেখা করতে চাইলে আপনাকে জানাতে—

কেউ চেয়েছে নাকি দেখা করতে? কিছু দিন আগে তো শ্রীলাদেবী হাজতে স্বর্ণরেণুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন জানি।

শ্রীলাই আবার দেখা করতে চায়।

পারমিশন দিয়েছেন?

এখনো দিইনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে দোব না ভাবছিলাম।

দিন দেখা করতে—

তাই করব।

তারপর মিঃ লাহিড়ী কিরীটী তাকাল ইনেসপেক্টার সমীর লাহিড়ীর দিকে মেজর সাহেবের আর কোন সংবাদ আছে?

আছে। দু'দিন শ্রীলা মেজর সাহেবের ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। একদিন দু'ঘণ্টা ছিলেন সন্ধ্যার দিকে অন্য দিন ঘণ্টা তিনেক—

মেজর সাহেব যাননি স্বর্ণরেণুর ফ্ল্যাটে?

না।

মিঃ সোম যে বলছিলেন শ্রীলার life-য়ের ওপরে attempt নেওয়া হয়েছিল কি রকম attempt ঘটনাটা ঠিক কি ঘটেছিল?

কিচেনের গ্যাসের চাবী কেউ খুলে রেখেছিল রাত্রে। সকালে উঠে গ্যাস জ্বালাতে গেলেই পুড়ে মরতেন ভদ্রমহিলা।

কেন—চাকরটা ছিল না?

রাতদিনের একটা নতুন ঝি রেখেছেন ভদ্রমহিলা, সুধাকর তো হাজতে। তাকে

boiRboi.net

অ্যারেস্ট করা হয়েছে দিন পনেরো হল—সমীর লাহিড়ী বললেন।

সুধাকরকে অ্যারেস্ট করেছেন—আমি তো কিছু জানি না!

ভাগ্যি করা হয়েছিল নচেৎ ও ব্যাটাও রহমৎ আলীর মত নিপাত্তা হত।

হুঁ। তা ঐ রাত দিনের ঝিও তো গ্যাসের চাবী খুলে রাখতে পারে।

না। কারণ সেদিন বিকেলের দিকে ঝি ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল—শ্রীলা দেবী একাই ফ্ল্যাটে ছিলেন, স্পষ্ট তার মনে আছে রাত্রে রান্নার পর চাবী বন্ধ করে রেখেছিলেন।

তা সারাটা রাত ভদ্রমহিলা গ্যাস খোলা আছে টের পাবেন না? কিচেনের দরজা তো বন্ধ ছিল।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না।

মিঃ সোম বললেন, শ্রীলা দেবীর লাইফের ওপরে কে এ্যাটেম্পট্ নিতে পারে বলুন তো মিঃ রায়?

বলতে পারছি না ঠিক। কেননা—

কি বলুন?

শ্রীলা দেবীর জীবনহানি ঘটাবার চেষ্টা—কার কি স্বার্থ থাকতে পারে—আমি আজ কয়দিন থেকেই অন্য একটা কথা ভাবছি মিঃ সোম। শ্রীলা দেবী এখনও মিঃ সোমের ফ্ল্যাটে আছেন কেন বোন ভগ্নীপতির অবর্তমানে—

সে তো মিঃ ঘোষালই ওখানে শ্রীলা দেবীকে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছেন। স্বর্ণরেণু অনুরোধ করেছেন?

হ্যাঁ।

একা একা আছেন?

না—একটা রাত দিনের ঝি আছে।

কোথা থেকে ঝিকে জোগাড় করলেন?

শুনলাম—ইনেসপেক্টর লাহিড়ী বললেন, মেজর সাহেবই নাকি যোগাড় করে দিয়েছেন।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না, উঠে দাঁড়াল। এবার তাহলে আমি চলি সোম সাহেব।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন মিঃ রায়?

ফোনেই কথাটা আপনাকে আমি বলতে পারতাম সোম সাহেব, কিন্তু মনে হল ফোনে কথাটা না বলাই ভাল—সামনা-সামনিই বলব আপনাকে—তাছাড়া শ্রীলা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট পেয়েছেন কিনা—

boiRboi.net

কথাটা কি, মিঃ রায় ?

ভাবছিলাম শ্রীলার ওপরে আপনাকে বলব একটু নজর রাখতে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই !

প্রয়োজন নেই !

না। এবার তাহলে আমি চলি সোম সাবেব।

আসুন—

কিরীটী বের হয়ে এলো সোমের পারলার থেকে।

রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে—কিরটী গাড়িতে বসে শ্রীলার কথাই চিন্তা করে। কিন্তু কিরীটী জানত না—শ্রীলা তারই অপেক্ষায় তখন তার বাড়িতে বসে আছে।

॥ সাত ॥

বাড়ির গেটে গাড়ি থেকে নেমে দোতলার বসবার ঘরের সামনে এসে কিরীটী থমকে দাঁড়াল। ঘরের ঠিক সামনে একজোড়া লেডিজ চপ্পল। কিরীটী বুঝতে পারে ঘরে কেউ রয়েছে—কোন বাইরের স্ত্রীলোক। কিরীটী হাত দিয়ে ভেজানো কাচের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। ঘরের মধ্যে সোফার ওপর বসে ছিল শ্রীলা। দরজা খোলার শব্দে সে চোখ তুলে তাকাল।

মিঃ রায়—

শ্রীলা দেবী, কি ব্যাপার—আপনি এখানে !

প্রায় ঘণ্টা দুই চার বসে আছি—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে।

বুঝতে পারছি ব্যাপারটা খুব জরুরী।

জংলী ট্রেতে কফি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন ওকে।

নিন, কফিটা খেয়ে নিন।

না না, আবার কফি কেন—

আগে কফিটা খেয়ে নিন, তারপর আপনার কথা শুনব। নিন—

একটু যেন ইতস্তত করেই শ্রীলা কফির কাপটা তুলে নিল, মৃদু চুমুক দিল কফির কাপে।

জংলী, আর এক কাপ কফি।

জংলী বের হয়ে গেল।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কফি পানরত শ্রীলার মুখের দিকে। সমস্ত

boiRboi.net

দেহে যৌবন যেন উপচে পড়ছে। গায়ের রঙটা একটু মাজা মাজা হলেও চোখ মুখ এত সুন্দর যে ভদ্রমহিলাকে সত্যিই সুন্দরী বলা চলতে পারে। কিন্তু চোখে মুখে যেন মনে হয় একটা চিন্তার রেখা স্পষ্ট।

পরনে একটা চাঁপাফুল রয়েংর দামী সিল্কের শাড়ি। এক হাতে একগাছি সোনার চুড়ি, অন্য হাতে একটা ছোট রিস্টওয়াচ। বেরুবার সময় তিনি প্রসাধন করেই বের হয়েছেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

এবার বলুন তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন? কিরীটী বললে।

আপনি কি অনুমান করেছেন মিঃ রায় জানি না—তবে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি স্বর্ণরেণু রত্নাকে খুন করেনি।

তিনি সত্যি সত্যিই যদি তার স্ত্রীকে হত্যা না করে থাকেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বিচারে তিনি মুক্তি পাবেনই—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনি ঐ ব্যাপারে ডেফিনিট হলেন কি করে—কোন কারণ আছে কি?

আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি—

কি জানেন?

রত্নাকে স্বর্ণরেণু কী গভীর ভাবেই ভালবাসত।

ভাল কথা শ্রীলা দেবী, আপনি বোধ করি একটা কথা জানেন না—

কি কথা মিঃ রায়?

সি ওয়াজ ক্যারিং মানে আপনার বোন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

Absurb! Impossible!

ময়না তদন্ত রিপোর্ট তাই বলেছে—শান্ত গলায় কিরীটী বললে।

তাহলে কি স্বর্ণরেণু জানতে পারত না ব্যাপারটা—না, না, তাছাড়া আমাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র বিনিময় ছিল—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সে আমাকে জানাত।

কিন্তু ময়না তদন্ত রিপোর্টকে আপনি অস্বীকার করবেন কি করে?

কিন্তু তা আমি কি করে বিশ্বাস করব বলুন।

কেন?

স্বর্ণরেণু কোন দিনই সন্তানের পিতা হতে পারবে না—ডাক্তার বলে দিয়েছিল। সন্দেহটা হয়তো তাতেই দানা বেঁধে উঠেছিল স্বর্ণরেণুর মনের মধ্যে।

সন্দেহ! কিসের সন্দেহ?

স্বর্ণরেণু জানতেন কোন দিনই তিনি বাপ হতে পারবেন না, তবুও তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান এলো—তখন একটা সন্দেহ কি স্বভাবতই মনে আসে না যে হয়তো তার স্ত্রী—

BoiRboi.net

বিশ্বাস করি না। তাছাড়া কোন্ দিন তাদের সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই বলেই রত্না মনে মনে প্রস্তুত করেছিল নিজেকে, একটি মেয়ে বা ছেলেকে সে পোষ্য নেবে সে-রকম একটি ছেলে বা মেয়ের সন্ধানেও সে ছিল।

আপনি জানতেন সে সব কথা?

জানতাম বৈকি।

রত্না আপনাকে লিখেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—অনেকবার লিখেছে সে সে-কথা ইদানীং আমাকে।

শ্রীলা দেবী, তাহলে দেখা যাচ্ছে—

কি! কেমন যেন সংশয় ভরা দৃষ্টিতে তাকাল শ্রীলা কিরীটীর মুখের দিকে, বললে, কি দেখা যাচ্ছে?

আপনারা দুই বোন দূরে দূরে থাকলেও এবং দেখা সাক্ষাৎ সর্বদা না হলেও বেশ যোগাযোগ ছিল আপনাদের মধ্যে পত্র মারফৎ—

তা তো ছিলই।

এবার কত দিন পরে আপনি এসেছিলেন রত্নার সঙ্গে দেখা করতে?

প্রায় বৎসর খানেক পরে।

শেষ দেখা আপনাদের মধ্যে কবে হয়েছিল?

প্রায় এক বৎসর আগে।

কোথায় দেখা হয়েছিল?

বেনারসে ওরা গিয়েছিল—সেই সময়।

আর একটা কথা—

বলুন।

মেজর দাশের সঙ্গে আপনার নিয়মিত চিঠিপত্র চলত—তাই নয় কি?

না—

চলত না।

না, তার প্রয়োজনও কখনো হয়নি।

অথচ মেজর দাশ বলেছেন, আপনাদের উভয়ের মধ্যে রীতিমত একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

Rubbish—

কথাটা তাহলে কি বুঝব মিথ্যা?

একেবারে মিথ্যা।

অতঃপর কিরীটী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, স্বর্ণরেণুবাবু

boiRboi.net

নির্দোষ—সেই কথাটা বলতেই কি আপনি এসেছিলেন ?

হ্যাঁ—মানে—

আমার আর একটা প্রশ্ন আছে আপনাকে।

কি বলুন।

স্বর্ণরেণু কি তার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন ?

হঠাৎ এ কথা কেন ?

না। জিজ্ঞাসা করছি—কারণ আমার মনে হয় তিনি তার স্ত্রীকে রীতিমত সন্দেহ করতেন, আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে সত্যি জবাবটাই চাই—

আপনাকে তো একটু আগেই বললাম, স্বর্ণরেণু সত্যিই রত্নাকে ভালবাসত—সে ভালোবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না।

শ্রীলা ফিরে এলো স্বর্ণরেণুর ফ্ল্যাটে।

দরজার কলিং বেল বাজতেই দাসী মমতা এসে দরজা খুলে দিল।

এত দেরী হল যে মা—দাদাবাবু সেই কখন থেকে এসে তোমার জন্য বসে আছেন গো দিদিমণি ?

দাদাবাবু কে—সুচিৎ ?

হ্যাঁ—

শ্রীলা এসে ঘরে ঢুকল। সুচিৎ একটা সোফায় বসে একটা পিকটোরিয়ালের পাতা উল্টাচ্ছিল, পদশব্দে মুখপানে তাকাল, দু'চোখে সপ্রসন্ন দৃষ্টি।

কি ব্যাপার, কতক্ষণ ? শ্রীলা প্রশ্ন করে সুচিৎকে।

তা ঘণ্টা দুই হবে—সুচিৎ বলল, কোথায় গিয়েছিলে, ফিরতে এত রাত হল ?

একটা কাজে গিয়েছিলাম।

কোথায় ? কি এমন কাজ যে ফিরতে এত রাত হল ?

কিরীটী রায়ের ওখানে গিয়েছিলাম—সোফায় বসতে বসতে শ্রীলা বললে।

হঠাৎ কিরীটী রায়ের ওখানে গিয়েছিলে ?

একটা দরকার ছিল বললাম তো।

কয়েকটা মুহূর্ত সুচিৎ শ্রীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, ও, তুমি যতই চেষ্টা কর শ্রী—স্বর্ণরেণুকে বাঁচানো যাবে না।

তাহলেও চেষ্টা তো করতেই হবে।

চেষ্টা কি আমিই কম করেছি, কিন্তু যখন বুঝলাম আইনের দৃষ্টিতে ওর মুক্তির কোন আশাই নেই—

boiRboi.net

তোমার হয়তো কথাটা মনে হতে পারে কিন্তু আমার তো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না—শ্রীলা বললে।

ভাল। তাহলে চেষ্টা করে যাও।

শ্রীলা জবাবে কোন সাড়া দিল না।

শোন শ্রীলা, যে জন্য আমি এসেছি—

বলে ফেল—

তোমার কাছ থেকে শেষ জবাব আমি চাই—

কিসের জবাব ?

তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা ?

আমার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় !

না।

কেন জানতে পারি কি ?

না। তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

দেবে না জবাব—

না—কিন্তু সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি সুচিৎ—যা ঘটে গেল তার পরও তুমি ওই কথাটা উচ্চারণ করলে কি করে !

কি ঘটেছে ?

জানো না, জানো না তুমি কি ঘটেছে ?

হুঁ। তাহলে এই তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ বা না কোন জবাব দিল না শ্রীলা, চুপ করে বসে রইল।

আমার ব্যাপারটা আর একবার ভাল করে ভেবে দেখো—দুটো দিন তোমাকে সময় দিয়ে গেলাম। দু'দিন পরে আবার আমি আসব—

একটা কথার জবাব দেবে সুচিৎ ?

কি কথা ?

আচ্ছা সুচিৎ, দুর্ঘটনার রাত্রে তুমি জানো—সন্ধ্যা সাতটায় রত্না তোমার ওখানে গিয়েছিল তারপর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তুমি আর সে তোমার ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে আসো—তোমার বেয়ারা আলীই কোর্টে তার জবানবন্দীতে বলেছে—তোমরা ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?

কোথাও না, একটি ট্যাক্সিতে করে রত্নাকে এখানে দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে আমি আমার ফ্ল্যাটে ফিরে যাই।

pathagar.net

এখানে তুমি থাকনি সে রাত্রে ?

না।

কিন্তু আমি জানি তুমি রত্নার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ঢুকেছিলে সে রাত্রে—

Nonsense !

তার প্রমাণ কিন্তু কিরীটি রায়ের কাছে আছে, যথাসময় তিনি প্রমাণ পেশ করবেন আদালতে।

কি হয়েছে তোমার বল তো শ্রীলা, কি এ সব এলোমেলো কথা শুরু করলে ?

সুচিৎ, কিরীটী রায় কি বলছিলেন জানো ?

কি ?

মৃত্যু তার পশ্চাতে সর্বদাই নাকি তার পায়ের ছাপ রেখে যায়—অমন করে চেয়ে আছ কেন আমার মুখের দিকে ? কি দেখছ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অমন করে ?

কিছু না। আচ্ছা তাহলে আমি উঠি—

শ্রীলা কোন সাড়া দিল না।

॥ আট ॥

পরের দিন। বেলা তখন দশটা।

দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। মমতা কিচেনে ছিল—শ্রীলাই গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।—মিঃ রায়—

হ্যাঁ মিস সান্যাল, ভিতরে আসতে পারি ?

নিশ্চয়ই, আসুন—

দুজনে এসে দুটো সোফায় বসল। কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শ্রীলার মুখের দিকে।

কি দেখছেন ?

মিস সান্যাল, আপনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছেন গত রাত্রেই আমার চোখে—

ধরা পড়ে গিয়েছি !

হ্যাঁ, চেষ্টা করেও, ঘষে ঘষে এতদিনকার সিঁথির সিঁদুরের দাগটা মুছে ফেলতে পারেননি—

কি—কি বললেন ! সিঁদুরের দাগ ?

শুধু তাই নয়, আপনার ঘাড়ের বাঁদিকে লাল জরুলটা—কি—বোবা হয়ে গেলেন

boiRboi.net

যে একেবারে—

আমি—

আপনি শ্রীলা সান্যাল নন, শ্রীমতী রত্না ঘোষাল খুন হননি সে রাত্রে—হয়েছে আপনার যমজ বোন শ্রীলা—

না, না—

যাক সে কথা, এবার একটা সত্যি কথার জবাব দেবেন কি? কত দিন আগে আপনার যমজ বোন কলকাতায় এসেছিলেন!

আ-আমি জানি না।

জানেন। বলুন—। হ্যাঁ, আরো একটা কথা আপনার জানা প্রয়োজন, সে রাত্রে ওই নৃশংস খুনের মধ্যে আপনার স্বামী স্বর্ণরেণু ঘোষাল ছিলেন না।

তবে কে—কে শ্রীলাকে সে রাত্রে হত্যা করল?

সে কথায় পরে আসছি, আগে বলুন কত দিন আগে আপনার যমজ বোন শ্রীলা কলকাতায় এসেছিল?

বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানি না।

জানেন না!

বিশ্বাস করুন, সত্যিই জানি না।

কথাটা কবে জানলেন?

ওই দিনই দুপুরে—শ্রীলা একটা হোটেল থেকে আমাকে ফোন করে বলেছিল বেনারস থেকে এসে সে ঐ হোটেলে উঠেছে। তার বিশেষ জরুরী কিছু কথা আছে আমার সঙ্গে—পরের দিন দুপুরে যেন আমি তার হোটেলে যাই।

কিন্তু যাওয়ার আর প্রয়োজন হল না—আগেই দেখা হয়ে গেল—তাই না? তা সে-রাত্রে সন্ধ্যায় বের হয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন—মেজর দাশের ফ্ল্যাটে কি?

না।

সেখানে তো প্রায়ই সন্ধ্যায় যেতেন।

না, আপনি যা শুনেছেন সেখানে তেমন একটা বড় যেতাম না।

তবে কোথায় যেতেন?

আমাদের পার্টি অফিসে ক্রীক রোতে।

পার্টি অফিসে?

হ্যাঁ, একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের একজন মেম্বার আমি। স্বামী জানতেন না অবিশ্যি—কারণ, জানালে তিনি বাধা দিতেন।

boiRboi.net

স্বর্ণরেণু জানতেন না ?

না, ঐ পার্টিটাকে স্বর্ণরেণু ঘৃণা করত। মিথ্যা বলব না মিঃ রায়, তবে মধ্যে মধ্যে কখনো-সখনো সুচিৎয়ের ফ্ল্যাটে আমি গিয়েছি, নিজেকে স্বর্ণরেণুর সন্দেহ থেকে বাঁচাতে। তবে—

তবে—

গিয়েছি সেখানে, তবে কখনও সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার পরেও নয়, বিকেলের দিকে।

একটা কথা, আপনার বোন শ্রীলা কি drink করত ?

বলতে পারি না ইদানীং করত কিনা—তবে আগে কখনো তাকে drink করতে দেখিনি।

সুচিৎ দাশকে শ্রীলা যে ভালবাসতেন আপনি নিশ্চয়ই জানতেন ?

পরে জেনেছি।

এবারে বলুন—সে-রাত্রে সন্ধ্যায় বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?

পার্টি অফিসে।

কখন ফিরলেন ?

রাত তখন বারোটা হবে—

কে দরজা খুলে দিয়েছিল ?

কেউ না, ডুপলিকেট চাবি আমার কাছে থাকত সর্বদাই—সেই চাবি দিয়েই দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকি—

লিভিং রুমে আলো জ্বলছিল ?

হ্যাঁ—আর সেই আলোতেই দেখলাম—

কি দেখলেন ?

শ্রীলা মরে পড়ে আছে মেঝেতে—পৃষ্ঠদেশে তার ক্ষতচিহ্ন।

তারপর ?

ভয়ে আতংকে আমি অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম।

বলুন, থামলেন কেন ? তারপর—

তাড়াতাড়ি পালাই—

কোথায়—শ্রীলা যে হোটেলে উঠেছিলেন সেই হোটেলে কি ?

হ্যাঁ—

কেন ?

আমি বুঝেছিলাম বিশ্রী একটা ষড়যন্ত্র কোথাও আছে—তারপর দু'দিন পরে এখানে আসি শ্রীলার পরিচয়ে—কেউ আমাকে তখন আর রত্না বলে ভাবতে

boiRboi.net

পারেনি। সংবাদ-পত্রে তখন রত্নার মৃত্যু সংবাদ বের হয়েছে, এবং স্বর্ণরেণুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু তার মাথার গোলমালের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে—

একটু চুপ করে থেকে রত্না আবার বলতে লাগল, হাসপাতালে গিয়ে দেখা করলাম স্বর্ণরেণুর সঙ্গে, কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারল না।

কে বললে চিনতে পারেনি ?

না। পারেনি।

আপনার ভুল সেটা। স্বর্ণরেণু পরে মৃতদেহ দেখেই, আমার স্থির ধারণা, চিনতে পেরেছিলেন যে সেটা তার স্ত্রীর মৃতদেহ না, মৃত্যা ব্যক্তি তার স্ত্রী রত্না নয়। যে কারণে এলোমেলো কথা বলে মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে তার বোঝাতে চেয়েছিলেন, just to kill the time—

চিনতে পেরেছে স্বর্ণরেণু ! সে চিনতে পেরেছিল তাই আপনার ধারণা ?

পেরেছেন বৈকি। মিথ্যাই আপনি ক'টা দিন শ্রীলা সেজে থেকে আমাকেও বিপথে চালাবার মিথ্যে চেষ্টা করেছেন—সেই সঙ্গে নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন, আপনি বোধ করি জানেনও না—ঐ মমতাই গ্যাসের চাবি খুলে রেখেছিল যাতে করে সকালবেলা গ্যাস জ্বালাতে গেলেই আপনার কাপড়ে আগুন ধরে যায় ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে আপনার মৃত্যু হয়—কি বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা আমার ?

তাই—তাই এখন মনে হচ্ছে—সে রাত্রে মমতা নিশ্চয়ই রাত্রে ছুটি নিয়ে যাবার আগে গ্যাস খুলে দিয়ে গিয়েছিল, আর সকাল বেলাতেই সুচিৎ আমাকে ফোন করেছিল।

মেজর সাহেবও আপনাকে চিনতে পেরেছেন আর তাই তো আপনাকে হত্যা করবার জন্য মমতার সাহায্য নিয়েছিলেন।

সুচিৎ ! সত্যি বলছেন মিঃ রায়—

হ্যাঁ, মেজর সুচিৎ দাশ যে মুহূর্তে আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং বুঝে ছিলেন সে রাতে আপনি নন, আপনার যমজ বোন শ্রীলার মৃত্যু হয়েছে—মনে মনে শংকিত হয়ে ওঠেন।

কেন ?

কেন বুঝছেন না, যে কোন মুহূর্তে তো আপনি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে আপনি শ্রীলা নন, আপনি রত্না—

উঃ কি সাংঘাতিক ! আমার মাথাটা ঘুরছে—রত্না বললে।

boiRboi.net

আরও একটা ব্যাপার, যে মুহূর্তে স্বর্ণরেণুর মন থেকে সংশয়ের কুয়াশাটা কেটে গেল তিনি সুস্থ হবার ভান করলেন—কেস আদালতে গেল।

স্বর্ণরেণু কিন্তু আমাকে—

জানি—সুচিৎ দাশকে নিয়ে সন্দেহ করেছিল—আপনি যদি তার ভুলটা ভেঙে দিতেন ব্যাপারটা এত দূর গড়াত না।

জানি। সংশয়, সন্দেহ বস্তুটা এমনিই বটে।

এখন—এখন আমি কি করব মিঃ রায়? রত্না বললে।

কিছু আপনাকে করতে হবে না, যেমন আছেন শ্রীলা হয়ে তেমনি শ্রীলা হয়েই থাকুন। এবারে যা কিছু করবার পুলিশই করবে—হ্যাঁ, যে বস্তুটির কথা বলেছিলেন—

এই যে—বলতে বলতে একটি দামী লাইটার বের করে দিল রত্না ড্রয়ার থেকে —এই লাইটারের গায়ে কি লেখা আছে দেখুন।

কিরীটী দেখল লাইটারের গায়ে এনগ্রেভ করে লেখা আছে S to Sree এস-টু-শ্রী।

এই লাইটারটা তাহলে কি—

হ্যাঁ, শ্রীলাই কোন এক সময় সুচিৎকে দিয়েছিল, যেটা হয়তো সে রাত্রে কোন এক সময় সুচিতের হাত থেকে ঘরের মেঝেতে কার্পেটে পড়ে যায়—

শুনুন, ফ্ল্যাট থেকে কোথাও বেরুবেন না—আমি এখন চলি—কিরীটী বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সমীর লাহিড়ী ও মিঃ সোমের সঙ্গে তার অফিসে বসে কিরীটীর কথা হচ্ছিল।

তাহলে—সোম বলেন, কে হত্যাকারী শ্রীলার, আর কেনই বা—

হত্যা করা হল তাকে, তাই নয় কি? তিনি তার ভালবাসার দাম শোধ করেছেন মাত্র—কিরীটী বললে।

এখন তা হলে—

একটু আগে যেমন যেমন বলেছি তেমনি ব্যবস্থা করবেন মিঃ লাহিড়ী—মনে হয় রাত্রি অবসানের আগেই সকল রহস্যের মীমাংসা একটা পেয়ে যাবেন।

রত্না জানত, ফোন পেলেই ছুটে আসবে সে।

হলও তাই, ঘণ্টাখানেক পরেই ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ সোফার ওপরে বসে ছিল স্বপ্না। ডোর-বেল বাজতেই উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। নিঃশব্দে এক ছায়ামূর্তি ঘরে প্রবেশ করল।

রত্না বললে, এসেছ—

boiboi.net

জবাব এলো অন্ধকারে, হ্যাঁ, হঠাৎ এমন জরুরী তলব কেন ?

বুঝতে পারছ না—রত্না বললে।

বুঝতে পেরেছি, আর আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি—you dirty snake ! শয়তানী ভেবেছিলি তোকে আমি চিনতে পারিনি—

অন্ধকারে খিল খিল করে একটা মেয়েলি হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেল।

অন্ধকারেই ওই মুহূর্তে একটা গুলি ছোড়ার শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দপ করে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল—

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারী মেজর সুচিৎ দাশ।

সমীর লাহিড়ী বললেন, পিস্তলটা ফেলে দিন মিঃ দাশ, আপনার লীলা খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে—সোফার পিছন থেকে দুজন সার্জেন্ট এগিয়ে এলো।

মেজর সুচিৎ দাশের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেবার আগেই সুচিৎ থুতনীর নীচে পিস্তলের নলটা লাগিয়ে ট্রিগার টানল।

আহত রক্তাক্ত দেহটা মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল।

কিরীটী বলছিল, সুচিৎ দাশ কোন দিনই রত্নাকে চেয়েও পায়নি, সে ভাল করেই জানত রত্নাকে সে কোন দিনই পাবে না। তখন অদ্ভুত একটা প্রতিহিংসায় শ্রীলাকে সে করায়ত্ব করে—নির্বোধ শ্রীলা ধরা পড়ে, এবং তখন তার গর্ভে সম্ভবত সন্তান আসে—সে ছুটে আসে কলকাতায়।

তারপর ? সমীর লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন।

তার প্রতি স্বর্ণরেণুর সন্দেহের সুযোগ নিয়ে সে স্থির করে সেই রাত্রেই শ্রীলাকে সে হত্যা করবে, কারণ শ্রীলা হয়তো সুচিৎকে ফোন করে জানিয়েছিল সে রত্নার ওখানেই উঠেছে—রত্নার পার্টির সমস্ত সংবাদই সুচিৎ রাখত—তাই সে রাত্রে রত্না যে পার্টিতে গিয়েছে সে জানত—সে আসে রাত এগারোটার সময় রত্নার ফ্ল্যাটে—শ্রীলা দরজা খুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলাকে গুলি করে সুচিৎ—রত্না বলে নয়—সে জানত যাকে সে গুলি করল সে রত্না নয় শ্রীলা—শ্রীলাই।

তারপর ? প্রশ্ন করেন আবার সমীর লাহিড়ী।

ঠিক রাত একটা বেজে দশ মিনিটে ক্লাব থেকে ফিরে এলেন স্বর্ণরেণু—দরজা খুলতেই দরজার পাশ থেকে একটা লোহার রড জাতীয় বস্তুতে কাপড় জড়িয়ে পিছন থেকে স্বর্ণরেণুর ঘাড়ে আঘাত করে মেজর দাশ। সে ডাক্তার মানুষ, জানত ঠিক কোথায় আঘাত করলে স্বর্ণরেণু মরবে না কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। স্বর্ণরেণু পড়ে গেল—হাতের ঘড়িটার কাচ ভেঙে গেল, ঘড়িটা রাত একটা বেজে

boiRboi.net

দশ মিনিটে থেমে গেল। ঐ আঘাত হানবার পর অচেতন স্বর্ণরেণুকে টেনে এনে মৃতদেহের পাশে শুইয়ে হাতের মুঠোয় পিস্তলটা গুঁজে দেয়—এবং সম্ভবত ঐ সময়েই তার লাইটারটা পড়ে যায়—যেটা রত্না ঐ রাত্রে ফ্ল্যাটে এসে কোন এক সময় দেখতে পেয়ে তুলে রেখেছিল—এবং বুঝেছিল শ্রীলার হত্যাকারী কে। সবটাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি—আর ভুলের মাশুল দিয়ে গেল শ্রীলা। এই কারণেই মিঃ সোম সেদিন আপনাকে বলেছিলাম ওই যমজ বোনের মধ্যেই হয়তো প্রকৃত রহস্য জড়িয়ে আছে।

কিরীটী চুপ করল।

boiRboi.net

গোলাপের রঙ লাল

প্রথমটায় কেউ জানতে পারেনি।

জানতে পারা গেল ক্রমশ একটু একটু করে জয়ন্তীর মৃত্যুর পর। মৃত্যুর পর সংবাদ-পত্রে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে জানতে পারা যায় হাসপাতালে জয়ন্তী ব্যানার্জীর মৃত্যু হয়েছে তীব্র বিষক্রিয়ার ফলে—কি সেই তীব্র বিষ তাও তখনো জানা যায়নি—যে বিষের ক্রিয়ায় জয়ন্তী ব্যানার্জীর মৃত্যু হয়েছে। তবে জয়ন্তী নাকি হাসপাতালে ডাক্তারদের বলেছিল, আমি কোন বিষ খাইনি।

সত্যিই তো। সাধারণ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে জয়ন্তী কেন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে—স্বভাবতই কথাটা প্রথমেই সকলের মনে হয়েছিল।

কতই বা বয়স জয়ন্তীর—মাত্র তো উনাত্রিশ বৎসর হয়েছিল। ভরা যৌবন বলতে গেলে জয়ন্তীর তখনো।

সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়ন্তীর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল—হাসপাতালে তার মৃত্যুর পরের দিন—সে ছবিটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় অসাধারণ সুন্দরী ছিল জয়ন্তী।

চোখ, নাক, মুখ ও চিবুকের গঠন অতুলনীয়। সচরাচর যা বড় একটা চোখে পড়ে না। রীতিমত যাকে বলে ধনী ও শিক্ষিত পরিবার—সেই বাড়ির কর্তা প্রৌঢ় শিল্পপতি ডি. ব্যানার্জী অর্থাৎ দিবাকর ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্র তুষারশুভ্র ব্যানার্জীর বউ জয়ন্তী।

পরের দিন সংবাদ-পত্রে জয়ন্তীর মৃত্যুর ব্যাপারে আরো যে সংবাদটি ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হল—সেটি হচ্ছে ব্যাপারটা সহজ ভাবে স্রেফ আত্মহত্যা, জয়ন্তী কোন বিষ পান করে নাকি আত্মহত্যা করেছে। সংবাদ-পত্রে আত্মহত্যা বা সুইসাইড বলে ছাপা হলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিছুটা সন্দিহান—আত্মহত্যা না হত্যা? এবং ক্রমশ পুলিশ অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারে—

কলকাতা শহরের অন্যতম ধনী শিল্পপতি ডি. ব্যানার্জী অর্থাৎ দিবাকর ব্যানার্জীর পুত্রবধূ জয়ন্তী ব্যানার্জী ঐ দিন মানে দুর্ঘটনার দিন সকালে—বেলা ন'টা নাগাদ অনেক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও, ঘরের দরজা সে খুলছে না দেখে ঘরের দরজা ভেঙে বাড়ির লোকেরা দেখতে পায় সে অচেতন হয়ে শয্যার উপর পড়ে আছে—মধ্যে মধ্যে

boiRboi.net

একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাকাতর শব্দ তার গলা থেকে বেরুচ্ছে। দিবাকর ব্যানার্জী গৃহেই ছিলেন—তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ সান্যালকে চলে আসার জন্য ফোন করেন। ডাঃ সান্যাল এসে জয়ন্তীকে পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন, মিঃ ব্যানার্জী আমার ভাল মনে হচ্ছে না। বৌমাকে এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করা প্রয়োজন। দাঁড়ান, বরং আমিই হসপিটালে ফোন করে দিচ্ছি—

ডাঃ সান্যালই হাসপাতালে ফোন করে দিলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে এ্যাম্বুলেন্স এলো। জয়ন্তীকে যখন স্ট্রেচারে করে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে—দিবাকর ব্যানার্জীর স্ত্রী সরমাদেবী এলেন—তিনি বাড়িতে ছিলেন না—তার শরীরটা ভাল ছিল না বলে থরো চেক্-আপের জন্য কয়েক দিনের জন্য শহরের একটা নাম-করা নার্সিং-হোমে ছিলেন। সংবাদ পেয়েই এক প্রকার ছুটে এলেন বলতে গেলে! সরমা-দেবী উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, কি হয়েছে আমার বৌমার—এ্যাম্বুলেন্সে তোমরা কোথায় পাঠাচ্ছ আমার বৌমাকে?

জবাব দিলেন ডাঃ সান্যাল, হাসপাতাল—

কেন? কি হয়েছে বৌমার? উৎকণ্ঠিতা সরমাদেবী প্রশ্ন করেন।

জয়ন্তীকে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল—এ্যাম্বুলেন্স চলে গেল। ডাঃ সান্যাল বললেন, আমি হাসপাতালে যাচ্ছি মিঃ ব্যানার্জী, আপনিও আসুন।

সরমাদেবীর প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি ডাঃ সান্যাল। তাই—জয়ন্তীর কি হয়েছে ডাঃ সান্যাল? সরমা আবার শুধালেন তার পিছনে পিছনে যেতে যেতে।

সাস্‌পেকটেড কেস অফ পয়জনিং বলেই আমার মনে হচ্ছে। ডাঃ সান্যাল বললেন যেতে যেতে।

সে কি! কি বলছেন আপনি ডাঃ সান্যাল? সরমাদেবী বললেন।

মনে হচ্ছে সেই রকমই। আচ্ছা আমি চলি—ডাঃ সান্যাল আর দাঁড়ালেন না নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

সরমাদেবী অতঃপর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

দিবু, এ সব কি শুনছি—জয়ন্তী বিষ খেয়েছে? সরমা বললেন।

আমি মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না সরমা। দিবাকর বললেন।

বিষ—বিষ খেয়েছে জয়ন্তী! কিন্তু কেন? মাত্র এক সপ্তাহের জন্য আমি চেকআপ করাতে নার্সিং হোম গিয়েছি—সাতটা দিনও তোমরা সংসারটা চালাতে পারলে না।

কিন্তু সরমা—আমি কি করব? কেমন যেন কুণ্ঠা ও জড়তার সঙ্গে বললেন

দিবাকর ব্যানার্জী।

তা হাসপাতালেই বা পাঠাতে গেলে কেন। বাড়িতে কি চিকিৎসা করা যেত না—পয়জনিং কেসের কি বাড়িতে চিকিৎসা হয় না?

সান্যাল বললেন হাসপাতালে পাঠাতে—বললেন দিবাকর ব্যানার্জী।

ইউ আর এ ফুল দিবু, ডাঃ সান্যাল যা বলে গেলেন সত্যিই যদি কেসটা পয়জনিংই হয়—ইমাজিন করতে পারো—আমাদের পরিবারের একটা স্ক্যাণ্ডেল—

তা তুমিও তো বাধা দিতে পারতে। দিবাকর বললেন, ডাঃ সান্যালকে বাধা দিলে না কেন?

তা খোকা কোথায়—তাকে দেখছি না—সরমা আবার বললেন।

তার তো আজকের প্লেনেই দিল্লী থেকে ফেরার কথা। বললেন দিবাকর ব্যানার্জী।

তা হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন—হাসপাতালে যেতে হবে না? সরমা-দেবী হঠাৎ স্বামীকে যেন তিরস্কার করে উঠলেন।

হাসপাতাল!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি হল জানতে হবে না আমাদের।

কিন্তু কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল জয়ন্তীকে তা তো জানি না। কেমন যেন হতাশার সঙ্গে বললেন দিবাকর ব্যানার্জী।

চল তো আগে সামনের হাসপাতালেই যাই—

জয়ন্তীর মাকে একটা সংবাদ—

থাম তো তুমি! স্বামীকে আবার ধমকে উঠলেন সরমা।

হাসপাতালের ডাঃ সুধাকর মল্লিক ডাঃ সান্যালকে শুধালেন, সুইসাইড কেস নাকি ডাঃ সান্যাল?

মনে হচ্ছে সেই রকমই। ডাঃ সান্যাল বললেন।

ওদিকে তখন ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টায় জয়ন্তীর সামান্য জ্ঞান ফিরে এসেছে।

জয়ন্তী—জয়ন্তীদেবী—শুনছেন—

উঃ! জয়ন্তীর কণ্ঠে ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা শব্দ।

কি বিষ খেয়েছেন? ডাঃ সান্যাল শুধান।

আ—আমি—

হ্যাঁ বলুন কি খেয়েছেন কি?

আমি বিষ খাইনি—আমি কোন বিষ খাইনি।

তবে কি খেয়েছেন?

এক—এক কাপ চা। কোন মতে জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্টই কথাগুলো যেন

boiRboi.net

উচ্চারণ করল জয়ন্তী—থেমে থেমে টেনে টেনে। আর কোন কথাই বলতে পারল না জয়ন্তী। বিষের ক্রিয়ায় যেন আরো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জয়ন্তী। সারা দেহ নীল বর্ণ—ঠাণ্ডা—শীতল। প্রথম থেকেই বমি করছিল জয়ন্তী, আর যেন বাম করতে পারে না।

সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করা হল, কিন্তু জয়ন্তী বাঁচল না। রাত ঠিক দশটায় তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। নাড়ির গতি একেবারে থেমে গেল।

হাসপাতালের বাইরে তখনো করিডরে অপেক্ষা করছিলেন দিবাকর ব্যানার্জী, তার স্ত্রী সরমাদেবী ও পুত্র তুষারশুভ্র। ডাঃ মল্লিক ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকলেই ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার মল্লিক বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন, সরি, সি ইজ ডেড।

সরমাই বললেন, মৃতদেহ—

সাসপেক্‌টেড কেস অফ পয়জনিং—পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত ডেড বডি তো পাবেন না মিসেস ব্যানার্জী। ডাঃ মল্লিক বললেন।

সবাই ধরে নিলেন কোন তীব্র বিষ পান করে জয়ন্তী আত্মহত্যাই করেছে, কিন্তু সংবাদটা শোনবার পর জয়ন্তীর মামা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার সুনীল চক্রবর্তীর মনেই প্রথম প্রশ্নটা জাগে। তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর ডাক নাম ছিল কিটি। তার মনে প্রশ্ন জাগল, কিটি আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? তার তো আত্মহত্যা করবার মত কোন কারণই ছিল না।

ঐ ঘটনার মাত্র তিন দিন আগেই তো জয়ন্তী এসেছিল তার বাড়িতে, কত গল্প মামা মামীর সঙ্গে, প্রাণোচ্ছল হাসি খুশি, তার কথাবার্তার মধ্যে সামান্যতম ইঙ্গিতও ছিল না, তিন দিন পরে সেই মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। কেন যেন তার ধারণা হয় জয়ন্তী আত্মহত্যা করেনি। সে আত্মহত্যা করতে পারে না।

আত্মহত্যাই যদি সে না করে থাকে তবে কি ব্যাপারটা একটা নিষ্ঠুর হত্যা—জয়ন্তীকে কেউ বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে? সুনীল চক্রবর্তী অস্থির হয়ে উঠলেন—অবশ্যই তিনি আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—যে মুহূর্তে তিনি একটি ফোন পান কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে—রাত তখন গোটা আটেক হবে। সুনীলবাবু, আপনি জয়ন্তীর মামা, আপনাকে বলছি আপনি কি জানেন জয়ন্তীকে বিষ দেওয়া হয়েছে? তাকে অচৈতন্য অবস্থায় মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—আজ সকাল দশটায় ?

সুনীল চক্রবর্তী তখন সবে লালবাজার থেকে ফিরেছেন সারা দিনের পর—ক্লান্ত—ধরাচূড়াও ছাড়েননি তখনো। ফোনে ঐ কথা শুনে সুনীল চক্রবর্তী চিৎকার করে উঠেছিলেন, সে কি! কে—কে আপনি ? কোথা থেকে বলছেন ?

জবাব এসেছিল, কে আমি, কোথা থেকে বলছি তা বলতে পারব না, ক্ষমা করবেন। বলেই অপর প্রান্তে ফোনটা রেখে দেওয়ার একটা ঠক করে শব্দ হয়। অধৈর্য হয়ে তখনো সুনীল বার বার ট্যাপ করছেন, জানতে চাইছেন—শুনছেন ? শুনুন আপনি কে! কিন্তু কোন সাড়া এলো না অপর প্রান্ত থেকে—ডায়েল টোনটা কানে এলো।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীলের স্ত্রী প্রতিমাদেবী। তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, কে গো ? কার ফোন—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ? কি হয়েছে ?

বুঝতে পারছি না প্রতিমা, নাম বলল না—কিন্তু কেন—জয়ন্তী বিষ খাবে কেন ?

কি বললে! কিটি বিষ খেয়েছে ? সে কি গো, ওমা কি হবে—

হ্যাঁ, ফোনে তো তাই বললে, অচৈতন্য অবস্থায় তাকে আজই সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—

সুনীল চক্রবর্তী ঐ সংবাদটা পেয়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকেন তার পরই ডায়েল করেন জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়িতে—বকুলবাগানে ব্যানার্জী লজে অনেকক্ষণ ফোন বাজার পর ফোন ধরল একজন বেয়ারা—হ্যালো।

এটা কি ব্যানার্জী লজ ?

হ্যাঁ—

তুমি কে ?

আজ্ঞে এ বাড়ির বেয়ারা তারাপদ—

তারাপদ, তোমার বৌদিমণি আছে ?

আজ্ঞে না তো—

কোথায় আছে তোমার বৌদিমণি ?

আপনি কে স্যার ?

আমি তার মামা সুনীল চক্রবর্তী। কি হয়েছে জয়ন্তীর ?

অনেক বেলা হয়ে গেলেও বৌদিমণি ঘুম থেকে উঠছেন না দেখে তার ঘরের দরজা ভেঙে তার ঘরে ঢুকে সবাই দেখলেন বৌদিমণি অজ্ঞান হয়ে আছেন—তাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—

বিশ্রাম করা হল না। ধরাচূড়াও আর ছাড়া হল না—তখুনি জীপ নিয়ে সুনীল

boiRboi.net

চক্রবর্তী ছুটলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ইমারজেন্সীতে তিনজন ডাক্তার তখন জয়ন্তীকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

সুনীল চক্রবর্তী তার নিজের পরিচয়টা দিতে একজন ডাক্তার বললেন, পয়জনিং। হ্যাঁ মিঃ চক্রবর্তী, এ কেস অফ পয়জনিং—

একজন ডাক্তার বললেন, মনে হচ্ছে অ্যাট্রোপিন পয়জনিং—যখন এখানে বডি আনা হয় তখন ঐ বিষের সব লক্ষণই ছিল।

কেমন বুঝছেন এখন? সুনীল চক্রবর্তী শুধালেন একজন বয়স্ক ডাক্তারকে।

তিনি মাথা নাড়লেন—ক্রমশই সিঙ্ক করে যাচ্ছে—কোন আশাই নেই—

বাঁচানো যাবে না?

না—আই অ্যাম সরি মিঃ চক্রবর্তী—উই ডিড আওয়ার বেস্ট—ডাক্তার বললেন।

ওখানে আর যেন দাঁড়াতে পারছিলেন না সুনীল চক্রবর্তী। জয়ন্তীর নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে যেন আর তাকাতেও পারছিলেন না।

শ্লথ পদবিক্ষেপে কোন মতে কেবিনের বাইরে এসে করিডরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ সুনীল চক্রবর্তীর নজরে পড়ল করিডোরেরই একধারে বেঞ্চের ওপর বসে আছেন তার বেয়াই ডি. ব্যানার্জী—তার পাশে বেয়ান সরমাদেবী ও ভাগনী-জামাই তুষারশুভ্র।

দিবাকর ব্যানার্জীর পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী, মাথার চুলগুলো উসকো-খুসকো—মধ্যে মধ্যে চোখ থেকে চশমা খুলে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ মুছছেন। পাশেই বসে সরমা—তারও পরনে একটা তাঁতের শাড়ি—সাধারণত বাড়িতে ঠিক যা ব্যবহার করে থাকেন।

সুনীল চক্রবর্তী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলেন, তারপর ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দিবাকর ব্যানার্জীর সামনে, মিঃ ব্যানার্জী—

সে ডাকে কেমন যেন বোবা শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকালেন দিবাকর ব্যানার্জী।

এটা কেমন করে ঘটল মিঃ ব্যানার্জী?

বিষন্ন ভাবে মাথা নাড়লেন দিবাকর ব্যানার্জী, বুঝতে পারছি না, এখনো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সুনীলবাবু, বৌমা—বৌমা আমার মা-লক্ষ্মী কেন এ কাজটা করল—

কোন কারণ ঘটেছিল কি?

কি কারণ ঘটবে সুনীলবাবু, জানেন তো বৌমা আমাদের কত আদরের—

তা তো জানি—কিন্তু কোন কিছুই যদি না ঘটে থাকবে তবে এমনটা হঠাৎ—

সকাল থেকেই সেই কথাটাই ভাবছি সুনীলবাবু—এমনটা ঘটল কেন?

তুষার কোথায় ছিল?

একটা মেডিকেল কনফারেন্স অ্যাটেণ্ড করতে দিল্লী গিয়েছিল, আজকের বিকেলের ফ্লাইটে এসেছে, দিবাকর ব্যানার্জী বললেন, তা তাকে—

দিবাকর ব্যানার্জীর কথা শেষ হল না, ইমারজেন্সী থেকে সিনিয়র ডাক্তারটি বের হয়ে এসে বললেন, সরি মিঃ ব্যানার্জী, ওকে বাঁচানো গেল না।

গেল না! পারলেন না বাঁচাতে! দিবাকর ব্যানার্জীর কণ্ঠ হতে যেন একটা আর্তনাদের মত কথাগুলো বের হয়ে এলো।

সরমাদেবী চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এখন কি করব মিঃ চক্রবর্তী? ভগ্ন কণ্ঠে শুধালেন দিবাকর ব্যানার্জী।

কি আর করবেন, ডেড বডি তো আর এখন পাওয়া যাবে না—পয়জনিং কেস—পোস্টমর্টেম হবে—তারপর সৎকারের জন্য জয়ন্তীর মৃতদেহটা পাওয়া যাবে—বাড়ি যান এখন।

পোর্টিকোর একপাশে পার্কিং এরিয়াতেই দিবাকর ব্যানার্জীর আলো পিছলে যাওয়া কালো রংয়ের ইমপোর্টেড লাক্সারি প্লিমাউথ গাড়িটা পার্ক করা ছিল। ড্রাইভার রতনলাল মনিব ও তার স্ত্রীকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

সুনীল চক্রবর্তী তখনো করিডোরের এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে—বিরাট গাড়িটা দিবাকর ব্যানার্জী ও তার স্ত্রী এবং তুষারকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গেল।

সুনীল চক্রবর্তী মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলেন, তারপরেই বের হয়ে এসে জীপে উঠে স্টার্ট দিলেন—ভবানীপুর থানার দিকে জীপ ছুটে চলল।

ভবানীপুর থানার ইনচার্জ রসময় সেন নিজের ঘরে বসে একটা সুরতহাল রিপোর্ট লিখছিলেন—সুনীল চক্রবর্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিলেন স্যার আপনি!

রসময়বাবু একটা ডাইরী লিখে নিন, আনন্যাচারাল ডেথ—

আনন্যাচারাল ডেথ? কার? কোথায় স্যার?

বকুলবাগানে ব্যানার্জী লজে—

সে তো শিল্পপতি দিবাকর ব্যানার্জীর বাড়ি, যিনি এ বছর পদ্মশ্রী পেয়েছেন—

হ্যাঁ—তারই পুত্রবধূ—জয়ন্তী ব্যানার্জী—

কি ব্যাপার স্যার? হত্যা-টত্যা কিছু নাকি?

আপাতত বোঝা যাচ্ছে না তবে তীব্র কোন বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে—

বিষ! কি বিষ?

boiRboi.net

কোন মারাত্মক বিষ—কেমিক্যাল এ্যানালিসিস ছাড়া তো আর জানা যাবে না। তবে হাসপাতালের ডাক্তার সাসপেক্ট করছেন অ্যাট্রোপিন···ভাল কথা, ওরা কেউ ডাইরী করেছেন ?

তা তো জানি না স্যার—আমি সেই সকালে বের হয়েছিলাম বজবজ সাইডে একটা খুনের তদন্তে—ঘণ্টাখানেক হল ফিরেছি। দেখি, ছোটবাবু, আমাদের কমল দে ছিলেন—তাকে ডাকি, কেউ ডাইরি করে গিয়ে থাকলে তিনিই বলতে পারবেন।

এ দরোয়াজা—

জি হুজুর।

ছোটবাবুকো বোলাও—বসুন স্যার—

সুনীল চক্রবর্তী বসলেন। তার মনের মধ্যে তখন যেন একটা ঝড় বয়ে চলেছে। জয়ন্তী মেয়েটা লেখাপড়ায় বরাবর ভাল—ইংলিশে এম. এ.। বিয়ের পর কিছু দিন কোন এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনাও নাকি করেছিল। যেমন চেহারা তেমনি গায়ের রঙ—স্লিম দোহারা ফিগার। চমৎকার গান গাইত—রেডিওতে মধ্যে মধ্যে গান গাইত—খানচারেক রেকর্ডও আছে বাজারে—তাছাড়া জামাই তুষারশুভ্র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জেন, এই বয়সেই প্রচুর নাম করেছে—

ছোটবাবু কমল দে এসে ঘরে ঢুকলেন, ডেকেছেন স্যার ? পরক্ষণেই সুনীল চক্রবর্তী-কে দেখে স্যালুট দিল।

কমল, বকুল বাগানের ব্যানার্জী লজ—মানে ডি. ব্যানার্জীর বাড়ি থেকে কেউ কোন ডাইরী করেছে ?

হ্যাঁ স্যার—তার পুত্রবধূ নাকি বিষ খেয়েছেন—শী হ্যাজ বিন রিমুভ্‌ড্‌ টু মেডিকেল কলেজ হসপিট্যাল।

কে রিপোর্ট করতে এসেছিল ?

কেউ নয় স্যার—মিঃ ব্যানার্জীই চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—আমি ডাইরি করে নিয়েছি—আর ঐ চিঠিটা পিন-আপ করে রেখেছি।

সুনীল চক্রবর্তী বললেন, তাহলে আরো লিখে নিন কমলবাবু, আমি এক্ষুণি হাসপাতাল থেকে আসছি, দিবাকর ব্যানার্জীর সেই পুত্রবধূর মৃত্যু হয়েছে।

মারা গেছেন ভদ্রমহিলা। বললেন রসময় সেন, থানার ও. সি.।

হ্যাঁ। তবে আমি বুঝতে পারছি না—যদি আত্মহত্যাই করে থাকে জয়ন্তী তবে কেন করল ?

স্যার, আপনি ওকে চিনতেন ?

হ্যাঁ। আমার একমাত্র বোন সুধার একমাত্র সন্তান জয়ন্তী।

boiRboi.net

তবে কি আপনার ধারণা এটা সুইসাইড নয়—এটা একটা হোমিসাইড—হত্যা?

জানি না। কিন্তু তাই যদি হয়ও তাকে হত্যা করতে যাবেই বা কে! অমন মিষ্টি স্বভাব, নিজের ভাগ্নী বলে বলছি না, তাকে কেউ নিষ্ঠুর ভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারে এও যেন আমি ভাবতে পারছি না। তবু—তবু কেন যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে দেয়ার মাস্ট বি সাম ফাউল প্লে সামহোয়্যার। ডাক্তাররা, মানে হাসপাতাল থেকে এই থানায় রিপোর্ট একটা দেবে ঐ আনন্যাচারাল ডেথ সম্পর্কে—সে রিপোর্টটা একবার আমি দেখতে চাই। কাল আমি আসব—সব কিছু যেন ঠিক থাকে।

থাকবে স্যার।

সুনীল চক্রবর্তী থানা থেকে বের হয়ে এসে আবার জীপে উঠে বসলেন। বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে তার কোয়ার্টার।

॥ দুই ॥

ক্রমে এক সময় ভোর হল।

নিদ্রাহীন এক রাত্রি অতিবাহিত হল সুনীল চক্রবর্তীর। বিনিদ্র সারাটি রাত ধরে ভেবেছেন অনেক। আত্মহত্যাই যদি করে থাকবে জয়ন্তী তো কেন সে করল? তার কি কারণ ছিল আত্মহত্যা করবার? ছোটবেলা থেকে ওকে দেখে আসছেন সুনীল চক্রবর্তী। বড় বোন সুধা দিদির ঐ একটি মাত্রই সন্তান জয়ন্তী সত্যিই অপরূপ সুন্দরী ছিল, দেখলে যেন দু'চোখ জুড়িয়ে যেত। স্বভাবে লেখাপড়ায় তুলনাহীন ছিল জয়ন্তী।

দিদির স্বামী অরবিন্দবাবু বেঁচে ছিলেন যখন জয়ন্তীর বিবাহ দেন। একটা ফাংশানে জয়ন্তীর গান শোনে তুষারশুভ্র এবং জয়ন্তীকে সে সেই প্রথম দেখে। তুষারশুভ্র সবে তখন বিলেত থেকে এফ. আর. সি. এস হয়ে ফিরেছে—বরাবর ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট—ধনকুবের শিল্পপতি দিবাকর ব্যানার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জয়ন্তীর বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ হবে—এম. এ. ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রী। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পড়ছিল জয়ন্তী। মুগ্ধ হয়েছিল তুষারশুভ্র জয়ন্তীকে দেখেই এবং সে-ই যেচে আলাপ করে জয়ন্তীর সঙ্গে—এবং ক্রমশ সেই আলাপ কিছু দিনের মধ্যেই মধুর একটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। কিন্তু কেন যেন সুনীল চক্রবর্তী ও তার দিদি ব্যাপারটায় খুশি হতে পারেননি।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার অরবিন্দবাবুর—কোন এক বেসরকারী কলেজে

অধ্যাপনা করতেন তিনি। দুই বাড়ির অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। বকুলবাগানে বিরাট বাড়ি ব্যানার্জী লজ। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ঐ দিবাকর ব্যানার্জী—ডি. এন। চার পাঁচখানা গাড়ি—দাস দাসী আয়া—ড্রাইভার দারোয়ান। তাছাড়া দিবাকর ব্যানার্জী কেমন যেন বেশ একটু দাম্ভিক এবং শহরের অন্যতম ধনকুবের বলে নিজেকে সর্বদা জাহির করতেও কুণ্ঠিত হতেন না কখনো। তাছাড়া তাদের আভিজাত্য, সমাজ ব্যবস্থা, জীবনের চাল চলন অরবিন্দবাবুর জীবনযাত্রার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দুই নদীর যেন দুটি তীর—মধ্যখানে প্রবহমান নদী। সুনীল চক্রবর্তী তাই মন খুলে সম্মতি জানাতে পারেননি। কিন্তু আশ্চর্য, দিবাকর ব্যানার্জী ও তার স্ত্রী সরমা দুজনেই যেন রীতিমত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন জয়ন্তীকে পুত্রবধূ হিসাবে তাদের ঘরে বরণ করে তুলতে।

জয়ন্তীর সত্যিকারের মতামতটা কি ছিল—আশ্চর্য, সেটা কিন্তু কেউ জানবার প্রয়োজনও বোধ করেননি সেদিন।

মধ্যে মধ্যে আসে তুষারশুভ্র অরবিন্দবাবুর বাড়ি—সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করে। মধ্যে মধ্যে জয়ন্তীকে তার গাড়িতে পাশে বসিয়ে বেড়াতেও নিয়ে যায়।

দিবাকর ব্যানার্জী ও সরমাদেবীও মধ্যে মধ্যে জয়ন্তীকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। মোট কথা তারা স্বামী স্ত্রী যেন উঠে পড়ে লেগেছিলেন জয়ন্তীকে ব্যানার্জী লজে বধূরূপে বরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি প্রথম থেকে যেন অরবিন্দবাবু, তার স্ত্রী সুধাদেবী দিবাকর ব্যানার্জীর ঐশ্বর্য, সামাজিক আভিজাত্য ও নাম ডাক প্রতিপত্তি দেখে বুঝি কিছুটা অভিভূতই হয়েছিল, কিছুটা সম্মোহিতও। তার মেয়ে রাজরানী হবে—তবে তাই হোক। ভগবান করুন তাই হোক, সুতরাং বিবাহ হয়ে গেল।

তারপরের এই দশ বৎসরের ইতিহাস সুনীল চক্রবর্তী খুব ভাল ভাবে তেমন জানেন না। বিরাট ধনী গৃহের পুত্রবধূ জয়ন্তী, জাঁকজমক ঐশ্বর্যর ছড়াছড়ি চারিদিকে বিবাহের পরও জয়ন্তী পূর্বের মতই আসত সুনীল চক্রবর্তীর ওখানে—হাসত, কথা বলত—কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে সুনীল চক্রবর্তীর সে হাসির মধ্যে বুঝি ইদানীং কোন প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাননি সুনীল চক্রবর্তী। মনে হয়েছে—হ্যাঁ, মনে হয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা যেন জয়ন্তীকে ঘিরে আছে সর্বক্ষণ। সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা নিস্পৃহতা, একটা ক্লান্তি। মনে হয়েছে এবার এলে শুধাবেন, হ্যাঁ রে কিটি, তোকে দেখে আজকাল কেন মনে হয় রে—তুই—মানে তোর মনের মধ্যে যেন কিসের একটা গোপন ব্যথা—

boiRboi.net

কিন্তু কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেননি সুনীল চক্রবর্তী।

অত বড় লোকের বউ—কিন্তু অতি সাধারণ বেশভূষা ছিল জয়ন্তীর—কোন প্রসাধন কোন সাজসজ্জাই যেন তার কোথায়ও নেই।

সাধারণ একটি পরিস্কার তাঁতের শাড়ি পরণে, মাথার রাশিকৃত চুল এলোখোঁপা করা—কোন ক্রিম পাউডার লিপষ্টিক নয়—হাতে মাত্র দু'গাছা করে সোনার চুড়ি। বাড়িতে অতগুলো গাড়ি থাকতেও জয়ন্তী এসেছে ট্যাক্সিতেই। কিম্বা কোন কোন সময় বাসে।

সুনীল চক্রবর্তী বলেছেন, কি রে, ট্যাক্সিতে কেন—কিম্বা বলেছেন, কিসে এলি, কোন গাড়ির শব্দ পেলাম না—

জয়ন্তী হাসতে হাসতে বলেছে, গাড়ি কোথায়—আমি তো বাসে এসেছি—

বাসে! কেন?

কেন আবার কি, ও সব কথা থাক। বল কেমন আছ?

জয়ন্তীর সাড়া পেয়ে ততক্ষণে প্রতিমাও এসে দাঁড়িয়েছেন, তার দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলেছে, মামী কেমন আছ?

তুই কেমন আছিস?

ভাল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে মামী, এক কাপ চা খাব।

চা পান করতে করতে প্রতিমা বলেছেন, বাবলু কেমন আছে রে কিটি?

বাবলু জয়ন্তীর সাত বছরের ছেলে, ভারি সুন্দর ছেলেটি।

তাকে কখনো আনিস না কেন? কত দিন দেখি নি, এরপর যেদিন আসবি সঙ্গে নিয়ে আসিস।

ও হচ্ছে বড় লোকের নাতি—জয়ন্তী বলেছে, তোমাদের ভাগ্নির মত তো নয় যে বাসে ট্যাক্সিতে আসতে দেবে আমার সঙ্গে।

সে আবার কি, মায়ের সঙ্গে আসবে—

প্রায় সর্বক্ষণই তো ও দাদু-দিদার কাছে থাকে, আমার কাছে তো থাকে না।

তোর কাছে আসে-টাসে না বুঝি?

আসবে না কেন, আসে—তবে ওদের কাছে কাছেই থাকে সদা সর্বদা।

তোকে ভালবাসে না?

বাসে। মৃদু হেসেছিল জয়ন্তী, ভালবাসবে না কেন।

এখানে আসতে দেবে না বুঝি বাবলুকে?

দেখব, যদি আনতে পারি—কথাটা শুনে ভাল লাগেনি মামা মামীর।

আচ্ছা মামী, মা কি আর কাশী থেকে ফিরবে না?

BoiRboi.net

সুধা স্বামীর মৃত্যুর বছর দুই বাদে কাশীবাসিনী হয়েছেন—সেও আজ বছর সাতেক আগে।

কত তো বলি আমাদের এখানেই এসে থাকতে, তোর মামাও কত লিখেছে কিন্তু সে আসতে চায় না। প্রতিমা সখেদে বললেন।

কেন ?

তা কি করে বলি বল। তা তুই চিঠি-পত্র দিস না তোর মাকে ?

দু'মাস তিন মাস অন্তর লিখি—না লিখলে তার চিঠির জবাব দিই।

কেন রে ! তোর মা না লিখলে তুইও তো লিখতে পারিস নিজে থেকে।

আবার হেসেছিল জয়ন্তী।

প্রতিমা ভাল করেই জানতেন বড় চাপামেয়ে ঐ জয়ন্তী। কিন্তু প্রতিমার মনে হয়েছিল কি যেন চাপা দেবার চেষ্টা করছে জয়ন্তী। যা হোক প্রতিমা আর বেশী কথা বলেননি।

ভবানীপুর থানা থেকে ফিরে এলেন সুনীল।

হ্যাঁ গো এত দেরি হল যে ? প্রতিমা বললেন। তিনি দেখলেন স্বামীর মুখটা যেন কেমন থমথম করছে।

সুনীল নিজেই বললেন কথাটা, মেয়েটা মারা গেল প্রতিমা—

কখন ?

রাত বারোটা নাগাদ, আমি এখান থেকে যাবার কিছুক্ষণ পরেই। ডাক্তাররা বলছিল কোন মারাত্মক বিষ—

কিন্তু বিষ ও পেল কোথায় ? আর বিষ ও খেতে যাবেই বা কেন ?

আমার কি মনে হচ্ছে জানো প্রতিমা—বিষ দিয়ে ওকে খুন করা হয়েছে—এটা আদৌ আত্মহত্যা নয়।

খুন ! গলা দিয়ে যেন অস্ফুট একটা চিৎকার বের হয়ে এলো প্রতিমার।

মনে হচ্ছে তাই।

কিন্তু কে ওকে বিষ দিয়ে হত্যা করবে ! আর কেনই বা করতে যাবে ?

সেই থেকে তাই তো ভাবছি প্রতিমা—কে ওকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল, আর কেনই বা করল ? অমন শান্ত নির্বিরোধী একটা মেয়ে—

দেখ, এতদিন তোমাকে আমি একটা কথা বলিনি—ইদানিং ও এখানে আসা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিল—তবুও এলে কেন যেন আমার মনে হত কি যেন একটা ব্যথা ওর মনের মধ্যে গুমরাচ্ছে।

boiRboi.net

তুষারশুভ্রর সঙ্গে কি তেমন বনিবনা হচ্ছিল না জয়ন্তীর !

তা জানি না। তবে তুষারশুভ্রকে যতটুকু দেখেছি—ছেলেটি অত্যন্ত অমায়িক ভদ্র-অত বড়লোকের ছেলে নিজে একজন কৃতি ডাক্তার হয়েছে—তবুও কোন অহংকার নেই।

শিল্পপতি ডি. ব্যানার্জীর বাড়ির ব্যাপার—অত বড় একটা নাম করা পরিবারের পুত্রবধূ ব্যাপারটা কিন্তু চাপা রইল না দিন দুই বাদে সংবাদ-পত্রে বেরুল সংবাদটা—ধনীর পুত্রবধূর আত্মহত্যা। ইতিমধ্যে ভবানীপুর থানা থেকে পুলিশ ব্যানার্জী লজে এসে এনকোয়ারী করে গিয়েছে—বাড়ির লোকদের কি বক্তব্য আছে তাও লিখে নিয়ে গিয়েছে।

তুষারশুভ্র বাপের ট্রাঙ্কল পেয়ে দিল্লী থেকে আগেই এসে গিয়েছিল।

থানা অফিসার রসময় সেনকে দিবাকর ব্যানার্জী যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে দুটো পাশাপাশি ঘরে ছেলে আর পুত্রবধূ থাকত—মধ্যখানে একটা দরজা ছিল—

রসময় সেন শুধিয়েছিলেন, দরজাটা বন্ধ থাকত না খোলা থাকত ?

তা তো বলতে পারব না।

আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জী, এমন কি কোন কিছু ঘটেছিল বলে আপনি জানেন, যাতে করে এমনটা হতে পারে ?

দেখুন, বৌমা আমার ছিলেন রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী, শান্ত নম্র ব্যবহার, উঁচু গলায় কারো সঙ্গে কখনো তাকে কথা বলতে শুনিনি, নিজের মনেই থাকতেন, মাঝখানে কলেজের চাকড়িটা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইদানীং আবার কোন্ কলেজে যেন ইংরাজীর লেকচারারের পদ নিয়েছিলেন।

কোন কলেজ ?

জানি না, বলতে পারব না। সকালে নটা শোয়া নটায় কলেজে চলে যেতেন, ফিরতেন কোন দিন বিকেলে, কোন দিন সন্ধ্যায়—

তারপর ?

সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতেন এবং পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন—সেদিন বিকেলেও কলেজ থেকে ফিরে ঘরে গিয়ে ঢোকেন। আমি যতদূর শুনেছি রাত্রে বেয়ারা তারাপদ খাওয়ার জন্য ডাকতে গেলে বলেছিলেন—খাবেন না, ক্ষিধে নেই।

কেন ?

তা তো জানি না। তখন তারাপদ নাকি বলেছিল, বিকেলের দুধটাও তো খাননি—দুধটা পাঠিয়ে দেব ? রোজ বরাবরই এক গ্লাস করে দুধ খেতেন বৌমা। দুধ পাঠাতে বলায় রাত দশটা নাগাদ তারাপদ একগ্লাস গরম দুধ দিয়ে আসে বৌমাকে, তারপর তো আপনারা সবাই জানেন, পরের দিন সকাল আটটাতে যখন বৌমা ঘরের দরজা খুললেন না,

boiRboi.net

ডাকাডাকি ও দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। কোন সাড়া নেই, অগত্যা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা হয় অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিলেন বৌমা।

ঘরের মেঝেতে!

হ্যাঁ, আমি তখুনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ সুশান্ত সান্যালকে ফোন করি।

বেলা তখন কটা?

সাড়ে নটা হবে—কিংবা তার কিছু আগে পরেও হতে পারে, ঠিক স্মরণ নেই—

রসময় হাতের খাতায় সব কথা নোট করে নিচ্ছিলেন।

রসময় বাবু প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তাকে ঠিক কখন হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছিল?

যে মুহূর্তে ডাঃ সান্যাল তাকে রিমুভ করার কথা বলেন সেই মুহূর্তেই এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হয়—

আপনার তো চার-পাঁচখানা গাড়ি আছে, তাহলে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করলেন কেন?

বৌমা তো তখন সেন্সলেস্, জ্ঞান নেই, সে অবস্থায় মনে হয়েছিল এ্যাম্বুলেন্সেই তাকে হাসপাতালে রিমুভ করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে—

কিন্তু কাছাকাছি তো আরো হাসপাতাল ছিল, মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেন কেন?

হ্যাঁ ছিল, তবে বাঙ্গুর হাসপাতাল আর সুখলাল কারনানী হাসপাতালে কেউ তেমন জানাশোনা নেই—মেডিকেল কলেজে অনেক জানাশোনা আছে—খোকনও মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে, তাই—

খোকন কে?

আমার বড় ছেলে তুষারশুভ্র। সে নাম করা একজন সার্জেন।

আই সি—তা ঐ একটিই ছেলে আপনার?

না, দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেক দিন, সে দিল্লীতে থাকে।

আর ছোট ছেলে?

সে সি. এ. নিজের ফার্ম করেছে কিছুদিন হল—ব্যানার্জী ও বোস।

ছোট ছেলের নাম কি?

স্বর্ণশুভ্র ব্যানার্জী।

বড় ছেলে মানে ডাঃ ব্যানার্জী সে-সময় বাড়িতে ছিলেন?

না, দিল্লীতে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিল, ট্রাঙ্ক-কল পেয়ে পর দিন সকালের ফ্লাইটে চলে এসেছে।

তিনি আছেন?

boiboi.net

আছে।

তাকে ডাকুন একবার—তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তারাপদই দিবাকরের নির্দেশে তুষারশুভ্রকে ডেকে নিয়ে এলো। যাকে বলে হ্যাণ্ডসাম চেহারা তাই। লম্বা চওড়া, সাহেবদের মত টকটকে গায়ের রঙ।

বসুন ডাঃ ব্যানার্জী। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলেই কি আপনার মনে হয়?

আমি তো আউট অফ স্টেশান ছিলাম—এসে তো তাই শুনলাম।

আত্মহত্যা করবার কোন কারণ ছিল বলে আপনার মনে হয়?

কি করে বলব বলুন, তবে ইদানীং কিছুদিন ধরে কেমন একটা মেলানকোলিয়ায় ভুগছিল বলে মনে হয়।

চিকিৎসা করাননি?

না। ও রকম মধ্যে মধ্যেই তার হত গত বছর দুই ধরে, আবার কিছুদিন পরে আপনা হতেই ভাল হয়ে যেত। তাছাড়া ও বড় একটা ওষুধ-টোষুধ খাওয়া তেমন পছন্দ করত না—খেতেও চাইত না।

আপনাদের বিবাহিত জীবন—

খুব ভালই ছিল, আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভাল রিলেশনই ছিল—উই ওয়্যার কোয়াইট হ্যাপি।

কিন্তু আলাদা ঘরে শুতেন আপনারা—

সে অনেক দিন থেকেই—বাবলু জন্মাবার পর থেকেই ওই ব্যবস্থা—মানে কয়েক বৎসর ধরে।

তারাপদই তো সে রাত্রে দুধ দিয়ে এসেছিল আপনার স্ত্রীকে, তাই না?

হ্যাঁ—সেই রকমই শুনেছি।

তারাপদ এ বাড়িতে কতদিন আছে?

অনেক দিনের বেয়ারা, তা আট-দশ বছর তো হবেই।

আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জী, সে রাত্রে তিনি কি দুধ খেয়েছিলেন?

হ্যাঁ—প্রায় অর্ধেকটা—

দুধের গ্লাসটা—

সেটা সেই ভাবেই ঘরের মধ্যে ছিল, সেটা আমি সেই ভাবেই রেখে দিয়েছি।

কেন?

যদি আপনাদের সেটা প্রয়োজন হয়—

ঠিক বলেছেন, আমি দুধের গ্লাসটা নিয়ে যাব।

boiRboi.net

অতঃপর যে ঘরের মধ্যে অচেতন অবস্থায় জয়ন্তীদেবীকে আবিষ্কার করা হয়েছিল সেই ঘরটা দেখলেন রসময় সেন।

সে ঘরের জিনিসপত্র ঠিক তেমনিই আছে—ঘরটির ইয়েল লক বন্ধ ছিল। চাবি দিয়ে ইয়েল লক খুলে রসময় ও তুষারশুভ্র ঘরে প্রবেশ করলেন।

বেশ বড় সাইজের একটা ঘর—ফ্লোরে শাদা কালো মার্বেল বসানো। আসবাব পত্র বিশেষ কিছু নেই—একটা সিংগিল বেড—তাতে তখনও শয্যা বিছানো ছিল—শয্যাটা একটা সুজনী দিয়ে ঢাকা ছিল। অতি সাধারণ শয্যা—ধনী গৃহের সঙ্গে রীতিমত বেমানান। মাথার কাছে একটা টেবিল ল্যাম্প, পাশে একটা টুল। এক কোণে দেওয়াল ঘেষে কাঠের একটা আলমারী, বন্ধ পাল্লা। অন্য দিকে একটা বড় টেবিল—পাশে একটা শেলফে মোটা মোটা সব ইংরাজী বই—টেবিলের পরে বই ও খাতা পত্র ছড়ানো—একটা মোটা খাতা টেবিলের পরে খোলা পড়ে আছে—তার পাশে মুখ খোলা একটা দামী সেফার্স পেন—

মনে হচ্ছে সে রাত্রে জয়ন্তী দেবী পড়াশুনা করেছেন—

ডাঃ ব্যানার্জী বললেন, সব সময়ই তো সে পড়াশুনা নিয়েই থাকত—পি. এইচ. ডি-র থিসিস নিয়ে ব্যস্ত ছিল কিছুদিন ধরে।

ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা জয়ন্তীর ঘর থেকে বন্ধ, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রসময়—সেদিন ঐ দরজাটা বন্ধই ছিল কি না বলতে পারেন ডাঃ ব্যানার্জী ?

হ্যাঁ, তাই শুনেছি—

ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটা দেখিয়ে রসময় বললেন, ঐ বাথরুমের দরজাটা ?

ওটাও বন্ধ ছিল শুনেছি।

ঐ বাথরুম থেকে বাইরে বেরুনোর কোন পথ আছে ?

না।

অতঃপর আবশ্যকীয় যা কিছু নোট করে দুধের গ্লাসটা নিয়ে গেলেন রসময়।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা সুনীল চক্রবর্তী রসময়ের ফোন পেয়ে থানায় এলেন।

ব্যানার্জী লজে কিছু পেলেন মিঃ সেন ? সুনীল চক্রবর্তী শুধালেন।

ঐ আধগ্লাস জমাট বাঁধা বাসী দুধ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাইনি স্যার—বলে সেখান থেকে ফিরে এসে যে ডাইরীটা লিখেছিলেন সেটা সুনীল চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিলেন রসময় সেন। সুনীল চক্রবর্তী যখন সেই রিপোর্টটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছেন তখন একটি যুবক ঘরে ঢুকে বললে, আমি থানার ও-সির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

স্বর্ণশুভ্র নমস্কার জানিয়ে থানা অফিসারের ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

জানেন রসময়বাবু, এই ছেলেটির কথা আমি দু-একবার জয়ন্তীর মুখে শুনেছিলাম—ব্যানার্জী পরিবারের মধ্যে ও একেবারে স্বতন্ত্র।

তাই তো মনে হল।

একটা কথা মনে রাখবেন রসময়বাবু, কিছুদিন আপনাকে এখন সর্বদা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে হবে ঐ ব্যানার্জী লজের দিকে।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার—থানার ও. সি. রসময় বললেন।

আমার ধারণার কথা তো আগেই মানে প্রথমেই আপনাকে আমি জানিয়েছি মিঃ সেন—বললেন সুনীল চক্রবর্তী, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় জয়ন্তীমাকে হত্যা করা হয়েছে। আর হত্যা যে করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার অনুমানটা আরো দৃঢ় হয়েছে স্বর্ণশুভ্রর কথাগুলো শুনে। মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই প্রি-প্ল্যান্‌ড্‌, পূর্বপরিকল্পিত। আর সত্যিই যদি তাই হয় তো সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে আর একটা কথা—

বলুন স্যার—রসময় চক্রবর্তীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন—

দিবাকর ব্যানার্জী ধনী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। তারই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে—যেটা বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কাজেই সেই চার দেওয়ালের মধ্যে যা ঘটেছে তার রহস্য ভেদ করা খুব একটা সহজ হবে না মিঃ সেন।

একটা কথা বলব স্যার, ঐ যে ওদের বেয়ারা তারাপদ ওকে এ্যারেস্ট করব? তাহলে হয়তো আসল কথা জানতে পারা যাবে।

না, তাড়াহুড়ো করে কিছু করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে না মিঃ সেন।

চক্রবর্তী বললেন, আমার মনে হচ্ছে ওকে চাপ দিলে হয়তো ঐ বাড়ির কথা কিছু কিছু জানা যেতে পারত।

জানতে যে পারবেনই তার কোন নিশ্চয়তা নেই রসময়বাবু। তবে হ্যাঁ, ঐ লোকটা সম্পর্কে বেশ ভাল করে খোঁজখবর নিন—আমিও লালবাজার থেকে ডি. সি. ডি. ডি-কে বলে ওর পিছনে গোয়েন্দা লাগাব—ওর সমস্ত মুভমেণ্টস-এর প্রতি প্রতি নজর রাখবার জন্য। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন—

কি স্যার?

জয়ন্তী ছিল আমার নিকটতম আত্মীয়া, আমার ভাগ্নী। এক্ষেত্রে আমার যে একটা বিশেষ ইণ্টারেস্ট থাকবে সেটা সকলেই ধরে নেবে। সুতরাং আমি সক্রিয় ভাবে আপনাদের মধ্যে না থাকলেও জানবেন আমি সর্বদাই আপনাদের সঙ্গে

boiRboi.net

আছি। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ফ্রেম করবার আগে আপনাকে অভিযোগের কারণ দর্শাতে হবে—কথাটা সর্বদা মনে রাখবেন।

সে তো নিশ্চয়ই—

আগে সেইগুলো যথাসম্ভব খুঁজে বের করুন—যাতে করে আপনার গ্রাউণ্ডটা স্ট্রং হয়। আর একটা কথা জয়ন্তীর স্বামী ডাঃ তুষারশুভ্র ব্যানার্জীর সম্পর্কেও জানতে হবে। লোকটা যতই শিক্ষিত ও নামী হোক না কেন এবং ঘটনার সময় বহু দূরে দিল্লীতে থাকলেও ভুলবেন না ও জয়ন্তীর স্বামী ছিল। আর স্বর্ণ-শুভ্রর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেন স্ট্রেঞ্জ রিলেশান ছিল—কেন তারা একে অন্য থেকে পৃথক শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল জানতে হবে। যে বিয়ে একদিন পরস্পরের ভালবাসাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল—সে সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরল কেন? আমি যত দূর জানি জয়ন্তীর মত মেয়ে সহজে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যায়নি। যেতে পারে না। অনন্যোপায় হয়েই হয়তো সে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছিল। মোদ্দা কথা, সব কিছু ভাল ভাল ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা, আজ তাহলে আমি উঠি—ভাল কথা, দুধের গ্লাসটা ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ স্যার—

দেখি আগে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলে। ফরেনসিক রিপোর্ট কি আসে।

॥ তিন ॥

পোস্টমর্টেম—ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেল। এবং দুধের কেমিক্যাল এ্যানালিসিস রিপোর্টও এলো। স্টমাক কনটেণ্টে দুধের সঙ্গে মিশ্রিত প্রচুর পরিমাণে 'এ্যাট্রোপিন' বিষ পাওয়া গিয়েছে—রিপোর্ট স্পষ্টই বলছে—এ্যাট্রোপিন বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু ঘটেছে। এ্যাট্রোপিনের এ্যাকিউট পয়জনিং কেস।...তীব্র এ্যাট্রোপিন বিষক্রিয়ার চিহ্ন সর্বত্র দেহের অভ্যন্তরে ছিল। অথচ ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে দুধের গ্লাসে কিছু পাওয়া যায়নি।...

সুনীল চক্রবর্তী রীতিমত চিন্তায় পড়লেন—সত্যিই যদি এ্যাট্রোপিন বিষেই মৃত্যু হয়ে থাকে মারাত্মক এ্যাট্রোপিন বিষ কোথা থেকে পেল জয়ন্তী? অবশ্য যদি সে আত্মহত্যাই করে থাকে। ঘরের মধ্যে তো দুধের গ্লাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি—একটা শিশিও না।...তবে কোথা হতে এলো ঐ তীব্র জীবননাশী হলাহল?

boiRboi.net

কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যায় সুনীল চক্রবর্তীর। দু'দিন ধরে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ সুনীল চক্রবর্তীর একজনের কথা মনের মধ্যে উঁকি দেয়—ঠিক। আশ্চর্য! একবারও তার কথা মনে হয়নি কেন—না আজই সন্ধ্যার পর একবার তার সঙ্গে দেখা করতে হবে—

সঙ্গে সঙ্গে নিজের অফিস থেকে ফোনে ডায়াল করলেন সুনীল চক্রবর্তী।

অপর প্রান্ত থেকে একটু পরেই সাড়া এলো, হ্যালো—

কে মিঃ রায় নাকি। সুনীল শুধালেন।

কথা বলছি—

আমি লালবাজার থেকে সুনীল চক্রবর্তী বলছি—

আরে কি ব্যাপার চক্রবর্তী সাহেব, হঠাৎ কি মনে করে? কিরীটী রায়কে হঠাৎ মনে পড়ল কেন?

আজ সন্ধ্যার পর একবার দেখা হতে পারে?

নিশ্চয়ই, আসুন না। আমি আজকাল সব সময়ই প্রায় বাড়িতেই থাকি।

কিরীটী তার বসবার ঘরে বসে একটা ক্রিমিনোলজি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল। অন্য একটা সোফায় বসে কৃষ্ণা একটা বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসে ডুবে ছিল। জংলী এসে সংবাদ দিল লালবাজার থেকে চক্রবর্তী সাহেব এসেছেন।

এই ঘরে নিয়ে আয়, কিরীটী বললে।

কয়েক মিনিট পরেই সুনীল চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।

আরে আসুন, চক্রবর্তী সাহেব—বসুন। কৃষ্ণা—জংলীকে বল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

চা পান করতে করতে সুনীল চক্রবর্তী কথাটা শুরু করলেন, একটা ব্যাপারে আপনার শরণাপন্ন হতে হল আমায়—বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে।

বলুন—কি—খুন খারাপী, নাকি জালিয়াতি?

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে একটা নিউজ বের হয়েছিল, আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানি না—

কি নিউজ বলুন তো? কিরীটী শুধাল।

বকুলবাগানের ব্যানার্জী লজের ব্যাপারটা—

কৃষ্ণা বললে, ধনকুবের শিল্পপতি দিবাকর ব্যানার্জীর পুত্রবধূর আত্মহত্যার কথা বলছেন নাকি চক্রবর্তী সাহেব?

সুনীল চক্রবর্তী বললেন, হ্যাঁ মিসেস রায়—সেটার কথাই বলছি—

boiRboi.net

আমি তো পড়িনি—তা ব্যাপারটা কি বলুন তো চক্রবর্তী সাহেব।

ব্যাপারটা—চক্রবর্তী অতঃপর সব কিছু বলে গেলেন।

সব শুনে কিরীটী বললে, তা ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় বলেই কি আপনার ধারণা চক্রবর্তী সাহেব ?

ঠিক তাই মিঃ রায়—নিষ্ঠুর একটা হত্যাকাণ্ড বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তা যে মেয়েটি মারা গিয়েছে সে আপনার জানাশোনা নাকি কেউ ?

তাই। সম্পর্কে জয়ন্তী আমার ভাগ্নি ছিল, বড়দির মেয়ে।

হাউ স্যাড! তা ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়—নিষ্ঠুর একটা হত্যাকাণ্ড এমন কেন মনে হচ্ছে আপনার ?

দেখুন মিঃ রায়, ওকে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি তো—যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি ছিল তার স্বভাব—ধীর স্থির শান্ত—লেখাপড়াতেও ছিল মেধাবী। দিবাকর ব্যানার্জীর ছেলে তুষারশুভ্র—

কে—

তুষারশুভ্র ব্যানার্জী—শিল্পপতি দিবাকর ব্যানার্জীর বড় ছেলে—সবে তখন বিলেত থেকে ফিরেছে এফ. আর. সি. এস্. হয়ে—এক কলেজ ফাংশনে জয়ন্তীর গান শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারপরই যাতায়াত শুরু করে আমার বোনের বাড়িতে।

সংক্ষেপে সারুন চক্রবর্তী সাহেব—

হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলব। বিয়ে হয়ে গেল ওদের—কিন্তু কেন জানি না, আমার খুব একটা মত ছিল না ঐ বিবাহে—

কেন ?

অত বড় ধনী অভিজাত ঘরের ছেলে—আর আমার বোনের অবস্থা অতি সাধারণ—ভগ্নীপতি অরবিন্দবাবু সামান্য অধ্যাপনার কাজ করতেন—কিন্তু ওরা মানে সুরমা আর অরবিন্দ বাবু লোভ সামলাতে পারলেন না। অত বড় ঘর, অত বড় পাত্র—এর বেশী আর কি কাম্য থাকতে পারে। বিয়ের পর জয়ন্তীকে তার মা বাপের কাছে তুষারশুভ্র বড় একটা আসতে দিত না—কদাচিৎ কখনো আসত—তাও তুষারশুভ্র সঙ্গে করে জয়ন্তীকে নিয়ে আসত আবার সঙ্গে করেই নিয়ে চলে যেত।

ওদের কোন সন্তান হয়নি ? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বিয়ের দুই বৎসর বাদে ওদের ছেলে হয়, নাম তার বাবলু।

বিয়ে হয়েছে কত দিন ?

দশ বৎসর হল। ওদের মধ্যে যে মন কষাকষি ছিল সে কথা আমি অবিশ্যি আগে জানতে পারিনি। সেদিন তুষারশুভ্রর ছোট ভাই স্বর্ণশুভ্র থানায় এসেছিল।

boiRboi.net

তার মুখ থেকেই জানলাম ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নাকি আদৌ ভাল রিলেশান ছিল না, গত ছয় বৎসর ওরা আলাদা ঘরে শুতো।

কিরীটী ইতিমধ্যে তার পাইপটায় তামাক ভরে অগ্নি সংযোগ করেছিল। কিরীটী পাইপে টান দিতে দিতে প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা কি করে প্রথম জানা গেল—আর কে-ই বা জেনেছিল ব্যানার্জী লজে?

সুনীল চক্রবর্তী বলে গেলেন সেদিনকার ঘটনা, যা রসময়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন। কিরীটী চুপচাপ শুনে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, তাহলে সাড়ে আটটা নাগাদ ঐ দিন সকালে ব্যাপারটা প্রথম জানা যায়?

হ্যাঁ···সুনীল বললেন।

সকাল সাড়ে নটায় ওদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ সান্যালকে ফোন করা হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ—

সাড়ে আটটায় ব্যাপারটা ডিটেকটেড হল আর একঘণ্টা পরে সাড়ে নটায় ডাক্তারকে ওরা ফোন করলেন—কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাগুলো যেন কিরীটী বললে। তারপর প্রশ্ন করল, ডাক্তার এলেন কখন?

ফোন পেয়ে মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যেই চলে আসেন···এই দশটা নাগাদ।

তারপর জয়ন্তী দেবীকে হাসপাতালে রিমুভ করা হয় কখন?

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ—

অ্যামবুলেন্সে রিমুভ করা হয়েছিল বললেন না—

হ্যাঁ—

কিন্তু সবকিছু ব্যাপারেই দেরী হল কেন? কিরীটীর স্বগতোক্তি।

কিছু বললেন মিঃ রায়—

কিছু না। আচ্ছা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে—মারাত্মক এ্যাট্রোপিন বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ—

দুধের গ্লাসে ঐ বিষের কোন ট্রেস পাওয়া যায়নি?

না, কেমিক্যাল এ্যানালিসিসে এ্যাট্রোপিনের কোন ট্রেস পাওয়া যায়নি।

কিরীটী কি যেন ভাবছে।

আপনার কি মনে হচ্ছে না মিঃ রায় কেসটা সুইসাইড নয় মার্ডার?

সেটা জোর গলায় ঠিক এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয় মিঃ চক্রবর্তী। যদি মার্ডারই হয় তাহলে আমাদের তিনটে জিনিস ভাবতে হচ্ছে—প্রথমতঃ হত্যাকারী

boiRboi.net

কে হতে পারে এবং হত্যাকারীর মোটিভ কি ছিল, দ্বিতীয়তঃ জয়ন্তীদেবীকে হত্যা করবার সবচাইতে বেশী সুযোগ ও সুবিধা কার ছিল, তৃতীয়তঃ যদি ব্যাপারটা হত্যাই হয়—ঐ মারাত্মক এ্যাট্রোপিন বিষ কে কেমন করে প্রয়োগ করল? শুধু তাই নয়, আরো একটা কথা—মানে চতুর্থতঃ হত্যাকারী জানত ঐ বিষের মারাত্মক ক্রিয়া—একটু থেমে অতঃপর কিরীটী বলল, দিবাকর ব্যানার্জী সমাজের একজন সুপরিচিত প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যক্তি—সে কথাটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে মিঃ চক্রবর্তী—ঠিক আছে, দুটো দিন একটু ভাবতে দিন আমাকে।

আরো কিছুক্ষণ পরে সুনীল চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

সুনীল চক্রবর্তী চলে যাবার পর কিরীটী ভাবতে থাকে—মৃতের দেহের সর্বত্র এ্যাট্রোপিন বিষক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—তখন স্বভাবতই প্রমাণিত হবে জয়ন্তী এ্যাট্রোপিন বিষের ক্রিয়াতেই মারা গিয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, আত্মহত্যা করবার জন্যই জয়ন্তী স্বেচ্ছায় ঐ বিষ খেয়েছে কি না—আর তাই যদি হয় তো সে বিষ খেতে গেল কেন?

অবিশ্যি জানা যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গত ছয় বৎসর ধরে একটা মনোমালিন্য চলছিল—এক বাড়িতে থেকেও এবং স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও (যে বিবাহ ভালবাসার) তাদের পরস্পরের মধ্যে অত দীর্ঘ সময় ধরে মনোমালিন্য থাকার কারণ কি হতে পারে? বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর দুজনেই যখন শিক্ষিত এবং অভিজাত বংশের—

ভাবতে হবে আরো কিছু—যদি জয়ন্তী আত্মহত্যাই করে—তবে ঐ দীর্ঘ ছয় বৎসরের মনোমালিন্য—এতদিন পরে জয়ন্তী আত্মহত্যা করতে গেল কেন? তবে কি ইদানীং নূতন কোন ব্যাপার ঘটেছিল—যার ফলে জয়ন্তীকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করতে হল?

তাছাড়া সবচাইতে বড় কথা—মৃত্যুশয্যায় জয়ন্তী শেষ মুহূর্তে বলে গিয়েছে সে কোন বিষ খায়নি। কথাটা যদি সত্যিই ধরে নেওয়া যায়—তাহলে তার দেহে ঐ তীব্র বিষ এলো কোথা থেকে?

ওদের একটি সন্তান ছিল। বাবলু। বছর আষ্টেক বয়েস।

ছেলেটি মা-বাপ—কার বেশী ভক্ত ছিল?

সবকিছু জানতে হলে জানতে হবে ঐ বাড়িরই কারো কাছ থেকে।

তাদেরই একজন স্বর্ণশুভ্র। তুষারশুভ্রর ভাই। সে থানায় এসে আসল কথা স্বেচ্ছায় বলে গিয়েছে। অথচ তার নামটা প্রকাশ হোক তার ইচ্ছা নয়।

স্বর্ণশুভ্রর ওই স্বেচ্ছা জবানবন্দী থেকে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে জয়ন্তীর প্রতি তার একটা সিমপ্যাথি ছিল। তাছাড়া মনে হয় তার ভাই যে তার ভ্রাতৃবধূর

boiRboi.net

সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না সেটা সে স্বচক্ষে দেখতে পারেনি।

মনে হচ্ছে ঐ স্বর্ণশুভ্র আরো অনেক কিছু জানে। সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র সেদিন থানায়।

স্বর্ণশুভ্র ছাড়া আর কে জানতে পারে সংসারের ব্যাপার?

ঐ তারাপদ—ব্যানার্জী লজের বেয়ারা।

সে-ই দুর্ঘটনার আগের রাত্রে জয়ন্তীর ঘরে দুধের গ্লাস পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক দিনকার পুরাতন লোক ঐ বাড়ির—অনেক কিছুই জানে। জানাটাই সম্ভব।

তারাপদর ওপরেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

দিন দুই পরে জয়ন্তীর মামা সুনীল চক্রবর্তী আবার এলেন কিরীটীর গৃহে।

মিঃ রায়, ব্যাপারটা আমি যতই ভাবছি—ততই মনে হচ্ছে জয়ন্তী আত্মহত্যা করেনি—তাকে বিষ প্রয়োগে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাই করা হয়েছে।

কিরীটী সুনীল চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ চক্রবর্তী, গত দু'দিন আমি জয়ন্তীর মৃত্যুর ব্যাপারটা অনেক ভেবেছি—বলতে পারেন আপনার সঙ্গে আমি একমত। মনে হয় জয়ন্তী আত্মহত্যা করেনি—তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাই করা হয়েছে, কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে হলে আপনার অনুমানটা দৃঢ় যুক্তি ও প্রমাণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—আমি সে রকম কিছু এখনো মনের মধ্যে পাইনি—তাহলে—

তাহলে আর কি, আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি বলুন।

কিন্তু জয়ন্তীর স্টমাক কনটেন্টে দুধের সঙ্গে মিশ্রিত প্রচুর পরিমাণ এ্যাট্রোপিন পাওয়া গেলেও দুধের গ্লাসে কোন এ্যাট্রোপিনের ট্রেস পাওয়া যায়নি।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—সে রাত্রে তারাপদ যে দুধটা জয়ন্তীকে খেতে দিয়েছিল—তার মধ্যে এ্যাট্রোপিন বিষ ছিল এবং পরে সে গ্লাসটা বদলে অন্য গ্লাসে অন্য দুধ রাখা হয়েছিল—

কথাটা যে আমার মনে হয়নি মিঃ চক্রবর্তী তা নয়, কিন্তু একটা কথা ভুলে যাবেন না—জয়ন্তীর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—পরের দিন সকালে সে দরজা ভেঙে জয়ন্তীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রথম গ্লাসটা সরিয়ে ঐ দ্বিতীয় গ্লাস কি করে সেখানে রাখা হল? ঘরের মধ্যে বাথরুম সংলগ্ন মেথরদের যাতায়াতের দরজটাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল পুলিশ বলেছে।

তা যেন হল, কিন্তু ঐ তারাপদ—সে এ কাজ করবে—

boiRboi.net

তারাপদ করেও যদি থাকে—জানবেন হি ওয়াজ জ্যাস্ট এ্যান ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট—এমনও হতে পারে সে কিছু না জেনেই বিষ দেওয়া দুধের গ্লাস জয়ন্তীকে দিয়ে ছিল সে রাত্রে—কিম্বা এও হতে পারে ঐ ব্যাপারে সে বিন্দু-বিসর্গ জানত না। তারাপদর সঙ্গে কথা বলতে পারলে হত—

কথা বলতে চান তো তাকে থানায় ডাকিয়ে আনতে পারি—

বেশ। তবে সেই ব্যবস্থাই করুন। আর পারেন যদি—আমি স্বর্ণশুভ্রর সঙ্গেও কিছু কথা বলতে চাই।

সুনীল চক্রবর্তী উঠলেন অতঃপর।

সুনীল চক্রবর্তীর পরামর্শ মত দিন তিনেক পরে থানার ও. সি. রসময়বাবুর অফিস রুমেই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিল কিরীটী ও রসময়—সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল তারাপদ।

তারাপদর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। রোগা পাতলা চেহারা। আজকালকার ছেলে ছোকরাদের মত মাথায় লম্বা চুল, ঘাড় পর্যন্ত লুটিয়ে আছে। পরণে দামী টেরিলিনের প্যাণ্ট—গায়ে অনুরূপ বুশ শার্ট। হাতে ঘড়ি।

চেহারাটার মধ্যে একটা সযত্ন পরিচ্ছন্নতার ছাপ এত স্পষ্ট যে দেখলেই বোঝা যায় সে ঠিক সাধারণ ভৃত্য নয়—ধনী গৃহস্থ বাড়ির বেয়ারা। কিরীটী লোকটার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তারাপদর চোখের দৃষ্টি সজাগ ও বুদ্ধিদীপ্ত—থানার দারোগাবাবুর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন অসংকোচে।

কি নাম তোর? প্রশ্ন করে চলেন রসময়। কিরীটী শ্রোতামাত্র।

আজ্ঞে, তারাপদ সাহা।

বাড়ি—মানে দেশ কোথায়?

মেদিনীপুর—ঘাটাল—

কত দিন কাজ করছিস ব্যানার্জী লজে?

তা আট-নয় বছর হবে স্যার।

কি কাজ করতে হয়?

কাজ করবার জন্য পাঁচ-ছয় জন দাস দাসী আছে—আমার ডিউটি দাদাবাবুর ব্যাক্তগত কাজকর্ম করা।

ডাঃ ব্যানার্জীর?

boiRboi.net

হ্যাঁ স্যার।

কিরীটী বুঝতে পারে তারাপদ তুষারশুভ্রর খাস পেয়ারের বেয়ারা।

মাহিনা কত ?

মাসে একশো-পঁচিশ টাকা, তাছাড়া যখন যা প্রয়োজন হয় দাদাবাবু দেন।

দাদাবাবুর কি কাজ করিস ?

তার পোশাক-আশাক গুছিয়ে হাতের কাছে দেওয়া—আর ব্রেকফাস্ট—মর্নিং-টি—ব্যাংকের চেক জমা দেওয়া—ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম—সবই আমি দেখাশোনা করি—আর বৌদিরও ফুট-ফরমাস খাটতে হয়।

বোঝা গেল ডাঃ তুষারশুভ্রর বিশ্বাসীও লোকটা—

হঠাৎ কিরীটীও প্রশ্ন করল, সেদিন সকালে বৌদিকে মৃত অবস্থায় তার ঘরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল তার আগের রাত্রে তো তুই-ই তাকে দুধ দিয়েছিলি ?

হ্যাঁ।

বৌদি কি সাধারণত রাত্রে দুধ খেতেন ? কিরীটীর আবার প্রশ্ন।

না স্যার।

তবে সে রাত্রে দুধ দিয়েছিলি কেন ?

বৌদি ডিনার খেলেন না দেখে—রাত উপোসী থাকবেন তাই—

সেটা কত রাত্রে ?

রাত সাড়ে দশটা বোধ হয়—ঠিক মনে নেই।

ব্যানার্জী লজে সাধারণত সকলে ডিনার খায় কখন ?

তার কোন বাধা টাইম নেই, বড়বাবু ও গিন্নী খেতেন রাত ন'টা নাগাদ—দাদাবাবু রাত দশটায়—আর বৌদি কখনো রাত সাড়ে ন'টায় আবার কখনো কখনো রাত সাড়ে দশটায়। কলেজ থেকে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত ডক্টরেটের জন্য পড়াশুনা করতেন বৌদি—মাঝখানে কোন এক সময় ডিনার খেয়ে নিতেন।

একা একাই ?

গত বছর তিনেক ধরে সেই রকমই দেখে এসেছি।

তোদের দাদাবাবু আর বৌদি আলাদা ঘরে শুতেন ?

কল্পনার মুখে তাই শুনেছি।

কল্পনা কে ?

বৌদির আয়া—

ওদের ছেলে বাবলু কোথায় শুতো ?

গিন্নীমার সঙ্গে।

boiRboi.net

দাদাবাবু আর বৌদি কথাবার্তা বলত না ?

কেন বলব না স্যার—হাজবেণ্ড ওয়াইফ কথা বলবে না—

কিরীটী মৃদু হাসল। সে বুঝতে পারে লোকটার মুখ থেকে কথা বের করা খুব সহজ হবে না।

কিরীটী আবার প্রশ্ন শুরু করে, বাবলু বেশী সময় কার কাছে থাকে ?

কর্ত্তা ও গিন্নীমার কাছেই—

বৌদি মানুষটা কেমন ছিল ?

ভালই ছিলেন।

তাকে দেখে তোর কখনো মনে হয়নি, মানুষটা বড় দুঃখী—

কি জানি স্যার, বলতে পারব না। কারো সঙ্গে বড় একটা কথাই তো বলতেন না বৌদি।

কত্তাবাবু গিন্নীমার সঙ্গে ?

খুব একটা নয়।

ছেলের সঙ্গে ?

তা মধ্যে মধ্যে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি।

দাদাবাবুর সঙ্গে ?

হ্যাঁ—তা তো বলতেন।

একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতেন না ?

যেতেন বৈকি, প্রায়ই যেতেন।

তুই মিথ্যা কথা বলছিস তারাপদ, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিল না, আমরা খবর পেয়েছি।

কে—কে বললে—

যেই বলুক, কথাটা সত্যি কি না ?

আমি কিন্তু দেখেছি স্যার ওদের দুজনকে—

আবার মিথ্যা বলছিস ! তোর দাদাবাবু ও বৌদির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি কথা কাটাকাটি হত—সত্যি কিনা ?

জানি না।

জানিস, বলতে চাস না।

তা দেখুন স্যার—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া-ঝাটি কথা কাটাকাটি কি হয় না ? এতে আশ্চর্যের কি আছে। আর সে সব কথা কেন ওঠাচ্ছেন এত করে। তাছাড়া আমি তো বাড়ির একজন চাকর ছাড়া কিছু নই।

boiRboi.net

ধমক দিলেন থানার ও. সি. রসময়বাবু, পাকামি করতে হবে না। উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দে—

ক্ষণকাল রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারাপদ বললে, ঠিক আছে—

কি জানতে চান বলুন। তবে জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা—

শাট্ আপ! চেঁচিয়ে উঠলেন রসময়, ত্যাঁদড়ামি করবি তো হাজতে পুরে রাখব।

ঠিক আছে রসময়বাবু—ওকে আর আমার আপাতত কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। ওকে যেতে দিন।

রসময় একজন পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য।

স্বর্ণশুভ্র এলো। দিবাকর ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাকে এতক্ষণ একটা আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তারাপদ তাকে দেখতে পায়নি। স্বর্ণশুভ্রও দেখেনি তারাপদকে—সব কিছুই কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমত।

স্বর্ণশুভ্র প্রথমটায় থানায় আসতেই চায়নি। কিরীটী তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চায় শুনে থানায় আসতে সম্মত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তাকে জানতে দেওয়া হয়নি যে জয়ন্তীর মামা সুনীল চক্রবর্তী ঐ সময় থানাতেই উপস্থিত থাকবেন। স্বর্ণশুভ্রর সঙ্গে সুনীল চক্রবর্তীর তেমন আলাপ ছিল না। আলাপের কখনো কোন সুযোগ ঘটেনি। তবে উভয়েই উভয়কে চিনত।

কিরীটী দেখছিল স্বর্ণশুভ্রকে—যাকে বলে রীতিমত হ্যাণ্ডসাম চেহারা স্বর্ণশুভ্রর। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট—টকটকে গৌরবর্ণ—যেন স্বর্ণচম্পক কান্তি। চেহারার মধ্যে যেমন একটা আভিজাত্যের ছাপ চোখে পড়ে—তেমনি চোখ মুখে বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট।

কিরীটীই কথা বললে, বসুন মিঃ ব্যানার্জী।

নমস্কার। আপনিই বোধ হয় কিরীটীবাবু? স্বর্ণশুভ্র বললে।

হ্যাঁ—চেনেন আমাকে?

না। সাক্ষাৎ পরিচয় আপনার সঙ্গে আমার না থাকলেও আপনি আমার অচেনা নন। মানে আপনার নামটা। তাই যদি বলি আপনাকে আমি চিনি, কথাটা হয়তো মিথ্যা বলা হবে না। স্বর্ণশুভ্র বললে।

আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন মিঃ ব্যানার্জী, কিরীটী বললে।

সামনের চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে স্বর্ণশুভ্র বললে, এবার বলুন তো, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন? অবিশ্যি তারও আগে আপনাকে আমার একটি ছোট প্রশ্ন আছে, করবার যদি অনুমতি করেন—

boiRboi.net

কি বলুন না—

জয়ন্তীর মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে কি আপনি—

হ্যাঁ—ঘটনাচক্রে কতকটা জড়িয়েই পড়েছি বলতে পারেন।

আপনি কি মনে করেন জয়ন্তীর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়? স্বর্ণশুভ্র বললে।

সেই রকমই আমার মনে হচ্ছে—কেন, আপনারও তো তাই মনে হয়েছে—তাই থানায় এসে সেই কথা আপনি বলেও গেছেন—যাননি?

হ্যাঁ—এখানকার ও সি-কে আমি বলেছিলাম। জয়ন্তী আত্মহত্যা করেছে আমি বিশ্বাস করি না।

আপনি বুঝি জয়ন্তীদেবীকে নাম ধরেই ডাকতেন?

হ্যাঁ। ওকে আমি কখনো বৌদি বলে ডাকিনি। বরাবর জয়ন্তী বলেই ডেকেছি। আই. এ.-বি. এ. আমরা দুজনে একই কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। দাদার সঙ্গে ওর বিয়ে হবার অনেক আগে থাকতেই আমি জয়ন্তীকে চিনতাম।

তাহলে বলুন আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল?

বলতে পারেন তা কিছুটা ছিল।

আপনার দাদা ডাঃ তুষারশুভ্র ব্যানার্জী সে কথাটা জানতেন?

জানবে না কেন—আমিই তো ওদের পরস্পরের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের কলেজের একটা ফাংশনে জয়ন্তীর গান শুনে দাদা মুগ্ধ হয়—তাই ফাংশনের পর আমিই জয়ন্তীকে ডেকে দুজনার আলাপ করিয়ে দিই।

উভয়ের মধ্যে সেই আলাপই পরে ঘনিষ্ঠতায় আরো নিবিড় হয়—তাই না?

তাই, তবে—পরে যখন শুনলাম দাদা জয়ন্তীকে বিবাহ করছে—আমি মনে প্রাণে সায় দিতে পারিনি।

কেন?

জয়ন্তী ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে সরল টাইপের মেয়ে—আর যাকে বলে ঠিক ছাপোষা নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—তাই আমার মনে হয়েছিল—দাদার টেম্পারামেন্টের সঙ্গে জয়ন্তীর মত মেয়ের ঠিক খাপ খেতে পারে না।

টেম্পারামেন্ট বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চান?

জানেন তো, আমার বাবার প্রচুর টাকা—লোকে তাকে বলে একজন শিল্পপতি—তার বড় ছেলে দাদা—অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ—কাজেই কিছুটা বেহিসাবী খেয়ালী এবং চঞ্চলও—দুজনের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল সে ক্ষেত্রে—আশাকরি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাই—

বুঝলাম—তা আপনি বাধা দিয়েছিলেন?

pathagar.net

না—দিইনি। দিলেও কোন ফল হত না। কারণ দাদার গ্ল্যামারে জয়ন্তীও মুগ্ধ তখন। তবে আমি জানতাম ঐ বিবাহ সুখের হবে না—হতে পারে না।

তবু বাধা দেননি ?

না, বললাম তো, দিলেও কিছু হত না।

আপনি বলেছেন জয়ন্তী দেবী আত্মহত্যা করতে পারেন না।

হ্যাঁ।

কেন ? কেন আপনার ঐ ধারণা হল ?

বাবলুর জন্মের কিছু আগে থেকেই দুজনের ভালবাসায় ভাঙ্গন ধরেছিল—

ভাঙ্গন ধরার কোন নির্দিষ্ট বা গুরুতর কারণ ছিল কি ?

কারণ তো একটা নয়, অনেক কিছুর সমষ্টি—

দু-একটা কারণ যদি বলেন ?

আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ রায়—জয়ন্তী সত্যিই দাদাকে ভালবেসেছিল—তাই হয়তো বিবাহের পরে দু-একটা বছর জয়ন্তী সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে, মেনে নেবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু কাঁহাতক মানুষ কম্প্রোমাইজ করে দৈনন্দিন জীবনে চলতে পারে, তারপরই যা হবার তাই হয়েছিল—জয়ন্তী দাদার জীবন থেকে সরে যেতে লাগল একটু একটু করে, এবং বাবলুর জন্মের পর জয়ন্তী একেবারেই দাদার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আত্মহত্যার ইচ্ছা থাকলে তখনই সে করতে পারত—বা আইনসম্মত সেপারেশনের ব্যবস্থাও একটা করে নিতে পারত—সেই সময় দাদাও তাই চেয়েছিল—কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া জয়ন্তী—সে ঐ সব কিছুর মধ্যেই গেল না—সে আবার জীবনের নতুন রাস্তা খুঁজতে লাগল, আর সে রাস্তা হচ্ছে বাবলু। কিন্তু প্রতিনিয়ত সেখানে তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হত।

বাধা—

হ্যাঁ—বাবা মা জয়ন্তীর সন্তানকে একেবারে যাকে বলে কেড়ে নিলেন তার কাছ থেকে। অন্য মেয়ে হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু জয়ন্তী নতি স্বীকার করল না, সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল তার ছেলেকে তার কাছে ফিরে পাবার জন্য—বেচারীকে একটা কোল্ড ওয়ার চালিয়ে যেতে হয়েছে তিন বছর ধরে এবং তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে একদিন সে জিতবেই—আর তা যদি পারত সেই মুহূর্তেই সে ছেলের হাত ধরে ব্যানার্জী লজ থেকে বের হয়ে যেত। মৃত্যুর কথা সে ভাবেইনি—অমন করে জীবনের কাছে হার স্বীকার করবে সে মেয়েই সে ছিল না। তাহলেই বুঝতে পারছেন কেন আমার ধারণা সে আত্মহত্যা করেনি—করতে পারে না।

তাহলে—

আমি এর বেশী কিছু বলতে চাই না মিঃ রায়—

আপনি যেটুকু বলেছেন—তার বেশী আপনার কাছ থেকে আমি কিছু জানতেও চাই না, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যেতে পারেন।

আরও আধঘণ্টা পরে ঐ থানাতেই বসে রসময়বাবুর সামনে সুনীল চক্রবর্তী ও কিরীটীর মধ্যে কথা হচ্ছিল।

কিরীটী বললে, স্বর্ণশুভ্রর সব কথাই তো শুনলে—শুনে তোমার কি মনে হয়েছে জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে জয়ন্তী দেবীকে হত্যাই করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন তাকে হত্যা করা হল? কেন সরানো হল তাকে এই পৃথিবী থেকে? আর সে কথা জানতে হলে—

বাধা দিলেন সুনীল চক্রবর্তী, বললেন, কাকে তুমি সন্দেহ কর কিরীটী?

দেখ সুনীল, তাকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই—কিন্তু কারো প্রতিই আপাতত আমার সন্দেহটা দৃঢ় হতে পারছে না।

কেন, আমার তো মনে হয়—তার শ্বশুর শাশুড়ি—

কেন তারাই বা কেন, তার স্বামী ডাঃ তুষারশুভ্র ব্যানার্জীই বা নয় কেন?

হ্যাঁ—তাও হতে পারে—বিশেষ করে তার ইদানীংকার কার্যকলাপ—

কিছু জানো নাকি?

জয়ন্তী তার মামীমাকে কিছু কিছু বলেছিল—

কি বলেছিল?

সুছন্দা রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়।

না—কে ভদ্রমহিলা?

সে কি হে! চিত্রজগতের একজন নামকরা অভিনেত্রী—

তার সঙ্গে বুঝি ডাঃ ব্যানার্জীর—

কিছুদিন ধরে দারুণ মেলামেশা চলছে দুজনের মধ্যে। ঐ সুছন্দা রায়—কিছুদিন আগে তার স্বামীর সঙ্গে সেপারেশন হয়ে গিয়েছে—সেপারেশনের পর থেকে সুছন্দা রায় অন্যত্র একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে।

কোন সন্তানাদি নেই বুঝি ওদের?

আছে—একটি মেয়ে—মেয়েকে সুছন্দা রায় নিজের কাছেই রেখেছে।

আর স্বামী?

স্বামী, মানে সুদীপ্ত রায়—ভদ্রলোক বেশ ভাল চাকরি করত—সুছন্দাকে বিবাহ করে

boiRboi.net

চাকরি ছেড়ে দেয়। বিবাহের পর দুটি সদগুণ অর্জন করেছিল—রেস ও মদ—এতদিন স্ত্রীর উপার্জনেই চলত—এখন শুনেছি একটা বেগার—

কেন—কোন টাকা পয়সা নেই ?

লোকটার বেশভূষা দেখলে মনে তো হয় না—এও শোনা যায় সুছন্দাই নাকি মধ্যে মধ্যে অর্থ সাহায্য করে তার প্রাক্তন স্বামীকে।

ডিভোটেড ওয়াইফ বল—

সুনীল চক্রবর্তী হাসলেন।

যাক গে, তোমার ঐ ভাগ্নী-জামাইটি সম্পর্কে যদি আর কিছু জানা থাকে তো বল চক্রবর্তী। কিরীটী বললে।

শুনেছি প্রতি রাত্রে চেম্বারের পর তুষারশুভ্র নাকি ঐ সুছন্দার ফ্ল্যাটে যায়—

পরস্পরের মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠতা আছে সেটা তো বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়—

মাঝখানে শোনা গিয়েছিল—তুষারশুভ্র সুছন্দাকে বিয়ে করবার জন্য জয়ন্তীকে প্রেসার দিচ্ছিল ডিভোর্সের জন্য—কিন্তু জয়ন্তীকে বাগে আনতে পারেনি।

ঐ ধরনের একটা কথা স্বর্ণশুভ্রও বলে গেলেন—দেখ সুনীল, তোমার ভাগ্নীজামাইটি সম্পর্কে আরো আমাদের জানতে হবে, যে ভাবে যে উপায়েই হোক—তোমাকে তার ব্যবস্থাটা করতেই হলে—

সেটা বোধ হয় পারব—

কি করে ?

আমাদের সাংবাদিক অজয় গাঙ্গুলীকে চেনো ?

চিনি না, তবে নাম শুনেছি।

তার সঙ্গে তুষারশুভ্রর ঘনিষ্ঠতা—এক গ্লাসের ইয়ার।

তাই নাকি! তাহলে তুষারশুভ্রর ঐ অভ্যাসটিও আছে—

আছে। হ্যাঁ, অজয় গাঙ্গুলী তো তোমাদের পাড়াতেই থাকেন শুনেছি।

আমিও শুনেছি। কিরীটী বললে, তবে বললাম তো, আলাপ নেই।

আমি ব্যবস্থা করছি—

কর—আর ঐ সঙ্গে জয়ন্তী দেবীর কোন বান্ধবী ছিল কিনা—মানে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কোন—তারও সন্ধান নাও।

হেসে। আর কিছু ?

তারাপদর ওপরে ওয়াচ রাখ। ঐ সঙ্গে জয়ন্তীর কোন আয়া-টায়া ছিল কি না—বা কোন একান্ত পরিচারিকা, খোঁজ নাও—বড় ঘরের বৌঝিদের তো ঐ রকম থাকে শুনেছি অনেক ক্ষেত্রে।

boiRboi.net

কিরীটীর প্রশ্নে সুনীল চক্রবর্তী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি কিরীটী, কথাটা আমার একবারও মনে হয়নি। যতদূর জানি ব্যানার্জী লজে কুন্তী নামে একটা নেপালী মেয়ে ছিল—সে জয়ন্তীরই কাজকর্ম করত। জয়ন্তী একবার দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ওর স্বামী রণবাহাদুর সর্বদা মদ খেয়ে ওর ওপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করত—ও জয়ন্তীকে ধরে তার সঙ্গে কলকাতায় আসতে চাওয়ায় ওকে নিয়ে এসেছিল জয়ন্তী—এটা প্রায় বছরখানেক আগেকার ঘটনা।

কুন্তী এখনো ব্যানার্জী লজে আছে? কিরীটী শুধাল।

তা ঠিক জানি না।

ঐ সময় রসময় বললেন, মনে হয় কুন্তী ব্যানার্জী লজে নেই স্যার।

আপনি কি করে জানলেন রসময় বাবু? সুনীল চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন।

সেদিন ব্যানার্জী লজের সকলেরই জবানবন্দী নিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্যে কুন্তী নামে কোন আয়া বা পরিচারিকা ছিল না, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

মেয়েটা তাহলে কোথায় গেল? কিরীটী বললে।

তারাপদ এখনো থানাতেই আছে—বসিয়ে রেখেছি। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করব স্যার?

যান তো, জিজ্ঞাসা করে আসুন—সুনীল বললেন।

রসময় পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এলেন। এসে বললেন,ও বলছে, হ্যাঁ ছিল, কিন্তু যে রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে তার দিন দুই আগে ডাঃ ব্যানার্জী নাকি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাহিনা-পত্র দিয়ে। মেয়েটা নাকি কি চুরি করেছিল ওর ঘর থেকে।

কথাটা শুনে সুনীল চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন—কিরীটীর চোখে মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

সুনীল চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, কুন্তী কোথায় গিয়েছে তারাপদ জানে না?

আজ্ঞে না স্যার। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বললে, জানে না।

তারাপদকে একবার এই ঘরে ডাকুন তো রসময়বাবু। কিরীটী বললে।

রসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

তারাপদ যা বলেছে তা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না সুনীল। কুন্তী যদি চোরই হত নিশ্চয়ই জয়ন্তীর মত মেয়ে ওকে রাখত না। আর দার্জিলিং থেকে সঙ্গে করে নিয়েও আসত না।

ঐ সময় রসময়ের সঙ্গে তারাপদ এসে ঘরে ঢুকল।

বোস তারাপদ। চা খাবে?

কিরীটীর কথায় তারাপদ তাকাল ওর মুখের দিকে—তারপর বললে, না। কিন্তু

boiRboi.net

আমাকে আর কতক্ষণ এ ভাবে এখানে আটকে রাখবেন আপনারা ?

জবাব দিলেন সুনীল চক্রবর্তী, তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করা হবে তার যদি ঠিক ঠিক জবাব দাও এখুনি তোমাকে ছেড়ে দিতে বলব—

আপনারা যা যা শুধিয়েছেন, আমার যা যা জানা ছিল সবই তো বলেছি।

আমরা জানি কুন্তী কোথায় তুমি জানো—কিরীটী বলল।

কুন্তী কোথায় তা আমি কি করে জানব বাবু !

জানো না ?

না।

আচ্ছা, চুরি করেছিল বলে কুন্তীকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ ব্যানার্জী তাই না ?

হ্যাঁ।

কি চুরি করেছিল সে ?

ডাক্তার সাহেবের একটা নতুন ঘড়ি—তার ঘরের টেবিলের ওপর ছিল।

কুন্তী ছিল তোমাদের বৌরানীর নিজস্ব পরিচারিকা—সে কি ডাঃ ব্যানার্জীরও কাজ করত ?

আজ্ঞে না। ডাক্তার সাহেবের যা কিছু কাজ সব আমিই করি—

তবে কুন্তী ডাঃ ব্যানার্জীর ঘরে গিয়েছিল কেন ?

তারাপদ এবারে নীরব।

কি হল তারাপদ, জবাব দিচ্ছ না যে ?

না—মানে—

মধ্যে মধ্যে তাহলে কুন্তী ডাক্তার সাহেবের ঘরে যেত ?

হ্যাঁ।

কুন্তীর বয়স কত ছিল তারাপদ ?

বাইশ-তেইশ হবে।

দেখতে কেমন ছিল ?

নেপালী মেয়েরা যেমন দেখতে হয়—চ্যাপটা নাক, ছোট ছোট চোখ—

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর অকস্মাৎ প্রশ্ন করল, তোমার সাহেব কুন্তীকে প্রায়ই তার ঘরে ডাকতেন—তাই না ?

হ্যাঁ। ডাকতেন কখনো কখনো।

দিনে না রাত্রে ?

বৌরানী রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লে।

boiRboi.net

কিরীটী আবার মৃদু হাসল।—তোমাদের বৌরানী ব্যাপারটা জানতেন ?

বোধ হয় জানতেন।

আচ্ছা তারাপদ, তোমার সাহেব সাধারণত কত রাত্রে ঘরে ফিরতেন ?

প্রায়ই রাত হত—সাড়ে এগারোটা বারোটা—কখনো কখনো তার ফিরতে রাত একটাও হয়ে যেত।

চেম্বার টাইম তো তার বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা ?

আমি অতশত জানি না বাবু—

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো—

বাড়ি যাব ?

কিরীটী রসময়ের দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করলেন।

রসময় বললেন, হ্যাঁ, বাড়ি যাও—তবে মনে রেখ, থানায় খবর না দিয়ে ঐ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। কথাটা মনে থাকবে তো ?

থাকবে।

যাও।

তারাপদ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রসময় বললেন, ওকে ছেড়ে দেওয়াটা কি ভাল হল ?

ওর মনের মধ্যে একটু কনফিডেন্স আসা প্রয়োজন রসময়বাবু, লোকটা রীতিমত ধূর্ত ও সাবধানী—ওকে একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন।

সুনীল চক্রবর্তী বললেন, আমার মনে হয় কিরীটী ও অনেক কিছু জানে।

জানলেও অত সহজে ও মুখ খুলবে বলে আমার মনে হয় না সুনীল। ভাল কথা, আই-বি তে জগন্নাথ বোস নামে একটি ছেলে ছিল—তোমার মনে আছে ?

আছে—এখনো সে আই-বিতেই আছে—

তাকে ঐ তারাপদর ওপরে সর্বক্ষণ নজর রাখতে বল—আর আরো একজনকে নিযুক্ত কর ঐ ডাক্তার ব্যানার্জীর ওপর নজর রাখতে—

আর কিছু—

কুন্তীকে যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। দেখ সুনীল, একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত—জয়ন্তী দেবীকে যে ভাবেই হোক এ্যাট্রোপিন বিষ খাইয়ে হত্যা করাই হয়েছে—আর সেটা তাকে দুধের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে কোন এক সময়—অথচ দেখা যাচ্ছে তারাপদ সে রাত্রে জয়ন্তীদেবীকে যে গ্লাসে দুধ দিয়েছিল তার অবশিষ্টাংশে ঐ মারাত্মক বিষের কোন ট্রেস পাওয়া যায় নি। এ থেকে দুটো সম্ভাবনা আমরা ভাবতে পারি—প্রথমতঃ পরের দিন সকালে দুধ সমেত যে গ্লাসটা

boiRboi.net

জয়ন্তীর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল—হয় সেটা আদৌ সে গ্লাস নয়—কিংবা বিষ-মিশ্রিত দুধটুকু খাবার পর জয়ন্তীকে যখন মৃত তখন কেউ সেই গ্লাসটা ভাল করে ধুয়ে আরো খানিকটা দুধ গ্লাসে রেখে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ? সুনীল চক্রবর্তী শুধালেন।

যদি শেষের ব্যাপারটাই ঘটে থাকে—তো কেমন করে সেটা ঘটল? জয়ন্তীর ঘরের দরজা তো বন্ধ ছিল—তার হত্যাকারী কেমন করে সে ঘরে প্রবেশ করেছিল? সে ক্ষেত্রে ঐ ঘরে প্রবেশের অন্য কোন পথ আছে নিশ্চয়—যে পথে হত্যাকারী সে ঘরে প্রবেশ করেছিল।

তুমি কি একবার জয়ন্তীর ঘরটা দেখতে চাও? সুনীল চক্রবর্তী বললেন।

পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু—

কিন্তু কি?

সেটা কি সম্ভব হবে? কারণ ঐ দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করছি জানতে পারলে হয়তো দিবাকর ব্যানার্জী ভাল চোখে দেখবেন না।

সুনীল চক্রবর্তী বললেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। ভেবে দেখি কিছু একটা পথ বের করা যায় কিনা—

আজ তাহলে ওঠা যাক—কিরীটি উঠে পড়ল।

প্রায় দিন কুড়ি গত হয়েছে ইতিমধ্যে। সরমাদেবী সেই যে তার ইনভেস্টিগেশন অসমাপ্ত রেখে ফিরে এসেছেন ব্যানার্জী লজে আর ফিরে যাননি।

জয়ন্তীর আকস্মিক মৃত্যুটা ব্যানার্জী লজের বাইরে থেকে আদৌ কিছু বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা নাড়াচাড়া করে দিয়ে গিয়েছে। এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে পুলিশ জয়ন্তীর মৃত্যুটাকে একটা আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারেনি। এবং তারা তাদের পরবর্তী কথাবার্তায় স্পষ্টই দিবাকর ব্যানার্জীকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা একটা নিষ্ঠুর হত্যা। দিবাকর ব্যানার্জীও গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন—সেই সঙ্গে সুরমা, মিসেস ব্যানার্জীও।

কেবল বাড়ির একটিমাত্র লোক সেই ব্যাপারে আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়নি—সে হচ্ছে জয়ন্তীর স্বামী ডাঃ তুষারশুভ্র ব্যানার্জী।

সে তার হাসপাতাল, নার্সিং হোম, চেম্বার প্রাকটিস নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে।

সকাল আটটার মধ্যেই যেমন সে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে বের হয়ে যেত—এখনো তেমনি যাচ্ছে—লাঞ্চের ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই সে বাইরে সেরে নিত—এখনো

pathagar.net

তেমনি চলেছে—ফিরতে ফিরতে সেই রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা—কোন কোন দিন একটা। কাজের রাতেই ডিনারপর্বটাও বাড়ির বাইরেই চুকে যায়।

ড্রাইভার শিউরতন বছর পাঁচেক হল গাড়ি চালাচ্ছে তুষারশুভ্রর—ছেলেটার বয়স বেশী নয়, ত্রিশ থেকে বত্রিশ, রোগা লম্বা চেহারা। ফিটফাট, বেশ বাবু গোছের। সেও সেই সকালে বের হয়ে যায়—ফেরে সেই রাত বারোটা একটায়। গ্যারেজ ঘরের ওপরে যে মোজানিন ফ্লোর—সেই ঘরেই থাকে—দিবাকর ব্যানার্জীর বৃদ্ধ ড্রাইভার রামনরেশের সঙ্গে।

রামনরেশ ব্যানার্জী লজে দীর্ঘ বাইশ বছর কাজ করছে। অনেক দিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী মানুষটা।

তারাপদ বিশ্বাস জাতে পরামাণিক—ডাঃ তুষারশুভ্র খাস বেয়ারা। অবিশ্যি ডাঃ সাহেবের কাজকর্ম ছাড়াও সে দিবাকর ব্যানার্জী ও সুরমা ব্যানার্জীর এটা ওটা ফরমাস খাটে।

তিনটি ভৃত্য—অনেক দিনকার বিশ্বাসী লোক গোবিন্দ—বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন। বাজার হাট দোকানপত্তর সব করে। আরো দুটি বেহারী ভৃত্য আছে—রাম লক্ষণ দুই ভাই। রামের বয়স ষাট—লক্ষণ সাতান্ন আটান্ন হবে।

হ্যাঁ—ভয় দেখালেন—চাকরি না ছেড়ে দিলে পুলিশে দেবেন তাই—

চাকড়ি ছেড়ে দিয়েছিলে ?

হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবুসাহেব। ঘড়ি আমি চুরি করিনি। মিথ্যে অপবাদ—দিয়ে—

হঠাৎ মিথ্যে অপবাদ দিতেই বা গেলেন কেন তিনি ?

বোধহয় আমি ঐ বাড়ির সব খবর মেমসাহেবকে দিতাম। তারপরই একটু থেমে কুন্তী বললে, ডাক্তার সাহেব লোকটা আদৌ ভাল নয় বাবুসাহেব।

কেন ?

ঐ বাড়ির মোজানিন ফ্লোরের নীচে একটা ঘর আছে—আপনারা জানেন না—

তুমি কি করে জানলে ? তুমি সেই ঘরে কখনো ঢুকেছ ?

তারাপদর কাছ থেকে শুনেছি—আমি সে ঘরে কখনো যাইনি।

তারাপদ—তারাপদ তোমাকে কি বলেছিল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—তারাপদর আমার ওপরে লোভ ছিল।

তাই নাকি—

হ্যাঁ—কিন্তু বৌদিমণির ভয়ে কিছু করতে সাহস পেত না।

বৌদিমণিকে বুঝি তুমি কথাটা বলেছিলে ?

boiRboi.net

হ্যাঁ—

বৌদিমণি কি তারাপদকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ—

কিন্তু বৌদিমণি তো সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রাখতে পারতেন না। তারাপদ কথাটা জানতে পেরে আমাকে শাসিয়েছিল—

কি বলেছিল সে ?

বেশী বাড়াবাড়ি করলে সে ডাক্তার সাহেবকে বলে আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেব।

বৌদিমণিকে কথাটা বলেছিলে ?

না। বলে কি হত বলুন ?

কেন ? ও কথা বলছ কেন ?

আমি বুঝতে পেরেছিলাম—ওরা বৌদিমণিকে ঐ বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল—

ওরা কারা ?

ডাক্তার সাহেবের মা-বাবা—ডাক্তার সাহেব সকলেই—আমি বুঝেছিলাম বৌদিমণিকে তাড়াতে না পারলে শেষ পর্যন্ত ওরা হয়তো বৌদিমণিকে খুন করবে।

খুন করবে ?

হ্যাঁ—তারাপদকে হাত করে—ওটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান। ওর অসাধ্য কাজ কিছু নেই—আমার মনে হয় ঐ তারাপদই বৌদিমণিকে দুধের সঙ্গে বিষ দিয়েছে কয়েকমাস আগে আর একবার বৌদিমণির খাবারের সঙ্গে বিষ দেওয়া হয়েছিল—ভাগ্যি সে রাত্রে বৌদিমণি খাবারটা খায়নি। একটা বিড়াল সেই খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়—সেবারে পারেনি—আমি জানতাম আবারও ওরা চেষ্টা করবে। আমি থাকলে সুবিধা হবে না—তাই আমাকে তাড়িয়েছিল—জানেন—বৌদিমণি কখনো সকলের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে বসে খেতেন না। সাধারণত তারাপদই বৌদিমণির খাবার দুবেলা তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেত।

আচ্ছা কুন্তী—তোমাদের ডাক্তার সাহেব কি কখনো তোমার বৌদিমণির ঘরে আসতেন না ?

আসবেন না কেন—মধ্যে মধ্যে আসতেন—তবে রাত্রে ওরা আলাদা ঘরে শুতেন।

দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত বলে শুনেছি—

ঠিকই শুনেছেন—

কুন্তী—ডাক্তার সাহেবের ছোট ভাই স্বর্ণশুভ্র—

boiRboi.net

বাড়ির মধ্যে একমাত্র ঐ ছোট সাহেবই বৌদিমণিকে ভালবাসত—

আর বৌদিমণি—

বৌদিমণিও ছোট সাহেবকে ভালবাসতেন। ডাক্তার সাহেবের বেশী রাগের কারণও ছিল ওটাই। আমাকে যেদিন চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয় সাহেব—তার দু'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—

কি ঘটনা ?

ডাক্তার সাহেবের রাত্রে একটা পাঞ্জাবীকে বৌদিমণির ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ—বৌদিমণির শোবার ঘরের পাশেই ঘরটাতেই ইদানীং বাবলু—বৌদিমণির ছেলে থাকত—

একা একা—

না, বড় মেমসাহেব ঐ ঘরেই শুতেন—যেদিন ঐ ব্যাপারটা ঘটে—বড় মেম-সাহেবও তখন ওখানে ছিলেন না—নার্সিং হোমে ছিলেন, বাবলু একা ছিল।

তারপর কি হল ?

বৌদিমণি সে সময়টা জেগেই ছিলেন—তিনি একটা ছোরা দেখাতে ঐ পাঞ্জাবীটা ঘর থেকে চলে যায়।

কিন্তু পাঞ্জাবীটা ঐ ঘরে ঢুকল কি করে ?

দু'ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে—আগে থাকতে সেই দরজার লকটা নষ্ট করে রেখেছিল—মনে হয় ঐ তারাপদই—বৌদিমণি জানতেও পারেননি।

তুমি জানলে কি করে ?

পরের দিন বৌদিমণি আমাকে কথাটা বলল।

সেই পাঞ্জাবীকে তুমি কখনো দেখেছ ?

দেখেছি। লোকটার নাম গুলজার সিং—প্রায়ই ডাক্তার সাহেবের কাছে আসে। দুজনার মধ্যে খুব দোস্তি।

দিন দুই পরে—ঐ থানার বড়বাবুর ঘরের মধ্যেই।

তারাপদকে জেরা করছিল কিরীটী—সামনে বসে থানা অফিসার রসময়—এবং ডি. সি. সুনীল চক্রবর্তী।

কিরীটী বলছিল, তারাপদ—এখনো যদি সব সত্যি কথা স্বীকার ক—তুমি বেঁচে যাবে—নচেৎ জেনো তোমাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতেই ঝুলতে হবে—

boiRboi.net

আমি যা জানতাম সবই আপনাদের বলেছি—

কতকগুলি কথা তুমি রসময়বাবুকে বলনি তারাপদ—কিরীটী বললে।

কি বলিনি ?

তুমি তোমার জবানবন্দীতে বলেছিলে যে রাত্রে তোমাদের বৌদিমণিকে হত্যা করা হয় সে রাত্রে ডাঃ ব্যানার্জী রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরেছিলেন—কিন্তু কথাটা সত্যি নয়—তিনি সে রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলেন ঠিক পৌনে এগারোটায়—

আমি বলতে পারব না। কারণ আমি তাকে রাত দেড়টাতেই বাড়ি ফিরতে দেখেছিলাম।

বলতে পারবে না—না বলবে না। শোন, ডাঃ ব্যানার্জীর ড্রাইভারই বলেছে—সেইদিন গুলজারা সিংকে নিয়ে রাত পৌনে এগারোটায় ফিরে আসেন তিনি তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে মোজানিন ফ্লোরের নীচের ঘরটায় যান—তুমি তাদের ড্রিঙ্ক সার্ভ কর সে রাত্রে—কি মনে পড়েছে—তাও ড্রাইভার শিউচরণ দেখেছে।

আজ্ঞে—

তাহলেই বুঝতে পারছ—সবই আমরা জানি, জানতে পেরেছি। এখন আর কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা বৃথা।

তারাপদ একেবারে চুপ।

শোন, তারপর কি হয়েছিল আমি জানি—রাত সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার মধ্যে বাবলু যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরে ডাক্তার সাহেব ঢুকেছিলেন—আমি জানি না।

জানো তুমি। কারণ ডাক্তার সাহেব যখন বাবলুর ঘরে ঢোকেন সিঁড়ির কাছে তুমি আর বাবুর্চি সেলিম দাঁড়িয়ে কথা বলছিলে। কি—মনে পড়েছে ?

তারাপদ চুপ।

শোন তারাপদ, তুমি জানো তোমাদের বৌদিমণিকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

না, না—এ কথনোই হতে পারে না। কে তাকে বিষ দেবে, কেউ তাকে বিষ দিতে পারে না। বৌদিমণি নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

না। হাসপাতালে তিনি মরার আগে বলে গিয়েছেন তিনি আত্মহত্যা করেননি। আর শুধু তাই নয় আমরা জানি কে তাকে হত্যা করেছে। তুমিও জানো—

আমি, আমি জানব কি করে—

তুমি খুব ভাল করেই জানো কে সে রাত্রে তাকে দুধের সঙ্গে বিষ দিয়েছিল এবং তার সেই দুধের গ্লাস সরিয়ে অন্য একটা দুধের গ্লাস সেই ঘরে রেখে এসেছিল মাঝখানের দরজা পথে গিয়ে।

boiRboi.net

আ-আমি জানি না।

হ্যাঁ জানো।

দুধের যে গ্লাসটা পরে ঐ ঘরে রেখে আসা হয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয়বার—সেই গ্লাসটাই বলে দিয়েছে কার সে কাজ।

বিশ্বাস করুন এ সব আমি কিছুই জানি না।

সবই তুমি জানো—

আমি—

হ্যাঁ তুমি, তুমিই প্রথমবার দুধের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে বৌদিমণিকে দিয়ে এসেছিলে—তারপর তোমার বৌদিমণি সেই দুধ খেয়ে মরে যাবার পর তুমিই অন্য একটা গ্লাসে দুধ নিয়ে সেখানে রেখে অন্য গ্লাসটা নিয়ে এসেছিলে।

কিরীটীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ ঋজু।

দোহাই আপনার, বিশ্বাস করুন—আমি এ সব কিছুই করিনি।

হ্যাঁ। টাকার লোভে তুমি করেছ—তোমার ব্যাঙ্কে অত টাকা এলো কোথা থেকে আদালতে যখন প্রশ্ন করবে—কি জবাব দেবে, বল—কি জবাব দেবে? বল এখনো কে তোমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে ঐ জঘন্য কাজ করিয়েছিল?

না, না—কোন কাজই আমি করিনি।

কিন্তু তোমার হাতের ছাপ গ্লাসের গায়ে পাওয়া গিয়েছে—

তারাপদ বোবার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারাপদ, আদালতে সব কিছু প্রমাণ করব আমরা—তারপর তোমার ফাঁসি হবে।

বেশ। তবে তাই হোক—আমাকে আপনারা গ্রেপ্তার করুন।

সুনীল চক্রবর্তী বললেন, লোকটা দেখছি নেমকহারাম নয় রায়সাহেব।

কিরীটী মৃদু হাসল।

রসময় বললেন, আপনি কি প্রথম থেকেই তারাপদকে সন্দেহ করেছিলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ—দুটো কারণে, প্রথমত, যে ভাবে জয়ন্তীদেবীর ওপরে বিষ প্রয়োগ হয়েছে তাতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় বাইরের কেউ নয়—ঐ বাড়িরই কেউ এবং দ্বিতীয়তঃ দুধের সঙ্গেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। আর তাই যদি হয়ে থাকে তো—বিষ দুধে মিশিয়েছিল সে-ই—যে দুধ গ্লাসে করে ঘরে রেখে এসেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে তারাপদ হত্যা করতে যাবে কেন? কি তার মোটিভ থাকতে পারে? তক্ষুণি মনে হয়—তারাপদ ওয়াজ অ্যান ইনস্ট্রুমেণ্ট, হত্যাকারীর নির্দেশ মতই সে যা করবার করেছে আর করেছে সব কিছু টাকার লোভে।

সুনীল প্রশ্ন করলেন, তাহলে ওয়াজ দি ম্যান বিহাইণ্ড; এ রহস্যের মেঘনাদ

কে, তুষারই কি ?

সেও হতে পারে আবার তার মা বাবাও হতে পারে।

মা বাবা—মানে দিবাকর ব্যানার্জী ও তার স্ত্রী প্রতিমা ব্যানার্জী—

হ্যাঁ, ওরা তিনজনই চাইছিল জয়ন্তীদেবীকে সরিয়ে ফেলতে—ডিভোর্সে যখন জয়ন্তীকে কোন মতেই সম্মত করা গেল না তখন ঐটাই একমাত্র পথ ছিল —টু গেট রিড অফ হার।

রসময় বললেন, হাউ স্যাড !

স্যাড বই কি—নচেৎ একদিন যাকে দেখে শুনে আনা হয়েছিল তাকে ঐভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হলো কেন ! ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্মম পরিহাস।

মিঃ রায়—সুনীল চক্রবর্তী ডাকলেন !

বলুন।

কে ? সেই পিশাচটা কে ?

এখনও বুঝতে পারেননি ?

দিবাকর ব্যানার্জী—

না।

তুষারশুভ্র—

না।

তবে—তবে কে ?

প্রতিমা দেবী—

কি বলছেন !

ঠিকই বলছি—সময় বিশেষে নারী যে কত নৃশংস হতে পারে—তার প্রমাণ ঐ প্রতিমা দেবী। কিন্তু দুঃখ কি জানেন মিঃ চক্রবর্তী তারাপদ কোন দিনই কথাটা স্বীকার করবে না। আর তারাপদকেও আপনারা ফাঁসী কাঠে ঝোলাতে পারবেন না।

পারব না কেন ?

প্রমাণ—প্রমাণ কোথায়—তাছাড়া বেনিফিট অফ ডাউটে যে সে খালাস পেয়ে যাবে।

———

boiRboi.net